শেষ প্রশ্ন

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৩৮—বৈশাখ

তিন টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কিছুকাল পূর্ব্বে এই গল্পটা ভারতবর্ষ মাসিক পত্রে ধারাবাহিক লিখতে আরম্ভ করি, কিন্তু নানা-কারণে মাঝখানে বন্ধ হইয়া থাকে। অনেকদিন পরে আবার লিখিতে গিয়া দেখিলাম গোড়ার দিকের অনেক অংশই পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। সুতরাং, ভারতবর্ষে প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকে মুদ্রিত উপন্যাসের যে সর্ব্বত্র মিল নাই-এ কথা বলা প্রয়োজন। ১লা বৈশাখ ১৩৩৮

গ্রন্থকার

গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শেষ প্রশ্ন

১

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালী পরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা সহরে বস-বাস করিয়াছিলেন। কেহ বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়া-হুড়া ছাড়া ইঁহাদের অতিশয় নির্ব্বিঘ্ন জীবন। বাদসাহী আমলের কেল্লা ও ইমারৎ দেখা ইহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙা ও আ-ভাঙা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে, এমন যে বিশ্ব-বিশ্রুত তাজ-মহল তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যায় উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া, জ্যোৎস্নায় অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া যমুনার এপার হইতে, ওপার হইতে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যতপ্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙড়াইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোকে কবে কি বলিয়াছে, কে-কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে সুমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইঁহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের

দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়-ঘর ছিল, কোন্ জাঠ-সর্দ্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে,—সে কালির দাগ কত প্রাচীন,—কোন্ দস্যু কত হীরা মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে এবং তাহার আনুমানিক মূল্য,—কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই। এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী-সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মুসাফিরের দল যায় আসে, অ্যামেরিকান টুরিষ্ট হইতে শ্রীবৃন্দাবন ফেরৎ বৈষ্ণবদের পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ভিড় হয়,—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজে দিন শেষ হয়, এম্‌নি সময়ে একজন প্রৌঢ়-বয়সী ভদ্র বাঙালী-সাহেব তাঁহার শিক্ষিতা সুরূপা ও পূর্ণ-যৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে সহরের একপ্রান্তে মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা-বাবুর্চ্চি-দারওয়ান আসিল; ঝি, চাকর, পাচক ব্রাহ্মণ আসিল; গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, শোফার, সহিস, কোচয়ানে এতকালের এত বড় ফাঁকা-বাড়ীর সমস্ত অন্ধ্র রন্ধ্র যেন যাদু-বিদ্যায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কন্যার নাম মনোরমা। অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক। কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি-বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণে। তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, সুতরাং, নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্ব্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব! মনোরমা বাড়ীর ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল,

সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয়ে নিবেদন জানাইল যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পর করিয়া না রাখেন। এমনি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা।

শুনিয়া সকলেই খুসি হইলেন। তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ী এবং মোটর যখন-তখন, যাহার-তাহার গৃহে আনাগোনা করিয়া মেয়ে এবং পুরুষদের আনিতে লাগিল, পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন, গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনে হৃদ্যতা এম্‌নি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইঁহারা যে বিদেশী কিম্বা অত্যন্ত বড়লোক এ কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ খানেকের অধিক সময় লাগিলনা। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সঙ্কোচ, এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই ইহারা হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয়না। তবে, আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়া যতটা বুঝা যায় সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছিল যে ইঁহারা যে সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের মত খাওয়া দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ, বাচ-বিচার করিয়া চলেননা। বাড়ীতে মুসলমান বাবুর্চ্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে এত-খানি বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ, যে সমাজেরই অন্তর্গত হোন বহুবিধ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

অবিনাশ মুখুয্যে কলেজের প্রফেসর। বহুদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। ঘরে বছর দশেকের একটি ছেলে; অবিনাশ কলেজে পড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা সচ্ছল,—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর দুই পূর্ব্বে বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্তা হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে

ভগিনীপতির কাছে আসেন। জ্বর ছাড়িল, কিন্তু ভগিনীপতি ছাড়িলেন না। সম্প্রতি গৃহে তিনিই কর্ত্রী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর-সংসার দেখেন, বন্ধুরা সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ হাসে, বলে, ভাই, বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দগ্ধ কোরোনা,—কপাল! নইলে, চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটীর সর্ব্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ নানা আকারের, নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো এক-খানা বড় ছবি। অয়েল পেন্টিঙ,—মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দেয়। এই দিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোক-সমাগম ঘটে। আজ, কি-একটা পর্ব্বোপলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহারাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জন দুই নিচের ঢালা-বিছানার উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া, এবং জন দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকি সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটা-মাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলা-হলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। এমনি সময়ে মস্ত একটা ভারি মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল। পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতে সকলেই সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন জল হইয়া গেল, ও-দিকের খেলাটা উপস্থিত-মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম-সৌভাগ্য আপনাদের

পদধূলি আমার গৃহে প'ড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে ? এই বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্ত্তী আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চ-হাস্যে ঘরভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু বদ্যির অসময় ? এত বড় দুর্নাম যে আমার ছোট খুড়োও দিতে পারেননা অবিনাশ বাবু!

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বোল্‌চ বাবা ?

আশুবাবু বলিলেন, তবে থাক্ ছোট খুড়োর কথা। কন্যার আপত্তি। কিন্তু, এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাকরুণের বাপের সাধ্যি নেই যে দেয়। এই বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বোল্‌ব মশাই, বাতে পঙ্গু। নইলে, যে পায়ের ধূলোর এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধূলো ঝাঁট দেবার জন্যেই আপনাকে একটা চাকর রাখ্‌তে হ'তো অবিনাশ বাবু। কিন্তু আজ আর বস্‌বার যো নেই, এখুনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্য সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশুবাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্য মাকে পর্য্যন্ত টেনে এনেছি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যার পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেছি,—সপরিবারে যেতে হবে। তার পরে একটু মিষ্টি-মুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে একবার হুকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরি করলে হবেনা।

আরও একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড্‌স, মেয়েদের জন্য না হোক্ আমাদের পুরুষদের জন্য দু'রকম খাবার ব্যবস্থাই,—অর্থাৎ কি না,—প্রেজুডিস্ যদি না থাকে ত;—বুঝলেন না ?

বুঝিলেন সকলেই, এবং একবাক্য প্রকাশ করিলেন সকলেই যে তাঁহাদের প্রেজুডিস্ নাই।

আশুবাবু খুসি হইয়া কহিলেন, এ থাকবারই কথা। মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা-লক্ষ্মীদেরও একটা মতামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলোনা। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের অভিরুচি এবং আদেশ নিয়ে বাসায় ফির্‌তে আজ বোধ করি আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এস মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহ শূন্য। শ্যালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার সখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত। কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু, আমার মণি রয়েছে যে। মাছ-মাংস, পিয়াজ-রশুন ও ত স্পর্শও করে না।

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাছ-মাংস খান না?

আশুবাবু বলিলেন, খেতেন সবই, কিন্তু বাবাজীর ভারি অনিচ্ছে,—সে হল আবার সন্ন্যাসী গোছের মানুষ—

চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; পিতার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি সমস্ত বলে যাচ্ছো বাবা!

পিতা থতমত খাইয়া গেলেন, এবং কন্যার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিলনা।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিলনা, এবং আরও দুই চারি মিনিট যাহা ইঁহারা বসিয়া রহিলেন আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন এক প্রকার বিমনা হইয়া রহিল। এবং উভয়ে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের

জন্য সকলেরই মনের উপর যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষণ্ণতার ভার চাপিয়া রহিল।

বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে? আশুবাবুর পুত্র নাই, মনোরমাই একমাত্র সন্তান তাহা সকলেই জানিত; নিজে সে আজও অনূঢ়া,—আয়তির কোন চিহ্ন তাঁহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজা-সুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু ঐ সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্পও ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে?

অথচ, এই সন্ন্যাসী গোছের বাবাজী যেই হোন, অথবা যেখানেই থাকুন, তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ, তাঁহার নিষেধ নহে, কেবল-মাত্র অনিচ্ছার চাপেই এত বড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার মাছ-মাংস-রশুন-পিয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে।

এবং, লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি? পিতা সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া গেলেন, কন্যা আরক্ত মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল,—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল। এবং এই আগন্তুক পরিবারের সহিত মিলা-মিশার যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া-ছিল অকস্মাৎ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

২

মনে হইয়াছিল আশুবাবু সহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেন না। কিন্তু দেখা গেল বাঙালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁহারা শুধু তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসর মহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন, বাড়ীর মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্ব্বেই আনা হইয়াছিল।

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অন্য কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারি ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলি! মোষ্ট ওয়েলকাম্!

ওস্তাদজিদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেননা যেন! কেবল এঁদের ম্যাও ম্যাও শোনাবার জন্যেই আহ্বান করে আনিনি। শোনাবো, শোনাবো, এমন গান আজ শোনাবো যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন।

শুনিয়া সকলেই খুসি হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেছি মশাই, আবিষ্কার করেছি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা' নয়,—সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন

দেখাই। এই বলিয়া তিনি সকলকে একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরের পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রু, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্য্যন্ত,—একটিমাত্র নর-দেহে এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে-যে কি বিস্ময়ের বস্তু তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিয়া হঠাৎ চমক্ লাগে। বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল। কিন্তু প্রতি-নমস্কারের কথা কাহারও মনেও হইল না, সকলে অকস্মাৎ এম্‌নি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদগৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক্। কই, আমরা ত কেউ খবর পাইনি?

শিবনাথ কহিলেন, পাননি বুঝি? আশ্চর্য্য! তাহার পরে হাসি-মুখে বলিলেন, বুঝতে পারিনি অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ-চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু যদিচ, হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হোক ইঁহারা যে পূর্ব্বে হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী ব্যক্তিটির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা আভাসে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির

অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখচ্ছবির ব্যঞ্জনায় এই বিরুদ্ধতা এমনি কটু, রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে কেবল মাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ-প্রকৃতি অবিনাশ পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইলনা, আপাততঃ, এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই বাড়ীর সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গান-বাজনা সুরু হইতে পারিতেছেনা।

পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল,—বিশেষত্ব-বর্জ্জিত মামুলি ব্যাপার,—কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষুদ্র পরিসর এই সঙ্গীতের আসরে, স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্য সত্যই একেবারে অপূর্ব্ব শুনাইল। শুধু তাহার অতুলিত, অনবদ্য কণ্ঠস্বর নহে, এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহার পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি, সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গীন-তান-লয় পরিশুদ্ধ সঙ্গীত যখন শেষ হইল, তখন মনে হইল শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্ব্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমির খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যাসা কভি নহি শুনা।

মনোরমা শিশুকাল হইতেই গান-বাজনার চর্চ্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তাহার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে,

কিন্তু সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যেটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টন্ টন্ করিতে থাকে তাহা সে জানিতনা। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, এবং ইহাই গোপন করিতে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায়না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেছি। তুলনাই হয়না। এই বছর খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিট্‌লি ইম্প্রুভ করেছে।

হরেন কহিলেন, হাঁ।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাঁচ্চা লোক বলিয়া বন্ধু-মহলে খ্যাতি আছে। গান-বাজনা ভাল-লাগাটা তাঁহার মতে চিত্তের দুর্ব্বলতা। নিষ্কলঙ্ক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনে সহরের আব-হাওয়া পুনশ্চ কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গভীর শান্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দ্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া ইঁহাদেরও ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়া উঠিল, বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধুবাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টিই লেগে থাক্ এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, প্রথমতঃ, অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিলনা, এবং দ্বিতীয়তঃ, গানের প্রাণ থাকা-না-থাকার সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের ন্যায় আর কাহারও ছিলনা। গুণ-মুগ্ধ আশুবাবু উত্তেজনা-বশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায়

কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন, এবং অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত মুন্সেফবাবু জল ও পান মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর মহল। ক্রমশঃ, তাঁহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্য আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের ক্ষুধা যতই থাক্ আহারে রুচি ছিলনা, সে না খাইয়াই বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু মনোরমা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলনা, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুন্ড্লা হইতে আসিবার পথে ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত আশুবাবুর পরিচয় ঘটিয়াছিল, এবং মাত্র দুই তিন দিনের আলাপেই কি করিয়া সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, আর, সব চেয়ে বাহাদুরি হচ্চে আমার কানের। ওঁর গলার অস্ফুট, সামান্য একটু গুঞ্জন-ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেমন মা, বলিনি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক ? বলিনি যে, মণি, এঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা ?

কন্যা আনন্দে মুখ প্রদীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ী থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু—

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক্‌না অক্ষয়! থাক্‌না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষু-লজ্জার দায় এড়াইয়া বার কয়েক মাথা নাড়িলেন, কহিলেন, না, অবিনাশবাবু, চাপলে চল্‌বেনা। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। উনি—

আহা-হা,—কর কি অক্ষয়! কর্ত্তব্য-জ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে,—হবে, এখন আর একদিন—এই বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। ধাক্কায় অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা টলিলনা। বলিলেন, আপনারা জানেন বৃথা সঙ্কোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই না কি? কিন্তু তার কি স্থান কাল নেই?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ সহরে যদি আর না আস্‌তেন, যদি ভদ্র পরিবারে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা না করতেন, বিশেষতঃ, কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাকৃতেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং অজানা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, It is too much!

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, No, it is not!

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা-হা—কোর্‌চ কি তোমরা?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেন না, বলিলেন, আগ্রায় উনিও

একদিন প্রফেসর ছিলেন। ওঁর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি কোরে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল—স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্যে।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন,—মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এই সকল বাদ-বিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিল, মিছে কথাই ত। কারণ, প্রফেসরি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লে পরের, অর্থাৎ, আপনাদের ইচ্ছেয় ছাড়তে হোতো। আর তাই ত হোলো।

আশুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্যে।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সেই কখনো-না-কখনো মাতাল হয়। যে হয়না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাস্‌তে পারেন, কিন্তু এ অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারিনে।

শিবনাথ কহিল, পারেন এ অপবাদ ত আমি দিইনি। আমাকে স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ত্যাগ করাবার জন্যে আপনারা যে স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন এ সত্য আমি স্বীকার করি!

অক্ষয় কহিলেন, তা'হলে আশা করি আরও একটা সত্য এম্‌নিই স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না জানিনে। তবে, এ জানি অপরের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল যেমন অপরিসীম, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেম্‌নি বিপুল। কি স্বীকার কর্‌তে হবে আদেশ করুন।

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিদ্যমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার বিবাহ করেছেন। সত্য কি না?

আশুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন,—আপনি কি সব বল্‌ছেন অক্ষয় বাবু? এ কি কখনো হয়, না হতে পারে?

শিবনাথ নিজেই বাধা দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েছে আশুবাবু। তাঁকে ত্যাগ করে, আমি আবার বিবাহ করেছি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছুই না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হতে চল্‌লো,—মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট! তা'তে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে করে দাঁত পড়ে, চুল পেকে একেবারে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। এই জন্যেই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হোলো!

আশুবাবু বিহ্বল চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—অ্যাঁ! শুধু এই জন্যে? তাঁর আর কোন অপরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না। মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্ম্মল সত্য-বাদিতায় অবিনাশ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল;—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ লোকসান চুলোয় যাক্‌, একবার মিথ্যে করেই বল যে সে গভীর অপরাধ করেছিল। তাই তাকে ত্যাগ করেছ। একটা মিথ্যেতে আর তোমার পাপ বাড়বেনা।

শিবনাথ রাগ করিলনা, শুধু কহিল, কিন্তু এ রকম অযথা কথা আমি বল্‌তে পারিনে।

হরেন্দ্র সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথ বাবু?

শিবনাথ ইহাতেও রাগ করিলনা, শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথ্যে বিবেকের শিকল পায়ে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে তোলার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই ত জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রুগ্ন হয়ে পড়াটা পরিতাপের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে,—অসুখ ত অপরাধ নয়, শিবনাথ বাবু; বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা আজীবন দুঃখ সইব কেন? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে সুবিচার হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেননা। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হোলো কোথায়?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেয়ে দিলে—এর বোধ হয় বাপ মা নেই।

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝি'র বিধবা মেয়ে।

বাড়ীর ঝি'র মেয়ে? চমৎকার! কি জাত?

ঠিক জানিনে। তাঁতি টাঁতি হবে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয়?

শিবনাথ কহিল, অক্ষর-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেছি রূপের জন্যে। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের ন্যায় ভারি হইয়া রহিল। কৌতুহল ও উত্তেজনা বশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাহিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা'হলে এটা বোধ হয় সিভিল বিবাহই হোলো?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না,—বিবাহ হোলো শৈব মতে।

অবিনাশ কাহলেন, অর্থাৎ, ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশ দিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ?

শিবনাথ সহাস্যে কহিল, এটা ক্রোধের কথা অবিনাশ বাবু। নইলে, বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত ফাঁকি ছিলনা, অথচ ফাঁক যথেষ্টই ছিল। সেটা বার করবার চোখ থাকা চাই।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিলেননা, শুধু সমস্ত মুখ তাঁহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল! এ কি হইল!

মিনিট দুই তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অবরুদ্ধ বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে,—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়, ঠিক এম্‌নি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, যাক্, যাক্, যাক্,—যাক্ এ সব কথা। শিবনাথ, তা'হলে সেই পাথরের কারবারটাই কোরচ? না?

শিবনাথ বলিল, হাঁ।

তোমার বন্ধুর না-বালক ছেলে-মেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই

করতে হল ? তাদের মা আছেন না ? অবস্থা কেমন ? তেমন ভাল নয় বোধ হয় ?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা ! হঠাৎ মারা গেলেন,—আমরা ভেবেছিলাম টাকা-কড়ি কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে ! অকৃত্রিম সুহৃদ্ !

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই তোমার এতখানি সে সময়ে তিনি করতে পেরেছিলেন। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে যাই হোক্, শিবনাথ, এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবারটা দেখতে হবে একটা অংশের দাবী করলেনা কেন ? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করিতে দিলনা, কহিল, অংশ কিসের ? কারবার ত একলা আমার।

প্রফেসরের দল যেন আকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি রকম শিবনাথ বাবু ?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বই কি।

অক্ষয় বলিলেন, কখখনো না। আমরা সবাই জানি যোগীন বাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন ? কোন ডকুমেণ্ট ছিল ? শুনেছিলেন ?

অবিনাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনিনি কিছুই। কিন্তু এ কি আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল না কি ?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করেছিলেন। ডিক্রী আমিই পেয়েছি।

অবিনাশ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বেশ হয়েছে। তা'হলে শেষ পর্য্যন্ত বিধবাদের দিতে কিছুই হ'লনা।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপ্‌টা খাসা রেঁধেচ হে। আর দু একটা আনো ত।

আশুবাবু অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কই আপনারা ত কিছুই খাচ্চেন না ?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম ! আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই যে বড় চ'লে যাচ্ছেন ?

মনোরমা এ কথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না :—ঘৃণায় তাহার সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল।

৩

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহ কাল গত হইয়াছে। দিন দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সকাল হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িয়া মধ্যাহ্নে খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল, কিন্তু মেঘ কাটে নাই। যে কোন সময়েই পুনরায় সুরু হইয়া যাইতে পারে এম্‌নি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটা রকমের একটা বালাপোষ গায়ে দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার হাতে একখানা বই। মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই বাবা, তুমি এখনও তৈরি হয়ে নাওনি, আজি যে আমাদের এতবারী খাঁর কবর দেখতে যাবার কথা।

কথা ত ছিল না, কিন্তু আজ আমার সেই কোমরের বাতটা—

তা'হলে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি। কাল না হয় যাওয়া যাবে, কি বল বাবা ?

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, না না, না বেড়ালে তোর আবার মাথা ধরে। তুই না হয় একটুখানি ঘুরে আয়গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিক পত্রটায় চোখ বুলিয়ে নিই। গল্পটা লিখেচে ভাল!

আচ্ছা, চললাম। কিন্তু ফিরতে আমার দেরি হবে না। এসে তোমার কাছে গল্পটা শুন্‌বো তা বলে যাচ্চি, এই বলিয়া সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ী ফিরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা ? শেষ হ'ল ? কে লিখেচে ?

কিন্তু, কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন ?

মনোরমা উত্তর দিলনা, শুধু নমস্কারের পরিবর্ত্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে কহিল, পড়া শেষ হয়ে গেল বাবা ? কেমন লাগ্‌লো ?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কন্যা কহিল, তা'হলে আমি নিয়ে যাই, প'ড়ে এখ্‌খুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। এই বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাপড় ছাড়া, হাত মুখ ধোয়া পড়িয়া রহিল, কাগজখানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন্ গল্প, কে লিখিয়াছে কিম্বা কেমন লিখিয়াছে।

এই ভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, এক সময়ে চাকরটাকে সুমুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছে?

বেহারা বলিল, হাঁ।

কখন্ গেলো?

বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা জানালার পর্দ্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, কিন্তু বেশি নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মুষলধারায় বারি-পতনের সূচনা হইয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাঁহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জানো এসব আমি ভালোবাসিনে।

এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি সব মা?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছো কি আমি বল্‌চি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জানিনে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথ বাবুর মত একজন দুর্ব্বৃত্ত দুশ্চরিত্র মাতালকে.. কি বলে আবার প্রশ্রয় দিচ্চো?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে যেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপাকার করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সময়াভাব বশতঃ এখনো তাহাদের যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেই দিকে চক্ষু নির্দ্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সম্বাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল। শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলনা। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলামনা আশুবাবু। এখন তা'হলে চল্‌লাম।

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেননা, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়চে যে?

শিবনাথ কহিলেন, তা' হোক্। ও বেশি নয়। এই বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সে জন্যে আপনি লজ্জিত হবেননা। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হলেও আমাকে শুনিয়ে বলেননি। অত নির্দ্দয় আপনি কিছুতে ন'ন।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আমার অন্য নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন আমি যেন একটা মৎলব নিয়ে এ বাড়ীতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছি। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন একটা ঘটনা যা চোখে পড়ে, সেও তার সবটুকু নয়,—এও আর একটা কথা। কিন্তু কথা যাই হোক্, আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিলনা আজও নেই। সহসা আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশি দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধূলো দেবেন, আমি খুসিই হব।

এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেলেন। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেননা। আশুবাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল না। বাহিরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল, এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, শিবনাথবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরি করে দেব বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, চা আমার জন্যে নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ, আশুবাবু কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও চৌকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি,—ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী-মেয়েদের মত কাপড় পরা,—ও বেচারা বোধ হয় যেন আরও ভিজেচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বলিলেন, যদু, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে-বাবুটি এই মাত্র গেলেন তিনিই কি না। কিন্তু দাঁড়া—দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল মেয়েটি শিবনাথের সেই স্ত্রী নহে তো?

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথ বাবুকে ডেকেই আনুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানলে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা' বটে মণি, কিন্তু, আমার ভয় হচ্চে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ওঁর সেই স্ত্রী। সাহস করে এ বাড়ীতে সঙ্গে আনতে পারেননি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এ সে-ই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল এ বাটীতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কি না, কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যদু, ওঁদের দু'জনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এসো। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন কে ডাক্‌চে, আমার নাম কোরো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি কাজটা হয় ত ঠিক হলনা।

কেন বাবা ?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক্, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক,— তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে ? জাতের উঁচু নীচু আমরা হয় ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। ঝি চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায়না মা।

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা কয়েকের জন্য আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু কোরব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিলনা। বারকয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্চিনে।

মনোরমা কহিল, আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিলেন, বলিলেন, তা' আছে। তবুও জিনিসটা ঠিক ঠাউরে পাচ্চিনে। তোমার যাঁরা সং-শ্রেণীর লোক তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জানো। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী-চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দ্দোষ, কিন্তু এ হল,—কি জানো মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অনুরাগী,—দৈব-বিড়ম্বনায় আজ অকারণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাঁকে ব্যথা দিতে আমি চাইনে।

মনোরমা বুঝিল এ তাহারই প্রতি অনুযোগ, কহিল, আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ মা? কারণ, কি যে হওয়া উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্চে শিবনাথ যেন না আর আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আস্‌চেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন, বেশ যাহোক্ শিবনাথ বাবু, —ভিজে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল,—তা' আমার চেয়ে ইনিই ভিজেছেন ঢের বেশি। এই বলিয়া সঙ্গের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইহাঁরাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেননা।

বস্তুতঃ, মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামা কাপড় ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জল-ধারা গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে,—পিতা ও কন্যা এই নবাগতা রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আশু বাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্ব্বকালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন, এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয় ত আর নাই। সেদিন অক্ষয়ের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ উত্যক্ত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখা-পড়া জানার জন্য বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্য, কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য তখন তাহাতে কেহ কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারম্বার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবন-যাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতি-সম্মত না-ই হোক, পতি-পত্নী সম্বন্ধের পবিত্রতা ইহাদের মধ্যে না-ই থাকুক, কিন্তু এই নশ্বর জগতে তেমনি নশ্বর এই দু'টি নর-নারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে! আর পরমাশ্চর্য্য এই, যে-দেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যে-দেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয়, সে অন্ধকারে ইহারা পরস্পরের সম্বাদ পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্ত্তকালের অধিক সময় লাগিলনা। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজে কাপড় জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যদু, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সম-বয়সী। এবং, সিক্ত-বস্ত্র পরিবর্ত্তনের

ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে তাহাতে কি বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইলনা! রূপ ইহার যত বড়ই হোক, শিক্ষা-সংস্কারহীন নীচ-জাতীয়া এই দাসী-কন্যাটিকে এসো বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ-বাধ করিল, আসুন বলিয়া সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেম্‌নি ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু সহসা এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়ে দিতে হবে।

দিচ্ছি। এই বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইঁহাকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদ-মস্তক বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফর্সা ধোপার বাড়ীর কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারও মাথা-সাবান গায়ে মাখিনে, ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান আছে। কিন্তু, শুন্‌চেন দিদিমণির স্নানের ঘর। তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, সে আমি পারিনে, আমার ভারি ঘেন্না করে। তাছাড়া যার-তার গায়ের-সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

মনোরমার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই নির্ম্মল হাসির ছটায় তাহার দুই চক্ষু ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখ্‌বো? আমি নিজেই সব জানি।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা'হলে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাৎ মুখ্যু। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকরুণ, সাবান টাবান মেখে আগে তৈরি হয়ে নাও, তার পরে তোমার কাছে বসে অনেক ভাল-ভাল কথা শিখে নেব। দিদিমণি, কে ইনি?

মনোরমা হাসি চাপিতে অন্যদিকে মুখ না ফিরাইলে, হয়ত, সে এই অপরিচিত, অশিক্ষিত মেয়েটির মুখের পরে কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের আভাস লক্ষ্য করিত।

৪

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কন্যাই নয়, তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু, —একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্য্যাদা রক্ষার্থে যে-সঙ্কোচ দূরত্ব সন্তানের অবশ্য-পালনীয় বিধি বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে অধিকাংশ স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিতনা। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকিবে, কিন্তু ইঁহাদের ঠেকিতনা। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভালবাসিতেন তাহার সীমা ছিলনা; স্ত্রী

বিয়োগের পরে আর যে বিবাহের প্রস্তাব মনে ঠাঁই দিতেও পারেন নাই হয়ত, তাহারও একটি কারণ এই মেয়েটি। অথচ, বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে তিন মন ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিতেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন, সে তো জানি, সেই আশু বদ্যির যথেষ্ট।

মনোরমা এ কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার এ কথা আমার সয়না। এখানে তাজমহল দেখে কত লোকের কত-কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে। আমার মা গেছেন স্বর্গে দুঃখ সয়ে?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বারো বছরের মেয়ে, জানিস্ ত সব। কার গলায় যে কিসের মালা পড়ার গল্প আছে সে কেবল আমিই জানি রে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার দু-চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সেও দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে নাই, এবং পত্নী-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ গৃহের সর্ব্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশবাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেছি। অথচ, আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি কোরে? যারা দ্বিতীয়

বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষও দিইনে, ছোটও মনে করিনে। শুধু ভাবি আমি পারিনে। শুধু জানি মণির মায়ের যায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। কিন্তু এ খবর কি তারা জানে? জানে না। এই না অবিনাশ বাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলেছি কি না?

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারিনি আশুবাবু। মাষ্টারি করে খাই, সময়ও পাইনে ও বয়সও হয়েছে, মেয়ে দেবে কে?

আশুবাবু খুসি হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই অবিনাশবাবু, ঠিক তাই। আমিও সকলকে বলে বেড়িয়েছি, দেহের ওজন সাড়ে তিন মন, বাতে পঙ্গু, কখন্ চল্‌তে হার্ট ফেল করে তার ঠিকানা নেই,—মেয়ে দেবে কে? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মরেছে অবিনাশ, মরেছে আশু বদ্যি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এই বলিয়া সুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি শার্শি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবিনাশের বাটীর সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন, মণি, সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগাবো না, মা, তুমি বরঞ্চ ফের্‌বার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো।

মনোরমা সহাস্যে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ্ গরম ঠেক্‌চে।

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এসো, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণ দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দু'টোর যায়গায় দু'শোটা বল

আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়ো হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

বাতের জন্য যেদিন এটুকুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেননা সেদিন অবিনাশকে যাইতে হইত। গাড়ী পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন করিয়াই হোক, আশু বদ্যির নির্ব্বন্ধাতিশয় তাঁহার এড়াইবার যো ছিলনা। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত, শিবনাথ গুণী, তাহার সর্ব্বদেহ যৌবনে, স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ,—এ সকল কি কিছুই নয়? তবে, কিসের জন্য এত সম্পদ ভগবান তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছিলেন? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূর করিবার জন্য? মাতাল হইয়াছে? তা' কি হইয়াছে? মদ খাইয়া মাতাল ত এমন কত লোকেই হয়। যৌবনে এ অপরাধ নিজেও ত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে? মানুষের ত্রুটি, মানুষের অপরাধ গ্রহণ করার অপেক্ষা মার্জ্জনা করিবার দিকেই হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই লইয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেননা বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেননা অবিনাশ যখন কহিত, এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি?

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোক এ কাজ পারলে কি কোরে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু,

হয়ত, ভিতরে কি একটা রহস্য আছে,—হয়ত,—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বল্‌তে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী যে নির্দ্দোষ এ কথা সে তো নিজের মুখেই স্বীকার করেছে?

আশুবাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা' করেছে বটে।

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাটাকে নিজের বলে দখল করা এটাই বা কি?

আশুবাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনিই নিজে এ দুষ্কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য,—আচ্ছা, আদালতই বা তাঁকে ডিগ্রী দিলে কি কোরে? তারা কি কিছুই বিচার করে দেখেনি?

অবিনাশ কহিত, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার,—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বল্‌তে পারেন?

আশুবাবু কহিতেন, না না, সে কথা ঠিক নয়, সে কথা ঠিক নয়,—তবে, আপনার কথাও যে অসত্য তাও বল্‌তে পারিনে। কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জানো অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করছেননা।

ইহার পরে আশুবাবুর মুখে আর কথা যোগাইতনা।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সব চেয়ে বেশি। মুখে সে বিশেষ কিছুই বলিতনা, কিন্তু পিতা কন্যাকেই ভয় করিতেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার দিন দুই পর্য্যন্ত আশুবাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজেও নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের তাড়ায় আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। কিন্তু আসিবামাত্রই আশুবাবু বাতের ভীষণ যাতনা ভুলিয়া আরাম কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে অবিনাশবাবু, শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন রূপ কখনো দেখিনি। মনে হ'ল এদের দু'জনকে ভগবান যেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েছেন।

বলেন কি!

হাঁ তাই। দু'জনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেননা, তা' বলে রাখলাম অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা সুরু করেন তখন তার আর মাত্রা থাকেনা আশুবাবু।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি নেই। যাই কেননা এঁর সম্বন্ধে বলি মাত্রার বাঁ দিকেই থাকবে, ডান দিকে পোঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্ব্বের পরিহাসের ভঙ্গিও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তাহলে অকারণ দম্ভ প্রকাশ করেনি বলুন? কিন্তু পরিচয় হ'ল কি কোরে?

আশুবাবু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে আনতে সাহস করেননি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু

বিধি বক্র হলে মানুষের কৌশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হোলও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড় বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুসি হতে পারেনি। ওরই সম-বয়সী, হয়ত কিছু বড় হতেও পারে, কিন্তু মণি বলে শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন,—মেয়েটি যথার্থই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কন্যা। অন্ততঃ, সে যে আমাদের ভদ্র-সমাজের নয় তাতে তার সন্দেহ নেই।

অবিনাশ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, কি ক'রে বোঝা গেল?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজে-কাপড়ের পরিবর্তে একখানি ফর্সা কাপড় চেয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, তিনি কারও ব্যবহার করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না,—ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুঝিতে পারিলেননা ইহার মধ্যে ভদ্র-সমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে আমি আজও ভেবে পাইনি। কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গির মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুন্‌লে বোঝা যায়না। তা'ছাড়া মেয়েদের চোখ কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝিটির পর্য্যন্ত বুঝতে নাকি বাকি ছিল না যে মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নিচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয় এরও হয়েছে ঠিক তাই।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কি ভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে না কি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার

ঘরে এসে বসলেন। কুণ্ঠার বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন, কি খাই, কি চিকিৎসা চল্‌চে, যায়গাটা ভাল লাগচে কি না,—প্রশ্ন করার কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। বরঞ্চ, শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর ত জড়তার চিহ্ন মাত্র দেখলাম না। না কথায়, না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুঝি ছিলেননা ?

না। তার কি যে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা' বলবার নয়। তাঁরা চলে গেলে বোল্‌লাম, মণি, ওঁদের বিদায় দিতেও একবার এলেনা ? মণি বল্‌লে, আর যা বল বাবা পারি, কিন্তু বাড়ীর দাসী চাকরকে বসুন বলে অভ্যর্থনা করতেও পারবোনা, আসুন বলে বিদায় দিতেও পার্‌বনা। নিজেদের বাড়ীতে হলেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি !

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেননা, শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু। কিন্তু মনে হয় যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলেছেন। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বলিতে লাগিলেন, শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও বোধ করি এই। সে তো জানে সবই,—তার ভয় ছিল পাছে কোন বিশ্রী কদর্য্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, কহিলেন, হতেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেননা, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম কেদারায় হেলান দিয়া শুইলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আমায় কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ন হলেন।

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেননা, তেমনি অর্দ্ধশায়িত ভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন, ক্ষুণ্ন নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন একটা ব্যথার মত লেগেছে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এমন ছট্‌ফট্ করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির,—শুধু রূপই নয়।

অবিনাশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তাঁর রূপও দেখিনি কথাও শুনিনি আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে সুযোগ যদি কখনো হয় ত তাঁদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বল্‌লে, আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাননা? আমি যে কেউ আছি এ কথা না-ই বা মনে করলেন।' আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবী করিনে।

অবিনাশ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, এ তো খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয় আশুবাবু? শুন্‌লে মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থাই আমরা করি, স্বামীটিকে সে ভদ্র-সমাজে চালিয়ে দিতে চায়।

আশুবাবু বলিলেন, বস্তুতঃ, তার কথা শুনে মনে হল সে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম এ ঘটনা শিবনাথ তাঁর কাছে গোপন করেনি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে। কিন্তু একটা জিনিস সে নিশ্চয়ই গোপন করেছে। এই মেয়েটি যেই হোক একে ত সে সত্যই বিবাহ করেনি।

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বল্লেন মেয়েটি তাঁর স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাঁকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, দিন পরিচয়। কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্‌ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু বলিলেন, তাতে আমারও সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু এঁদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য নেই, সত্য আছে যে রহস্য গোপনে আছে তাকেই বিশ্বের সুমুখে অনাবৃত করায়? অবিনাশ বাবু আপনি ত অক্ষয় নন, এ তো আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করিনে।

অবিনাশ বাবু লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে! তার কল্যাণের জন্য ত—

কিন্তু বক্তব্য তাঁহার শেষ হইতে পাইলনা, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় বার হতে পারবেনা?

না, মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নামিয়ে দিতে পারবেনা মনোরমা?

নিশ্চয় পারবো,—চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে, এবং বোধ হয় একসপ্তাহের পূর্ব্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

৫

দিন দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা,—বৈকালে নিশ্চয় আসবেন। আশু বদ্যি।

জগতের বিধবা মাসি দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বদ্যিরা কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল না কি,—আস্‌তে না আস্‌তেই জরুরি তলব পাঠিয়েছে যেতে হবে?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই। তারা কি মুখুয্যে মশাইকে গিলে খেতে চায় না কি?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালীকে আদর করিয়া কখনো ছোট গিন্নি কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোট গিন্নী, অমৃত-ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাকৃতে দেখ্‌লে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বই কি।

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা'হলে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত-ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করবেনা,—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বেনা।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবেনা মুখুয্যে মশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত করে বেড়া বাঁধিয়ে রাখ্‌বো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দ্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন, আপনি অধার্ম্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত,—ইতিমধ্যে অধীনের দশ দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একেবারে দশ দশটা দশা? প্রথমটা বলুন?

বলি। প্রথম দশায় ঠ্যাং দু'টো শুধু তাজা হয়েছে তাই নয়, অতি দ্রুতবেগে নীচে হতে উপরে, এবং উপর হতে নীচে গমনাগমন সুরু করেছে।

অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে আজ কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা কূলে সমবেত হয়েছেন, এবং হরেন্দ্র-অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজ নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান করেছেন।

ভালো কথা। তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

দর্শনেচ্ছু আশু বদ্যি অতি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করছেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটু গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশ্ব উপস্থিত হয়েছেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েছে, বাবাজী স্বয়ং মেরামতি কার্য্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্ত-প্রায়, এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজ-মহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসি মুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজীটি-কে আশুবাবু? এঁর কথাই কি একদিন বল্‌তে গিয়েও হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আজ আর বল্‌তে, অন্ততঃ, আপনাকে বল্‌তে বাধা নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দু'জনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ব্ব বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম হিন্দুমতেই হয়। যথা সময়ে, অর্থাৎ, বছর চারেক পূর্ব্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হোতও তাই, কিন্তু হ'লনা। যেমন করে এদের পরিচয় ঘটে সেও এক বিচিত্র ব্যাপার,...বিধিলিপি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন, আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়ে হলুদ হয়ে গেল, রাত্রির গাড়ীতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা, ছেলে-পুলে নেই, খুড়িমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অখণ্ড বিশ্বাস, এসে বল্‌লেন, এ বিবাহ এখন হতেই পারেনা। তিনি নিজে, এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে এখন বিবাহ হলে তিন-বৎসর তিনমাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

একটা হুলস্থুল পড়ে গেল, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু খুড়োকে আমি চিন্‌তাম্, বুঝলাম এর আর নড়-চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড়লোকের ছেলে, তারও এক বিধবা খুড়ি ছাড়া সংসারে কেউ ছিলনা, তিনি ভয়ানক রাগ করলেন, অজিত

দুঃখে, অভিমানে ইন্‌জিনিয়ারি পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জানলে এ বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরে ?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই হতাশ হোলাম, হলনা শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বল্‌লে বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে যার জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে ? তিন বছর এম্‌নিই কি বেশি সময় ?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে তো জানি। বোল্‌লাম, মা, তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু, এ সব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যে মারাত্মক।

মণি হেসে বল্‌লে, তোমার ভয় সেই বাবা, আমি তাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু স্বাত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচলা বিশ্বাস, যাবার সময়ে মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোন দিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জান্‌তো। এবং তখন থেকে সেই যে ব্রহ্মচারিণীর জীবন গ্রহণ করলে একটা দিনের জন্যেও তা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার যো নেই অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার যো নেই। কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আশুবাবু কন্যার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবেনা। অজিত সর্ব্বাগ্রেই খুড়োমহাশয়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। না হলে এখানে বোধ করি সে আসতনা।

অতঃপর, উভয়েই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলেত চলে গেলে বছর দুই পর্য্যন্ত তার কোন সম্বাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে করিনি তা' নয়। কিন্তু মণি হঠাৎ জান্‌তে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বল্‌লে, বাবা, এ চেষ্টা তুমি কোরোনা। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান করোনি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বোল্‌লাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা, কিন্তু, মেয়ের দু-চক্ষে যেন জল ভরে এলো। বল্‌লে, হয়না বাবা। শুধু কথা-বার্ত্তাই হয়, কিন্তু তার বেশি,—না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা' লিখেছেন তাই যেন সইতে পারি, আমাকে আর কোন আদেশ তুমি কোরোনা। দু'জনের চোখ দিয়েই জল পড়তে লাগলো, মুছে ফেলে বোল্‌লাম, অপরাধ করেছি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুই ক্ষমা কর্।

অকস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেননা, তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি, এবং কত অন্যায় ধারণাই না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেননা, কহিলেন, কিসের ?

এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে মেম-সাহেব বনে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তাদের হৃদয়ে স্থান পায়না। কতবড় ভ্রম বলুন ত ?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে। কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি, আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া না-পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর

করে। নইলে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করলেই গোল বাধে। এই যে অজিত। মণি কই?

বছর ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড়ে জামায় কালির দাগ। কহিল, মণি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য কর্‌ছিলেন, তাঁর কাপড়েও কালি লেগেছে, তাই বদ্‌লে ফেল্‌তে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সাম্‌নে আন্‌তে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু, শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখানকার কলেজের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মণির আস্‌তে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগবেনা। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেরি হলে সব দেখ্‌বার সময় পাওয়া যাবেনা। লোকে বলে তাজমহল দেখে আর সাধ মেটেনা।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না মেটবারই যে জিনিস বাবা। কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়েই আছি। বরঞ্চ, তোমারই দেরি, তোমারই এখনো কাপড় ছাড়তে বাকি।

ছেলেটি নিজের পোষাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদ্‌লাতে হবেনা, এতেই চলে যাবে।

এই কালি সুদ্ধ।

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক্‌। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ, তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে-সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই ত নয়। নিতান্তই সাধা-সিধা পোষাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোন খানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ, কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল পিতৃ-স্নেহবশে হয় তিনি নিজের কন্যাকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গেছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড মোটর-যানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্য-লুব্ধ নারী ও রূপ-লুব্ধ পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্ব্বত্রই তাহাদের সাজ-সজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অস্তমান রবিকরে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্ব-খ্যাত, অনন্ত সৌন্দর্য্যময় তাজের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া যখন উপনীত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে আসিতেছে।

যমুনা কূলে যাহা-কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়ের দল-বল ইতিপূর্ব্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাঁহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

বাত-ব্যাধি-পীড়িত আশুবাবু অতি গুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর বিন্যস্ত করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচা গেল। এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ করগে বাবা, আশু বদ্যি এইখান থেকেই বেগম সাহেবাকে কুর্ণিশ জানাচ্চেন। এর অধিক আর তাঁকে দিয়ে হবেনা।

মনোরমা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সে হবেনা বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারবনা।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবেনা।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেননা। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ বলিলেন, তা' যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েছে এ কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে-বস্তুর মর্য্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হোতোনা।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, মনোরমা বলিল, সে হবেনা বাবা, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। তোমার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে এর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েই থাকবে। যিনি যত খবরই দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি কিন্তু কেউ বেশি জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধই করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া

অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না-দেখার ভান করিয়া আর-একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুসি হইয়া বলিয়া উঠিল, আশু-বাবু ও তাঁর মেয়ে এসেছেন যে !

আশুবাবু উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন্ এলেন শিবনাথ বাবু ? এদিকে আসুন।

সস্ত্রীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু তাহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি শিবনাথের স্ত্রী। আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানিনে।

মেয়েটি কহিল, আমার নাম কমল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেননা আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়! কমল, এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীরও পরিচিত। বোসো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, কিন্তু এঁর পরিচয় ত দিলেন না।

আশুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বই কি। উনি আমার,—উনি আমার পরমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিনকয়েক হল বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখ্‌তে এসেছেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখ্‌লে ?

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আশুবাবু বলিলেন, তা'হলে তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও ভাগ্যবান, কেননা, এই পরম বিস্ময়ের জিনিসটি সে এখনো দেখেনি, এইবার দেখ্‌বে। কিন্তু আলো কমে আস্‌চে, আর ত দেরী কর্‌লে চল্‌বেনা অজিত।

মনোরমা বলিল, দেরী ত শুধু তোমার জন্যেই বাবা। ওঠো ?

ওঠা ত সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্যে যে আয়োজন করতে হয়।

তা'হলে সেই আয়োজন কর বাবা ?

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি রকম মনে হল ?

কমল কহিল, বিস্ময়ের বস্তু বলেই মনে হল।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি, পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইলনা। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে বাবা, ওঠো এইবার।

উঠি, মা। এই বলিয়া আশুবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উদ্যম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ওঁর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করাও সহজ নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এইখানে বসে গল্প করি, আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ প্রস্তাবের জবাবও দিলনা, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা সে হবেনা। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্ম্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন এক মুহূর্ত্তেই ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে।

অবিনাশের চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, উনি না গেলে হবেনা। মনোরমার বিশ্বাস, ওঁর বাবার চোখ দিয়ে না দেখ্‌তে পেলে তাজের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি করা যাবেনা।

কমল সরল চোখদু'টি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ? আশুবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক ? এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি ?

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল। কথাগুলা ত ঠিক অশিক্ষিত দাসীকন্যার মত নয়।

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, কিছুই জানিনে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই,—সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানিনে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিওনে কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই মর্ম্মর কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজকণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি, আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশি হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিলনা।

এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিম্বা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্য্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে, এম্‌নি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন-ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিলনা, সহস্র-লক্ষ্য-মানুষ-বধ করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এম্‌নি চলে যেতো! এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান। এই তো আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়।

তোমার কথাই যদি সত্য হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না-ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থ-ই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করুননা, মানুষের অন্তরে সে শ্রদ্ধার আসন আর থাকবেনা।

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভাল বেসেছি কোন দিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্ত্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয় সুন্দরও নয়!

শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসী-কন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলনা, অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের চক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি, মা।

কমল রাগ করিলনা, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সইতে পারেনা। আপনি সত্যই বলেছেন আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যে দিন জানবো প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই সেদিন বুঝবো এর শেষ হয়েছে,—এ মরেছে। এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে

দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিত বাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসিগে।

আশুবাবু খুসি হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি। কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো, না হয় কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

৬

অজিত ও মনোরমা তাজ দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ তাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে নাই। অক্ষয় নীরবে ফুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয় রব তিনি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট-ই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আশুবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া ঊর্দ্ধভাগ দুই হাতের উপর ন্যস্ত করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা উপায় করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন। অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া খরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল-জবাব এই দু'জনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ ঘাড়টা একটু নাড়িয়া,—কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসৎ পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ,—ইহারাও মুখ

তুলিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন শিখার মত জ্বলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেম্‌নিই ক্লান্ত ও মলিন; সে যেন কিছুই দেখিতেছেনা,—কিছুই শুনিতেছেনা। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কত দূরেই যেন চলিয়া গেছে।

আশুবাবু শুধু বলিলেন, বোস। কিন্তু তাহারা কোথায় বসিল, কিম্বা বসিল কি না সে দেখিবার সময় পাইলেননা।

অবিনাশ বোধকরি অক্ষয়ের যুক্তি-মালার ছিন্ন সূত্রটাই হাতে জড়াইয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, সম্রাট সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক্, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ সুমুখের মার্ব্বলের মত শাদা, জলের ন্যায় তরল, সূর্য্যের আলোর মত স্বচ্ছ এবং সোজা,—এই যেমন আমাদের আশুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিলনা, আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টার ত্রুটিও ছিলনা,—জানি ত সব,—কিন্তু এ কথা উনি ভাবতেই পারলেননা তাঁর মৃত স্ত্রীর যায়গায় আর কাউকে এনে বসানো যায় কিরূপে! এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কতবড় আদর্শ! কত উঁচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদু স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিলেন, এখন এ আলোচনা থাক্।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিলেন, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চুপ করিলেন। তাঁহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিলনা,—সেই উদাস অন্যমনস্ক চোখের অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিলনা, জানিবার চেষ্টাও করিলনা।

কমল কহিল, ও—এম্‌নিই। তোমার বাড়ী যাবার তাড়া পড়েছে বুঝি? কিন্তু বাড়ীটি ত সঙ্গেই আছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

আশুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য্য সুন্দর মুখের উপরে একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হইলনা,—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া,—যেন দেখিতেও পায়না, শুনিতেও পায়না।

অবিনাশের দেরি সহিতে ছিলনা, বলিলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে। তাঁর অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেননা, কহিলেন, এ ক্ষেত্রে অপরাধ হবেনা। আমরা এতগুলি লোকে মিলে তোমাকে অনুরোধ করচি তুমি বলো।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দু'টি দিন দেখ্‌তে পেয়েছি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ওঁকে আমি ভালবেসেছি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝ্‌তে পার্‌চি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, বলিলেন, কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার কুণ্ঠা বোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশুবদ্যি বড্ড নিরীহ মানুষ, কমল, তাকে মাত্র দু'টি দিন দেখেই অনেকটা ঠাওর করেছ, আরও দিন দুই দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল,—এসব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক এই জন্যেই ত উনি বারণ করেছিলেন,

আর এই জন্যেই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বল্‌তে বাধচে যে নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানিনে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে শ্লেষ ছিল, বলিল, খুব সম্ভব আপনারা মানেননা, কিন্তু কি মানেন একটু শুন্‌তে পাই কি ?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায়না, দুঃখ দেওয়াও যায়না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ লালন করে, বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতটাকেই ধ্রুব জ্ঞানে জীবন যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।

কমলের মুখের এই কথাটায় আশুবাবু পুনরায় আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটিই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বিধবা জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। এ কি তুমি মানোনা ?

কমল বলিল, না। একটা বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায়না। বরঞ্চ বলুন এই ভাবে এ দেশের বৈধব্য-জীবন কাটানোই বিধি, বলুন, একটা মিথ্যেকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে,—আমি অস্বীকার কোরবনা।

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে,—না থাক্‌, ব্রহ্মচর্য্যের কথা আর

তুলবনা,—কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবন-যাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্য্যাদাটাও দেবনা ?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা ঐ শব্দের মোহ। 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে বহু মর্য্যাদা পেয়ে পেয়ে এম্নি স্ফীত হয়ে উঠেছে যে তার আর স্থান কাল কারণ অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে! কিন্তু অবস্থা বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশি নয় এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদি বা ভয় হয় আমার হয় না। আমি সে দলের নই। অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিইনে। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি ?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধ করি আপনাকে প্রমাণ করে না দিলে স্বীকার করেন না ?

কমল জবাবও দিলনা, রাগও করিলনা, শুধু হাসিল।

আর একটি লোক রাগ করিলেননা তিনি আশুবাবু। অথচ, কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সব চেয়ে বেশি।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এ সব কদর্য্য ধারণা আমাদের ভদ্র সমাজের নয়। সেখানে এ অচল।

কমল তেম্নি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্র সমাজে অচল হয়েই ত আছে। এ আমি জানি।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু

ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কমল। পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্যে বল্‌ছিনে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু পারে না,—এই যেমন আমি। মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনো কল্পনা করতেও পারি নে।

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েছি মানি, কিন্তু সেদিন ত বুড়ো ছিলামনা। কিন্তু তখনো ত এ কথা ভাবতে পারিনি।

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক এক জন থাকে যারা বুড়ো-মন নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। সেই বুড়োর শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ, বিকৃত-যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো-মন খুসি হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ। হাঙ্গামা নেই, মাতামাতি নেই,—এই ত শান্তি, এই ত মানুষের চরম তত্ত্বকথা। তার কত রকমের কত ভালো ভালো বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা। দুই কান পূর্ণ ক'রে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দলোকের বিসর্জ্জনের বাজ্‌না এ কথা সে জান্‌তেও পারেনা।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন ইহার একটা কড়া রকমের জবাব দেওয়া প্রয়োজন,—মেয়েমানুষের মুখ দিয়া উন্মাদযৌবনের এই নির্লজ্জ স্তব-গানে সকলের কানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল. কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও কেহ খুঁজিয়া পাইলেননা।

তখন আশুবাবু মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো মন তুমি কাকে বল? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে। এ সত্যিই সেই কি না।

কমল কহিল, মনের বার্দ্ধক্য আমি তাকেই বলি, আশুবাবু, যে মন

সুমুখের দিকে চাইতে পারেনা, যার অবসন্ন, জরা-গ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবী নেই,—বর্ত্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্ব্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা,—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকি দিন ক'টা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময় মত একবার দেখ্‌বো বই কি।

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিষ্পলক চক্ষে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিলনা, বলিয়া উঠিল, —আমার একটা প্রশ্ন,—দেখুন মিসেস্—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস্ কিসের জন্যে? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না!

অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল,—না না, সে কি,—সে কেমন ধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমন ধারা নয়। বাপ মা আমার নাম রেখেছিলেন আমাকে ডাকবার জন্যেই ত। ওতে আমি রাগ করিনে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা,—তাই বলে যদি আমি ডাকি আপনি রাগ করেন না কি?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, রাগ করি।

এ উত্তর তাহার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, আশুবাবু ত কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয়

কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায় বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ কথাও সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত করে শুন্‌তে চায়। দেখেন না, রাজারা তাদের নামের আগে-পিছে কতগুলো নিরর্থক বাক্য দিয়ে, কতগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়। নইলে তাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এই যেমন ইনি। কখনো কমল বল্‌তে পারেননা,—বলেন শিবানী। অজিত বাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ, না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাও ছোট, বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ, আমি ত বুঝ্‌বই।

কিন্তু কি যে হইল এমন সুস্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিলনা, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া অঘ্রাণের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা, হিম পড়তে সুরু হয়েছে, আর না। এইবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন, এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েছেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েছেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ উপরের—উনি। এই বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আদ্যিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সব দিক দিয়ে মিল করাবার জন্যে যেন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া বসিয়া বার দুই তিন মাথা নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি ?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন ?

অক্ষয় বলিলেন, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই, তাই জিজ্ঞেসা করি,—শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু, শিবনাথ বাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যই বিবাহ হয়েছিল ?

আশুবাবু মুখ কালীবর্ণ করিয়া কহিলেন, বলেন কি অক্ষয়বাবু ?

অবিনাশ কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপে গেলে ?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট !

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে সত্যি কোনটাই নেই। কিন্তু আমাদের ত আছে।

কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল। যেন কত তামাসার কথাই না ইহার মধ্যে আছে। কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু ? আমি বল্‌চি অক্ষয়বাবু। একেবারে কিছুই হয়নি তা' নয়। বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগ্‌লেন, বল্‌লেন, এ বিবাহ বিবাহই নয়,—ফাঁকি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে বল্‌লেন, বিবাহ হ'ল শৈব মতে। আমি বোল্‌লাম, সেই ভাল। শিবের সঙ্গে যদি শৈব মতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাব্‌বার কি আছে !

অবিনাশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলেনা কি না, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এই রকম কোনদিন ?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিলনা, তেমনি উদাস গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট ! উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাবো তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে ? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবেনা না কি ?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই। কিন্তু সে হবেনা। আমি আত্মহত্যা করতে যাবো এ কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেননা।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা কমল।

কমল তাঁহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গীতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্যায়। শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর, আমি যাবো তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে ? সত্য যাবে ডুবে আর যে-অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখ্‌বো বেঁধে ? আমি ? আমি কোরব এই কাজ ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল !

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানি, সংসারে সত্য যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয়।

কমল বলিল, মিথ্যে তো বলিনে। এই যেমন প্রাণও সত্য দেহও সত্য,—কিন্তু প্রাণ যখন যায় ?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারি হিম পড়বে, এখন না উঠ্‌লেই যে নয়।

এই যে মা উঠি।

শিবনাথ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানি, আর দেরি কোরোনা, চল।

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলকে নমস্কার করিল, বলিল, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হল যেন কেবল তর্ক করবার জন্যেই। কিছু মনে করলেননা।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে, শিবানি, শিখ্‌লেনা কিছুই।

কমল বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু শেখবার কোথায় কি ছিল আমার মনে পড়চেনা তো।

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এম্‌নি আড়ালেই রইলো। পারো যদি আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই।

কমল সবিস্ময়ে কহিল, এ তুমি বোল্‌চ কি আজ ?

শিবনাথ জবাব দিলনা, পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, চলো।

আশুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য্য !

আশ্চর্য্যই বটে। এ ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ, উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য্য নাটকের মধ্য অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া,—পর্দ্দার ও পিঠে না জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচরে রহিল। সকলের মনের মধ্যে এই একটা কথাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল, এবং সকলেরই মনে হইল, যেন এই জন্যেই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশির-সিক্ত মন্দ জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেত-মর্ম্মর মায়া-পুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রতি আর কাহারও চোখ নাই।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠ্‌লে তোমার সত্যিই অসুখ করবে বাবা!

অবিনাশ কহিলেন, হিম পড়চে উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন! ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু অক্ষয়-হরেন্দ্রর টাঙ্গা ওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশি ভাড়ার সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব, কোনমতে ঠেসা-ঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল; কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ। কহিলেন, শিবনাথ মিছে কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন সামান্য দাসীর মেয়ে হতে পারেনা। অসম্ভব। এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ তো গৌরবের পরিচয় নয় অবিনাশ বাবু।

অবিনাশ বলিলেন, সেই কথাই ত ভাব্‌চি।

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি হইনি। এ সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝ্‌তে পারি। অত সহজে আমাকে ঠকানো যায়না।

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে! আপনাকেই ঠকানো! একেবারে monopolyতে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্র-ঘরের culture সিকি পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ সমস্ত শুধু immoral নয়, অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায়না অক্ষয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দু-ই এক অবিনাশ বাবু। দেখ্‌লেননা, বিবাহ জিনিসটা এর কাছে তামাসার ব্যাপার। যখন সবাই এসে বল্‌লে এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বল্‌লেন তাই নাকি? absolute indifferenceটা আপনারা কি নোটিশ করেননি? এ কি কখনো ভদ্র কন্যায় সাজে, না সম্ভবপর?

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই স্তব্ধতায় তাঁহার

ধ্যান ভাঙিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর formটার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। অনুষ্ঠান যাহোক্ কিছু একটা হলেই ওর হলো। স্বামীকে বল্‌লে, ওরা যে বলে বিয়েটা হলো ফাঁকি। স্বামী বল্‌লেন, বিবাহ হলো আমাদের শৈব মতে। কমল তাই শুনে খুসি হয়ে বল্‌লে শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে আমার শৈব মতে ত সেই ভালো। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগ্‌লো অবিনাশ বাবু।

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরেই বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করা—হাঁ গা, কর্‌বে না কি তুমি এই রকম? দেবে না কি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত তাঁর পরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনো বাজ্‌ছে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া শুধু একটুখানি মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিলনা, বলিল, আপনারা অবাক্ কর্‌লেন অবিনাশবাবু। তাদের যা' কিছু সমস্তই মিষ্টি মধুর। এমন কি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা নী যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়্‌লো?

হরেন্দ্র কহিল শুধু 'নী' যোগ করাতেই হয়না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়নী বলে ডাকুলেই কি মধু ঝরবে?

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,

হরেন্দ্র বাবু don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করাও তাহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি নীরব হইয়া থাকে যে সহস্র খোঁচা-খুঁচিতেও মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির করা যায়না। হইলও তাই। অক্ষয় বাকি পথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িলেন; সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন কদর্য্য পরিহাস করিয়াছে, এবং শিবনাথের শৈব-মতে-বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্যে ও ব্যবহারে যে আভিজাত্যের বাষ্পও নাই, বরঞ্চ, শিক্ষা ও সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক ইহাই অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত বারম্বার প্রতিপন্ন করিতে করিতে গাড়ী আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্যান্য সকলে নামিয়া গেলে হরেন্দ্র-অক্ষয়কে পৌঁছাইয়া দিতে গাড়ী চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ীর মধ্যে এঁরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন, না, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ওঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, অক্ষয়বাবুর প্রকৃতিটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিতনা। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মণি, কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্ব্বের ধারণা কি আজ বদ্‌লায়নি?

কিসের ধারণা বাবা?

এই যেমন,—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা।

পিতা দ্বিরুক্তি করিলেননা। তিনি জানিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিত্ত অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি নিষ্ফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধহয় তেমন কান দেননি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতিধ্বনি মাত্রই হোতো তো, এ কথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হত না যে, সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে আশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক, বল্‌তে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারে ক'জন আছে? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই যে শিবনাথ এতবড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, কেবল, এরই জন্যে আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল, অবিনাশবাবু, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আজ জানি, সেদিন কাপড় এবং সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু উপহাস করেই গিয়েছিল, —তার সেদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি,—কিন্তু সমস্ত ছলা-কলা, সমস্ত বিদ্রূপই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিন্‌তে পেরে থাকে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন,—কি যে তোরা সব বলিস্ মা?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি এর মধ্যে কোথাও নেই আশুবাবু।

যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয়নি, কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছে ওদের পরস্পরের মধ্যে এইখানেই মস্ত মত-ভেদ আছে!

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে তো শিবনাথেরই দোষ, কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখেচো সে তুমিই জানো বাবা। কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারেনা তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায়?

আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব তো তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায়নি?

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও নয় মণি। বরঞ্চ, পেলেই তার মিথ্যাচার হোতো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য্য মনে করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্ব্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্রয়ে ভালবাসা যায়, এই কথাই আমাকে সে বলেছে, কিন্তু আমার যে-মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে আমাকেও খেলো করেনি, নিজেকেও অপমান করেনি। এই তো ঠিক, এতে ব্যথা পাবার তো কিছুই নেই মণি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অজিত অন্যমনস্কের ন্যায় ছিল, এই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিতনা, জানিয়া লইবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপসা,—এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইলনা, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া উঠিল।

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ'লে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্নটা ঠিক অধ্যাপকের মত হ'লনা। যাই হোক্,—না, তার কাছে নেই।

তা'হলে আত্ম-সংযমেরও দাম নেই?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন সে শুধু নিষ্ফল আত্ম-পীড়ন। আর, তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকানো নয়, পৃথিবীকে ঠকানো। তার মুখ থেকে শুনে মনে হোলো কমল এই কথাটাই কেবল বল্‌তে চায়। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুন্‌লে ভারি বিস্ময় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিল,—বিস্ময় লাগে! সর্ব্বশরীরে জ্বালা ধরেনা? বাবা, কখনো কোন কথাই কি তুমি জোর করে বল্‌তে পারবেনা? যে-যা বল্‌বে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ তো দিইনি মা। কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষ নিয়ে বিচার করতে গেলে কেবল এক পক্ষই ঠকেনা, অন্য পক্ষও ঠকে। যে সব কথা তার মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথাই কমল বলেনি। সে যা বল্‌লে তার মোট কথাটা বোধহয় এই যে, সুদীর্ঘ সংস্কারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুজে মাথা ন্যাড়লেই হবে কেন মনি।

মনোরমা বলিল, বাবা, ভারতবর্ষে এতকাল ধ'রে কি সে দিকটা দেখাবার লোক ছিলনা?

তাহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভালো করে জানো যে, শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোন দেশেই মানুষের পূর্ব্ব-গামীরা শেষ-প্রশ্নের

জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারেনা। তাহলে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতোনা।

হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বলিলেন, তুমি বোধকরি কিছুই বুঝ্তে পারচোনা,—না?

অজিত ঘাড় নাড়িলে, আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি-যে পবিত্র হোম-কুণ্ডের আগুন জ্বেলে দিলেন লোকে চেয়ে দেখ্বে কি, ধুঁয়ার জ্বালায় চোখ খুল্তেই পারলেনা। অথচ, মজা এই যে আমাদের মাম্লা হোলো শিবনাথের বিরুদ্ধে, আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তাঁর চাকুরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে ঘরে আনলেন কমলকে। বল্লেন, বিবাহ হয়েছে শৈব মতে,—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়ে জান্লেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞাসা করা হলো মেয়েটি কি ভদ্র-ঘরের? শিবনাথ বল্লেন, সে তাঁদের বাড়ীর দাসীর কন্যা। প্রশ্ন করা হলো মেয়েটি কি শিক্ষিতা? শিবনাথ জবাব দিলেন শিক্ষার জন্যে বিবাহ করেননি, করেছেন রূপের জন্যে। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাইনে, অজিত, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়লো গিয়ে তার পরেই সবচেয়ে বেশি। আর এই হোলো সমাজের সুবিচার!

মনোরমা কহিল, তাকে কি সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা? সমাজে অক্ষয়-বাবুও ত আছেন, তাঁরাই ত প্রবল পক্ষ।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হলে ডেকে আন্তে বোধহয়?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেননা, কহিলেন, ডাক্‌তে গেলেই কি সবাই আসে মা ?

অজিত বলিল, আশ্চর্য্য এই যে আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বিরোধ, অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশি।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে অজিতবাবু। কমলের আমরা কিছুই জানিনে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে। আর জানি তার অখণ্ড মন্দ দিকটাকে। তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয়, রাগও হয়। ভাবি, এইবার গেল বুঝি সব।

আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁর নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের ছায়াও পড়েনা, ভয়েরও দাগ লাগেনা। মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আট্‌কাবে, উদরস্থ হবেনা। দেবতার দলই আসুক, আর দৈত্য-দানাতেই ঘিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার চিত্ত,—শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি খুসি। কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইলনা, আশুবাবু অকস্মাৎ দুইহাত তুলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেননা অবিনাশবাবু, আপনার পায়ে পড়ি। নিরবচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেছি, সেখানে কি-করেছি, না-করেছি নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষে থাক্‌বেনা। একেবারে নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করে আন্‌বে। তখন ?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন,আপনি কি বিলেত গিয়েছিলেন না কি ?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য্য হয়ে গেছে।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে ইয়োরোপে। বাবা ব্যারিষ্টার। বাবা ডক্টর।

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি ?

আশুবাবু তেম্‌নি ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয়, নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত-ভুলে গেছি। দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন কোরে মেয়ে নিয়ে এখানে-সেখানে টোল ফেলে বেড়াই, ঐ যা বল্‌লেন, সমস্ত চিত্ত-তলটা একেবারে ধুয়ে-মুছে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে গেছে। ছাপ-ছোপ কোথাও কিছু বাকি নেই। সে যাই হোক্, দয়া কোরে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয়বাবুর গোচর করবেননা।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারি ভয় ?

আশুবাবু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচিনে, তাতে ওঁর কৌতূহল জাগ্রত হলে একেবারে মারা যাবো।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এ তোমার বড় অন্যায়।

বাবা বলিলেন, অন্যার হোক্ মা, আত্ম-রক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল, মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয় বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে করো ?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোলমেলে বস্তু, মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক্, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু সে তো হবার নয়, তাই চিরকালই এই নিকে তর্ক চলেছে, মীমাংসা আর হোলোনা।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এম্‌নি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনো স্পষ্ট কোরে কিছু বলনা। এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট কোরে বল্‌বার মত বিদ্যে-বুদ্ধি তোর বাপের নেই মণি,—সে তোর কপাল। এখন খামোকা আমার ওপর রাগ করলে চল্‌বে কেন বল্‌তো ?

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেছে, বাইরে বাইরে খানিক ঘুরে আসিগে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে ? এই অন্ধকারে ?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে, কিন্তু অন্ধকার নেই। যাই, একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেড়িয়োনা !

না। গাড়ীতেই যাবো।

গাড়ীর ঢাক্‌নাটা তুলে দিয়ো, অজিত, যেন হিম লাগেনা।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা'হলে অবিনাশ বাবুকেও অমনি পৌঁছে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু, ফিরতে যেন দেরি না হয়।

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশ-বাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটরে ঘোরা বাতিক দেখ্‌চি এখনো যায়নি। এই ঠাণ্ডায় চল্‌লো বেড়াতে।

৮

দিন পনেরো পরের কথা। সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটীতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এমন সে প্রায়ই করিত। যে পথটা সহরের উত্তর হইতে আসিয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া কিছুদুর পর্য্যন্ত গিয়া সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে তাহারই একটা নিরালা যায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ী থামাইয়া দেখিল শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙা-চোরা পুরাতন কালের একটা দ্বিতল বাড়ী, সুমুখে একটুখানি তেম্নি শ্রীহীন ফুলের বাগান,—তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে। মোটর থামিতে সে কাছে আসিল, কহিল, আর একদিন আপনি এম্নি একলা যাচ্ছিলেন, আমি কত ডাকলাম, কিন্তু শুন্‌তে পেলেননা। পাবেন কি কোরে? বাপ্‌রে বাপ্! যে জোরে যান্,—দেখলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ভয় করেনা?

অজিত গাড়ী হইতে নিচে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি একলা যে? শিবনাথবাবু কই?

কমল বলিল, তিনি বাড়ী নেই। কিন্তু আপনিই বা একাকী বেরিয়েছেন কেন? সেদিনও দেখেছিলাম সঙ্গে কেউ ছিলনা।

অজিত কহিল, না। এ কয়দিন আশুবাবুর শরীর ভালো ছিলনা, তাই তাঁরা কেউ বার হননি। আজ তাঁদের অবিনাশবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা কিছুতেই আমি ঘরে থাক্‌তে পারিনে।

কমল কহিল, আমিও না। কিন্তু পারিনে বল্‌লেই ত হয়না,—গরীবদের অনেক কিছুই সংসারে পারতে হয়। এই বলিয়া সে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নেবেন আমাকে সঙ্গে কোরে? একটুখানি ঘুরে আস্‌বো।

অজিত মুস্কিলে পড়িল। সঙ্গে আজ সোফার পর্য্যন্ত ছিলনা, শিবনাথবাবুও গৃহে নাই তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও বাধিল। একটুখানি দ্বিধা করিয়া কহিল, এখানে আপনার সঙ্গী-সাথী বুঝি কেউ নেই?

কমল কহিল, শোন কথা। সঙ্গী-সাথী পাবো কোথায়? দেখুন্‌না চেয়ে একবার পল্লীর দশা। সহরের বাইরে বল্‌লেই হয়,—সাহগঞ্জ না কি নাম, কোথাও কাছাকাছি বোধকরি একটা চামড়ার কারখানা আছে,—আমার প্রতিবেশী ত শুধু মুচিরা। কারখানায় যায় আসে, মদ খায়, সারা রাত হল্লা করে,—এই ত আমার পাড়া।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এ দিকে ভদ্রলোক বুঝি নেই?

কমল বলিল, বোধহয় না। আর থাক্‌লেই বা কি,—আমাকে তারা বাড়ীতে যেতে দেবে কেন? তা'হলে ত,—মাঝে মাঝে যখন বড্ড একলা মনে হয়,—তখন আপনাদের ওখানেও যেতে পারতাম। বলিতে বলিতে সে গাড়ীর খোলা দরজা দিয়া নিজেই ভিতরে গিয়া বসিল, কহিল, আসুন, আমি অনেকদিন মোটরে চড়িনি। আজ কিন্তু আমাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আন্‌তে হবে।

কি করা উচিত অজিত ভাবিয়া পাইলনা, সঙ্কোচের সহিত কহিল, বেশি দূরে গেলে রাত্রি হয়ে যেতে পারে। শিবনাথবাবু বাড়ী ফিরে আপনাকে দেখ্‌তে না পেলে হয়ত কিছু মনে করবেন।

কমল বলিল, নাঃ—মনে করবার কিছু নেই।

অজিত কহিল, তা'হলে ড্রাইভারের পাশে না বসে ভেতরে বসুননা ?

কমল বলিল, ড্রাইভার ত আপনি নিজে। কাছে না বস্‌লে গল্প কোরব কি কোরে ? অতদূরে পিছনে বসে বুঝি মুখ বুজে যাওয়া যায় ? আপনি উঠুন, আর দেরি করবেননা।

অজিত উঠিয়া বসিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পথ সুন্দর এবং নির্জ্জন, কদাচিৎ এক আধ জনের দেখা পাওয়া যায়,—এই মাত্র। দ্রুতবেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া উঠিল, কমল কহিল, আপনি জোরে চালাতেই ভালবাসেন, না ?

অজিত বলিল, হাঁ।

ভয় করেনা ?

না। আমার অভ্যাস আছে।

অভ্যাসই সব। এই বলিয়া কমল একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার ত অভ্যাস নেই, তবু এই আমার ভাল লাগ্‌চে। বোধহয় স্বভাব, না ?

অজিত কহিল, তা' হতে পারে।

কমল কহিল, নিশ্চয়। অথচ, এর বিপদ আছে। যারা চড়ে তাদেরও, আর যারা চাপা পড়ে তাদেরও,—না ?

অজিত কহিল, না, চাপা পড়বে কেন ?

কমল কহিল, পড়্‌লেই বা অজিতবাবু। দ্রুতবেগের ভারি একটা আনন্দ আছে। গাড়ীরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি ! কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারেনা। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ-হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচ্‌লো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুসি, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায়না। ঠিক না অজিত বাবু ?

কথাটা অজিত বুঝিতে পারিলনা, বলিল, এর মানে ?

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। ক্ষণেক পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, মানে নেই। এম্‌নি।

কথাটা যে সে বুঝাইয়া বলিতে চাহেনা এইটুকুই শুধু বুঝা গেল, আর কিছু না।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, অজিত ফিরিতে চাহিল, কমল কহিল, এরই মধ্যে ? চলুন আর একটু যাই।

অজিত কহিল, অনেক দূরে এসে পড়েচি ফিরতে রাত হবে।

কমল বলিল, হলই বা।

কিন্তু শিবনাথবাবু হয়ত বিরক্ত হবেন।

কমল জবাব দিল, হলেনই বা।

অজিত মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু আশুবাবুদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিলম্ব হলে ভালো হবেনা।

কমল প্রত্যুত্তরে কহিল, আগ্রা সহরে ত গাড়ীর অভাব নেই, তাঁরা অনায়াসে যেতে পারবেন। চলুন, আরো একটু। এম্‌নি করিয়া কমল যেন তাহাকে জোর করিয়াই নিরন্তর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ লোক-বিরল পথ একান্ত জনহীন ও রাত্রির অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর নিরতিশয় স্তব্ধ। অজিত হঠাৎ একসময়ে উদ্বিগ্ন-চিত্তে গাড়ীর গতি রোধ করিয়া বলিল, আর না, ফিরি চলুন।

কমল কহিল, চলুন।

ফিরিবার পথে সে ধীরে ধীরে বলিল, ভাবছিলাম, মিথ্যের সঙ্গে রফা করতে গিয়ে জীবনের কত অমূল্য সম্পদই না মানুষে নষ্ট করে।

আমাকে একলা নিয়ে যেতে আপনার কত সঙ্কোচই না হয়েছিল, আমিও যদি সেই ভয়েই পেছিয়ে যেতাম এমন আনন্দটি ত অদৃষ্টে ঘট্‌তোনা।

অজিত কহিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখে নিশ্চয় করে ত কিছুই বলা যায়না। ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দও ত অদৃষ্টে লেখা থাক্‌তে পারে।

কমল কহিল, এই অন্ধকার নির্জ্জন পথে একলা আপনার পাশে বসে ঊর্দ্ধশ্বাসে কতদূরেই না বেড়িয়ে এলাম। আজ আমার কি ভালই যে লেগেছে তা' আর বল্‌তে পারিনে।

অজিত বুঝিল কমল তাহার কথায় কান দেয় নাই,—সে যেন নিজের কথা নিজেকেই বলিয়া চলিতেছে। শুনিয়া লজ্জা পাইবার মত হয়ত সত্যই ইহাতে কিছু নাই, তবুও প্রথমটা সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। এই মেয়েটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা ও অশুভ জনশ্রুতির অতিরিক্ত বোধহয় কেহই কিছু জানেনা,—যাহা জানে তাহারও হয়ত অনেকখানিই মিথ্যা,—এবং সত্য যাহা আছে তাহাতেও হয়ত অসত্যের ছায়া এমনি ঘোরালো হইয়া পড়িয়াছে যে চিনিয়া লইবার পথ নাই। ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া যাহারা দিতে পারে তাহারা দেয়না, যেন সমস্তটাই তাহাদের কাছে একেবারে নিছক পরিহাস।

অজিত চুপ করিয়া আছে, ইহাতেই কমলের যেন চেতনা হইল। কহিল, ভালো কথা, কি বল্‌ছিলেন, ফিরে গিয়ে আনন্দের বদলে নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাক্‌তে পারে? পারে বই কি।

অজিত কহিল, তা'হলে?

কমল বলিল, তা'হলেও এ প্রমাণ হয়না, যে-আনন্দ আজ পেলাম তা পাইনি।

এবার অজিত হাসিল। বলিল, সে প্রমাণ হয়না, কিন্তু এ প্রমাণ হয় যে আপনি তার্কিক কম নয়। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার।

অর্থাৎ যাকে বলে কূট-তার্কিক তাই আমি?

অজিত কহিল, না, তা নয়, কিন্তু শেষ ফল যার দুঃখেই শেষ হয় তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক্, তাকে সত্যকার আনন্দ-ভোগ বলা চলেনা। এ তো আপনি নিশ্চয়ই মানেন?

কমল বলিল, না আমি মানিনে। আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত-সুখের শিশিরবিন্দুগুলিকে শুষে ফেল্‌তে না পারে। সে যত অল্পই হোক্, পরিমাণ তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক্, তবুও যেননা তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেন-না আর-একদিনের নিরানন্দর কাছে লজ্জাবোধ করে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, এ জীবনে সুখ দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই হো সত্যিকার পাওয়া। এই কি ঠিক নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর অজিত দিতে পারিলনা, কিন্তু তাহার মনে হইল অন্ধকারেও অপরের দুইচক্ষু একান্ত আগ্রহে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে যেন নিশ্চিত কিছু একটা শুনিতে চায়।

কৈ জবাব দিলেননা?

আপনার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলামনা।

পারলেননা?

না।

একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। তাহার পরে কমল ধীরে ধীরে বলিল,

তার মানে স্পষ্ট বোঝবার এখনো আপনার সময় আসেনি। যদি কখনো আসে আমাকে কিন্তু মনে করবেন। করবেন ত ?

অজিত কহিল, কোরব।

গাড়ী আসিয়া সেই ভাঙা ফুল-বাগানের সম্মুখে থামিল। অজিত দ্বার খুলিয়া নিজে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাটীর দিকে চাহিয়া কহিল, কোথাও এতটুকু আলো নেই, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে।

কমল নামিতে নামিতে কহিল, বোধ হয়।

অজিত কহিল, দেখুন ত আপনার অন্যায়। কাউকে জানিয়ে গেলেননা, শিবনাথবাবু না জানি কত দুর্ভাবনাই ভোগ করেছেন।

কমল কহিল, হাঁ। দুর্ভাবনার ভারে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে যাবেন কি কোরে? গাড়ীতে একটা হাত-লণ্ঠন আছে, সেটা জ্বেলে নিয়ে সঙ্গে যাবো ?

কমল অত্যন্ত খুসি হইয়া কহিল, তা হলে ত বাঁচি অজিত বাবু। আসুন, আসুন, আপনাকে একটুখানি চা খাইয়ে দিই।

অজিত অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, আর যা হুকুম করুন পালন করবো, কিন্তু এত রাত্রে চা খাবার আদেশ করবেননা। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি।

সদর দরজায় হাত দিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরের বারান্দায় একজন হিন্দুস্থানী দাসী ঘুমাইতেছিল মানুষের সাড়া পাইয়া উঠিয়া বসিল। বাড়ীটি দ্বিতল। উপরে ছোট ছোট গুটি দুই ঘর। অতিশয় সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নিচে মিট্ মিট্ করিয়া একটি হরিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেইটি হাতে করিয়া কমল তাহাকে উপরে আহ্বান করিতে অজিত সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, এখন যাই। রাত অনেক হলো।

কমল জিদ্ করিয়া কহিল, সে হবেনা, আসুন।

অজিত তথাপি দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া সে বলিল, আপনি ভাব্‌চেন এলে শিবনাথবাবুর কাছে ভারি লজ্জার কথা। কিন্তু না এলে যে আমার লজ্জা আরও ঢের বেশি এ ভাবচেন না কেন? আসুন। নিচে থেকে এমন অনাদরে আপনাকে যেতে দিলে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারবোনা।

অজিত উঠিয়া আসিয়া দেখিল ঘরে আসবাব নাই বলিলেই হয়। একখানি অল্পমূল্যের আরাম কেদারা, একটি ছোট টেবিল, একটি টুল, গোটা তিনেক তোরঙ্গ, একধারে একখানি পুরানো লোহার খাটের উপর বিছানা-বালিশ গাদা করিয়া রাখা,—যেন, সাধারণতঃ, তাহাদের প্রয়োজন নাই এমনি একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাব। ঘর শূন্য,—শিবনাথ-বাবু নাই।

অজিত বিস্মিত হইল, কিন্তু মনে মনে ভারি একটা স্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, কই তিনি ত এখনো আসেননি?

কমল কহিল, না।

অজিত বলিল, আজ বোধহয় আমাদের ওখানে তাঁর গান-বাজনা খুব জোরেই চল্‌চে।

কি কোরে জান্‌লেন?

কাল পরশু দুদিন যান্‌নি। আজ হাতে পেয়ে আশুবাবু হয়ত সমস্ত ক্ষতি পূরণ ক'রে নিচ্চেন।

কমল প্রশ্ন করিল, রোজ যান, এ দুদিন যাননি কেন?

অজিত কহিল, সে খবর আমাদের চেয়ে আপনি বেশি জানেন। সম্ভবতঃ আপনি ছেড়ে দেননি বলেই তিনি যেতে পারেননি। নইলে, স্বেচ্ছায় গর-হাজির হয়েছেন এ তো তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হয়না।

কমল কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল। কহিল, কে জানে তিনি ওখানে যান গান-বাজ্না করতে। বাস্তবিক, মানুষকে জবরদস্তি ধরে রাখা বড় অন্যায়, না?

অজিত বলিল, নিশ্চয়।

কমল কহিল, উনি ভালো লোক তাই। আচ্ছা, আপনাকে কেউ যদি ধরে রাখ্‌তো, থাকৃতেন?

অজিত বলিল, না। তা ছাড়া আমাকে ধরে রাখ্‌বার তো কেউ নেই?

কমল হাসিমুখে বার দুই তিন মাথা নাড়িয়া বলিল, ঐ তো মুস্কিল। ধরে রাখ্‌বার কে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে জান্‌বার যো নেই। এই যে আমি সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ধরে রেখেচি তা টেরও পান্‌নি। থাক্ থাক্, সব কথার তর্ক করেই বা হবে কি? কিন্তু কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্চে, যাই আমি ওঘর থেকে চা' তৈরি করে আনি।

আর একলাটি আমি চুপ্‌ কোরে বসে থাকবো? সে হবেনা।

হবার দরকার কি। এই বলিয়া কমল সঙ্গে করিয়া তাহাকে পাশের ঘরে আনিয়া একখানি নূতন আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। কিন্তু বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ কোরে কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসৃতে দিয়ে বল্‌বো,—কিন্তু সে তো আর আর-একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু,—তবুও আপনাকে বসৃতে তো দিলাম। অথচ, কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান!

ইহার অর্থ যে কি ভাবিয়া পাওয়া দায়। হয়ত অতিশয় সহজ, হয়ত ততোধিক দুরূহ। তথাপি অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বলিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিল, তবুও কহিল, তাঁকেই বা বসৃতে দেন্‌নি কেন?

কমল কহিল, এই তো মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাদের নিজের হাতে, কিন্তু কোথায় বোসে যে কে সমস্ত হিসেব ওলট-পালট কোরে দেয় কেউ তার সন্ধান পায়না। আপনার চায়ে কি বেশি চিনি দেব?

অজিত কহিল, দিন। চিনি আর দুধের লোভেই আমি চা খাই, নইলে ওতে আমার কোন স্পৃহা নেই।

কমল কহিল, আমিও ঠিক তাই। কেন যে মানুষে এগুলো খায় আমি ত ভেবেই পাইনে। অথচ এর দেশেই আমার জন্ম।

আপনার জন্মভূমি বুঝি তা'হলে আসামে?

শুধু আসাম নয়, একেবারে চা-বাগানের মধ্যে।

তবুও চায়ে আপনার রুচি নেই?

একেবারে না। লোকে দিলে খাই শুধু ভদ্রতার জন্যে।

অজিত চায়ের বাটি হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, এইটি বুঝি আপনার রান্নাঘর?

কমল বলিল, হাঁ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি? কিন্তু কই, আজকে রাঁধবার ত সময় পাননি?

কমল কহিল, না।

অজিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার জিজ্ঞাসা করুন তাহলে আপনি খাবেন কি? তার জবাবে আমি বোলব, রাত্রে আমি খাইনে। সমস্ত দিনে কেবল একটিবার মাত্র খাই।

কেবল একটিবার মাত্র ?

কমল কহিল, হাঁ। কিন্তু এর পরেই আপনার মনে হওয়া উচিত, তাই যদি হোলো, তবে শিবনাথবাবু বাড়ী এসে খাবেন কি ? তাঁর খাওয়া তো দেখেচি,—সে তো আর এক আধবারের ব্যাপার নয় ? তবে ? এর উত্তরে আমি বোলব তিনি ত আপনাদের বাড়ীতেই খেয়ে আসেন,—তাঁর ভাবনা কি ? আপনি বল্‌বেন, তা' বটে, কিন্তু সে তো প্রত্যহ নয়। শুনে আমি ভাব্‌বো এ কথাব জবাব পরকে দিয়ে আর লাভ কি ? কিন্তু তাতেও আপনাকে নিরস্ত করা যাবেনা। তখন বাধ্য হয়ে বল্‌তেই হবে, অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেননা। শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ বোধহয় তাঁর কেটেছে।

অজিত সত্যসত্যই এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলনা। গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে ? আপনি কি রাগ কোরে বল্‌ছেন ?

কমল কহিল, না রাগ কোরে নয়। রাগ করবার বোধহয় আজ আমার জোর নেই। আমি জানতাম পাথর কিনতে তিনি জয়পুরে গেছেন, আপনার কাছেই প্রথম খবর পেলাম আগ্রা ছেড়ে আজও তিনি যান্‌নি। চলুন ও ঘরে গিয়ে বসিগে।

এ ঘরে আনিয়া কমল বলিল, এই আমাদের শোবার ঘর। তখনও এর বেশি একটা জিনিসও এখানে ছিলনা,—আজও তাই আছে। কিন্তু সেদিন এদের চেহারা দেখে থাক্‌লে আজ আমাকে বল্‌তেও হোতোনা যে আমি রাগ করিনি। কিন্তু আপনার যে ভয়ানক রাত হয়ে যাচ্ছে অজিতবাবু ? আর তো দেরী করা চলেনা।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, আজ তা'হলে আমি যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত কহিল, যদি অনুমতি করেন ত কাল আসি।

হাঁ, আস্বেন। এই বলিয়া সে পিছনে পিছনে নিচে নামিয়া আসিল।

অজিত বার কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, যদি অপরাধ না নেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। শিবনাথবাব কত দিন হ'ল আসেননি?

হ'ল অনেক দিন। এই বলিয়া সে হাসিল। অজিত তাহার লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্ব্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।

৯

অজিত যখন বাড়ী ফিরিল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকান-পাট বন্ধ,—কোথাও মানুষের চিহ্ন মাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না-হয়ত দুইটা,—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আশুবাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত; শোওয়ার কথা দূরে থাক্, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায়

না। বরঞ্চ, মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু, মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার ছিলনা, না হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবিতে হয়না।

গেট খোলা ছিল। দরওয়ান সেলাম করিয়া জানাইলে যে সোফার নাই, সে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ী আস্তাবলে রাখিয়া অজিত আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বল্‌চি' কি একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। কতবার তোমাকে বলেচি, পথে-ঘাটে কখনো একলা বার হতে নেই। বুড়োর কথা খাট্‌লো ত? শিক্ষে হোল ত?

অজিত সলজ্জে একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোল্‌বার জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত।

দুঃখ কাল কোরো। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দ্যাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোওগে। কাল শুনবো সব কথা। যদু! যদু!—সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুজ্‌তে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্যায়। এত বড় সহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজ্‌বে?

আশুবাবু বলিলেন, তুমি ত বল্‌লে অন্যায়। কিন্তু আমাদের যা' হচ্ছিল তা' আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে,—মণিই বা গ্যালো কোথায়? তাকেও ত তখন থেকে দেখ্‌চিনে।

অজিত কহিল, বোধ হয় শুয়েছেন।

শোবে কি হে? এখনো যে তার খাওয়াও হয়নি। বলিয়াই

তাঁহার হঠাৎ একটা কথা মনে হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখ্‌লে ?

অজিত কহিল, কই না।

তবেই হয়েছে। এই বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তায় আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেচি তাই। গাড়ীটা নিয়ে সেও দেখ্‌চি খুঁজতে বেরিয়েছে। দ্যাখো দিকি অন্যায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলেনি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন্ ফির্‌বে কে জানে। আজ রাতটা তা হ'লে জেগেই কাটলো।

আমি দেখ্‌চি গাড়ীটা আছে কি না। এই বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ী মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পা ঠুকিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নিচের বারান্দার উত্তর প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও ঘরে আলো জ্বলিতেছে কি না জানিবার জন্য অজিত সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্যে হইতে মানুষের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা হইতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়,—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের প্রয়োজন ছিলনা। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিল ; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। উভয়ের কেহ জানিতেও পারিলনা তাহাদের এই নিশীত বিশ্রম্ভালাপের কেহ সাক্ষী রহিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে?

অজিত কহিল, গাড়ী-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যাননি।

বাঁচালে বাবা। এই বলিয়া আশুবাবু নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হ'ল, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ আর দেখ্‌চি মেয়েটার খাওয়া হ'লনা। যাও বাবা, তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়োগে।

অজিত বলিল, এত রাত্রে আমি আর খাবোনা, আপনি শুতে যান্।

যাই। কিন্তু কিছুই খাবোনা? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না, কিছুই না। আপনি আর বিলম্ব করবেননা। শুতে যান।

এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত সুরের আলোচনা শেষ হইলে পিতার খবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে।

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। যদু বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল, মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল অজিত তাহার ঘরে খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারো ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়ী-বারান্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালায় গিয়া পড়িয়াছিল।

কে?

আমি অজিত।

বাঃ! কখন্ এলে? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথার বেগ তাহাকে থামিতে দিলনা। বলিতে লাগিল, ছাখো তো তোমার

অন্যায়। বাড়ীশুদ্ধ লোক ভেবে সারা,—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল। তাই তো বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এই সকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিলনা।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেননি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা খবর দিইগে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই শুতে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন? তবে আমাকে একটা খবর দিলেনা কেন?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।

ঘুমিয়ে পোড়ব কি রকম? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্য্যন্ত।

তাহলে খেয়ে শোওগে। রাত আর নেই।

তুমি খাবেনা?

না। এই বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বাঃ! বেশ তো কথা! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে ফুটিলনা। কিন্তু ভিতর হইতেও আর জবাব আসিলনা। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া, রাগ করিয়া, নিজের জিদ্ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই,—এখন কিসে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে,—বাড়ীশুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই,—এতবড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিলনা। এবং, শুধু কেবল জিহ্বাই নির্ব্বাক নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত বিবশ হইয়া রহিল। জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিলনা, সে রহিল কি গেল এটুকু জানারও কেহ

প্রয়োজন বোধ করিলনা। গভীর নিশীথে এম্‌নি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু খবর পাইলেন কাল অজিত কিম্বা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটেছিল, না?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল।

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরি হল যে?

অজিত শুধু কহিল, এম্‌নিই।

মনোরমা নিজে চা খায়না। সে পিতাকে চা তৈরি করিয়া দিয়া একবাটি চা ও খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিলনা, মুখ তুলিয়াও চাহিলনা। উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ্য করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কন্যাকে নিরালায় পাইয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভালো নয়। অজিতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক্, তবুও এ বাড়ীতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্য্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই।

মনোরমা কহিল, দেওয়া চাইনে এ কথা তো আমি বলিনি বাবা।

না না, বলোনি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

মনোরমা বলিল, তা' মানি। কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েছে এ তুমি কার কাছে শুন্‌লে?

আশুবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেননা। তিনি শোনেননি কিছুই, জানেননা কিছুই, সমস্তই তাঁহার অনুমান মাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইলনা। কারণ, এমন করিয়া তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃ-চিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায়না। খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেননা, আমিও শুতে গেলাম ;—তুমি তো আগেই শুয়ে পড়েছিলে,—কি জানি, কোথায় হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। ওঁর মনটা আজ তেমন ভালো নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারা রাত পথে কাটাতে চায় আমাদেরও কি তার জন্যে ঘরেব মধ্যে জেগে কাটাতে হবে ? এই কি অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য বাবা ?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তাহলে তাঁর কর্ত্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে ঢের বড় সম্মানিত অতিথি বাত-ব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। কিন্তু সে অর্থে যদি অন্য কাউকে বোঝায় তো তাঁর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পোড়্‌ল মণি। তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলামনা। শুধু একটা রাত মাত্রই নয়,—তবু একজন তাই নিয়ে গোটা তিনটে রাত্রি জানলায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কর্ত্তব্য কে নির্দ্দেশ ক'রেছিলেন তখন জিজ্ঞেসা করা হয়নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হলে এ কথা জেনে নিতে ভুলবোনা। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া কন্যার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ দুটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে

উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তবু আর পুরাতন হয় না যখনই মনে পড়ে তখনই নূতন হইয়া দেখা দেয়।

ঝি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু বোসো, আমি রান্নার জোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশি দূর গড়াইবার সময় পাইল না, ইহাতে সে স্বস্তি বোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠি-পত্র লিখিতেছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে সে প্রায় কথাই কহিলনা, এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য দিনের তুলনায় তাহা যেমন রূঢ়, তেম্‌নি বিস্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি ?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল, এখনও বিশেষ কোনদিকে না চাহিয়াই কহিল, জানিনে তো বাবা।

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি তো জেগেই ছিলাম। খেতেও বোল্‌লাম্‌, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে বলে সে নিজেই খেলেনা। তোমার শুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে এমন কি অন্যায় হয়েছে আমি তো ভেবে পাইনে। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত কোরে মনে নেবে এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে ?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন ?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞাসা করবার কি আছে বাবা ?

জিজ্ঞাসা করিবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন,—বিশেষতঃ, মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ তো খুব স্পষ্ট। বোধ হয় সে ভেবেচে তুমি তাকে উপেক্ষা করো। এ রকম অন্যায় ধারণা তো তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে ধারণা যদি তিনি অন্যায় করে থাকেন সে তাঁর দোষ। একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর এক-জনকে গায়ে পোড়ে নিতে হবে বাবা ?

পিতা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেননা। মেয়েকে তিনি যেভাবে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাহার আত্ম-সম্মানে আঘাত পড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেননা। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলাপাড়া করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। এরূপ কলহ ঘটিয়াই থাকে, এবং এ ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও জোর পাইলেননা। অজিতকে তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়া সুশিক্ষিতই নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা চরিত্রের সত্যপরতা তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের কোনমতেই সামঞ্জস্য হয়না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্তে রাগ করিয়া রহিল এমন অসম্ভব যে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপব হইল মীমাংসা করা কঠিন।

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ী গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু খবর লইয়া জানিলেন গাড়ী আসিয়াছে অজিতের জন্য।

অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তিনি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টাঙ্গা কি হবে অজিত?

একবার বেড়াতে বার হবো।

কেন, মোটর কি হ'লো? আবার বিগড়েচে নাকি?

না। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে তো।

যদি হয়ও, তার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ী আছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বোলো। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেচে?

অজিত কহিল, কই, আমি তো জানিনে। তবে, আজও আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আন্‌তে, বাড়ী পৌঁছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশি। ঘোড়ার গাড়ীতে ঠিক হয়ে উঠ্‌বেনা।

সকাল হইতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল, কাল সভাভঙ্গের পরে আজিকার জন্যও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরেই মজ্‌লিশ্‌ বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও যে মনোরমার ছিল, এই সঙ্গে এ কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ প্রচ্ছন্ন কলহের মানসিক অস্বচ্ছন্দতায় কথাটা তাঁহাব নিজেরই মনে নাই, এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিল না, তখন মেয়ের কাছে যে আজ এ সকল কতদূর বিরক্তিকর তাহা স্বতঃ-সিদ্ধের মত অনুমান করিয়া কহিলেন, আজ ও-সব হবেনা অজিত।

অজিত কহিল, কেন?

কেন? মণিকেই একবার জিজ্ঞেসা কোরে দেখোনা। এই বলিয়া তিনি বেহারাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিয়া কন্যাকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ কোরে আছো বাবা, গান-

বাজ্‌না শুন্‌বে কে? মণি? আচ্ছা, সে সব আর একদিন হবে, এখন, যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসোগে। কিন্তু বেশি দেরি করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চল্‌বেনা তা' বলে দিচ্চি। ড্রাইভার ব্যাটা যে কুড়ে হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্যার অভাবনীয় সুমীমাংসা করিয়া উচ্ছল আনন্দে আরাম-কেদারায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ফোঁস্‌ করিয়া পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া কোরে বেড়াতে? ছি!

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। সাড়া পাইয়া আশুবাবু আবার সোজা হইয়া বসিলেন, সকৌতুক স্নিগ্ধহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে তো মা? না একদম্‌ ভুলে বসে আছো?

কি বাবা?

আজ যে সকলের নেমতন্ন? তোমাদের গানের পালা শেষ হলে তাঁদের যে আজ খাওয়াবে,—বলি, মনে আছে তো?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আছে বই কি। মোটর পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁদের আন্‌তে।

মোটর পাঠিয়েছো আন্‌তে? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ত্রুটি হবেনা।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের পরে কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার

লজ্জা করে। কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই,—তিনি থাক্‌লে আমাকে এ কথা বল্‌তে হোতোনা।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর পরে তুমি কেন রাগ করে আছো এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার কোরে নিতেন,—কিন্তু তিনি তো নেই,—আমাকে কি তা' বলা যায়না?

তাঁহার কণ্ঠস্বর এম্‌নি সকরুণ যে ক্লেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্ত্তা হয়নি?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল? কখন্ হল? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, অতরাত্রি পর্য্যন্ত নিরর্থক জেগে থাকা সহজও নয়, উচিতও নয়। ঘুমুলে অন্যায় হোতোনা, কিন্তু তিনি ঘুমোন্‌নি। আপনি শুতে যাবার খানেক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপরে।

তারপরে আর কোন কথা আপনাকে বোলবনা। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল পর্য্যন্ত আমি এখান্ থেকে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল সে তিনি শুনিতে

পাইলেন। মিনিট কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া নিমন্ত্রিতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল সেও তাঁহার কানে গেল। কিন্তু তিনি নড়িলেননা, সেইখানেই মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। বৈঠক বসিলে বেহারা গিয়া সম্বাদ দিল বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিলনা, খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল,—সকলেরই বারবার করিয়া মনে হইতে লাগিল বাড়ীর একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন, এবং আর একজন তাঁহার বিপুল দেহ ও প্রসন্ন স্নিগ্ধহাস্য লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন আজ সেখানটা শূন্য পড়িয়া আছে।

১০

এদিকে অজিতের গাড়ী আসিয়া কমলের বাটীর সম্মুখে থামিল। কমল পথের ধারের সঙ্কীর্ণ বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া ছিল, চোখো-চোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। গাড়ীটাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন। সুমুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে।

সিঁড়ির মুখেই আবার দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে তো দিলেন, কিন্তু ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত?

কমল বলিল, না। কতটুকুই বা পথ হেঁটে যাবেন।

হেঁটে যাবো?

কেন, ভয় করবে নাকি? নাহয়, আমি নিজে গিয়ে আপনাকে

বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো। আসুন। এই বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্না-ঘরে আনিয়া বসিবার জন্য কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন ধরে আমি কত রান্না রেঁধেচি। আপনি না এলে রাগ কোরে আমি সমস্ত মুচিদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত বলিল, আপনার রাগ তো কম নয়। কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবারগুলোর ঢের বেশি সদ্গতি হোতো।

এ কথার মানে ? এই বলিয়া কমল ক্ষণকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ, আপনার অভাব নেই,—হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে,—কিন্তু তাদের অত্যল্প অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং, তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্ব্যবহার, এই না ?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ ছাড়া আর কি!

কমল বলিল, এ হোলো সাধু লোকদের ভাল-মন্দর বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধির যুক্তি। পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে লিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝেনা যে আসলে ঐটেই হোলো ভূয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ের অন্যায়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ কথা তারা জানবে কোথা থেকে ?

অজিত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, মানুষের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ভেতরে আনন্দ নেই নাকি ?

কমল কহিল, না, নেই। কর্ত্তব্যের মধ্যে যে আনন্দের ছলনা সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হয়। সেই তো বন্ধন। তা' না হ'লে এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি, ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ

পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে বসে রেঁধেচি—আপনি এসে খাবেন ব'লে, এত বড় অকর্ত্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোন্ খানে? অজিত বাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেননা, বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উল্টো কথার অর্থ যদি কখনো আপনা থেকেই উপলব্ধ হয়, সেদিন কিন্তু আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক্, আপনি খেতে বসুন। এই বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলামনা, কিন্তু তবুও মনে হচ্চে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতেও পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিত বাবু, আমি? আমার দরকার? এই বলিয়া সে হাসিয়া বাকি পাত্রগুলা অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেননা যে কাল আমার খাওয়া হয়নি।

কমল কহিল, জানিনে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাতে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেননা। তাই হয়েছে। আমার দোষেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুদ শুদ্ধ আদায় হচ্চে। কথাটা বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু, আমি একেবারে জন্তুর মত স্বার্থপর। সারাদিন আপনি খান্‌নি, অথচ, সেদিকে আমার হুঁস নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়ে

বড়। তাই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েছি অজিত বাবু। এই বলিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, আর এ সব মাছ-মাংসের কাণ্ড। আমি তো খাইনে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। এই বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল ডাল আর আলু সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্তি হইলনা, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল, কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিস্ময় লেগেছিল তা বল্‌তে পারিনে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে তো আমার রূপ। কিন্তু সেও হার মেনেছে অক্ষয় বাবুর কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মাণিক। তাঁর গায়ে আঁচড় পড়েনা। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ যেন ধৈর্য্য থাকেনা,— রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যকেই যেন আপনি আমল দিতে চান্‌না। হাত বাড়িয়ে পথ আগ্‌লানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত ক্ষুন্ন হইল। বলিল, তা হবে। কিন্তু আমার চেয়েও বড় বিস্ময় সেখানে ছিল,—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেম্‌নি বিরাট শান্তি। ধৈর্য্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছয় না। ইচ্ছে হয়, আমি যদি তাঁর মেয়ে হোতাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের

মধ্যে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তথাপি কহিল, আপনাদের উভয়ের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিল্‌তো কি কোরে?

কমল বলিল, তা জানিনে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বোল্‌লাম। মণির মত আমিও যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেননা। তিনিও এম্‌নি ধীর, এম্‌নি শান্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্যা, ছোট জাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল। এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখে তাহার জন্মরহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিতে আঘাত করে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারিলনা। কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইল। কিন্তু তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক। তার পরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্চি।

না, সে হবেনা। আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে একপাও উঠ্‌বোনা।

বেশ মানুষ ত। এই বলিয়া কমল বসিয়া আহার্য্য-দ্রব্যের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যুক্তি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দিন সে কি খায়, না খায়, সে জানেনা। কিন্তু আজ এত প্রকার

পর্য্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও এই স্বেচ্ছাকৃত অন্ন-পীড়নে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায়, এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং, যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্ম-সংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল। এবং বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি রহিলনা। কমলের খাওয়ার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া এই ভাবটাকে সে আর চাপিতে পারিলনা, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে কোরে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে গ্লানি কোরে বেড়ায়, তারা কিন্তু আপনার পাদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা' জানিনে, কিন্তু এ আমি শপথ কোরে বল্‌তে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন তো একটা প্রশ্ন করি!

কি প্রশ্ন?

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ্র অবলম্বন করেছেন?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এমনি খাই। এতে আমার কষ্ট হয়না।

অজিতের মুখের উপরে যেন কে কালী ঢালিয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল না কি?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন আসামীয়া ক্রীশ্চান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পোড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেড ক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিলনা, মাকে তিনি আশ্রয় দিলেন। আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এই রকম নানা দুঃখ কষ্টে পোড়ে এক বেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্র-সাধনা আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুই-ই ভাল থাকে।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেছি জাতে তাঁতি।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে। কিন্তু মা বল্‌তেন তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যি-কার মাতামহ তাঁতি নয় বৈদ্য। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা' তিনি যে-ই হোন্, এখন রাগ করাও বৃথা, আপ্‌শোষ করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মা'র রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিলনা। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু বাঁচলেননা,—কয়েক মাসেই জ্বরে মারা গেলেন। বছর তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিবরণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল। তাহার সব চেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এতবড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিলনা। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র! তার বেশি নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাপ ছিলেন সাধু লোক।

চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায়—এমন মানুষ খুব কম দেখেছি অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

অজিতের একবার সন্দেহ হইল এ হয়ত উপহাস করিতেছে। কিন্তু এ কি উপহাস? কহিল, এসব কি আপনি সত্যি বল্‌চেন?

কমল একটু আশ্চর্য্য হইয়াই জবাব দিল, আমি তো কখনই মিথ্যে বলিনে অজিতবাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্য তাহার মুখের পরে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, এ জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বারবার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলনা। বলিল, আপনি ইংরেজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরিজি জানাটাও ত উচিত।

প্রত্যুত্তরে, কমল শুধু একটুখানি মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, চলুন ও ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠ্‌বো।

বস্‌বেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর আমার সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। হয়ত, কারণটাও অনুমান করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, যান।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত খুঁজিয়া পাইল না। শেষে কহিল, আপনি কি এখন আগ্রাতেই থাকবেন?

কেন?

ধরুন শিবনাথ বাবু যদি আর না-ই আসেন। তাঁর পরে তো আপনার জোর নেই।

কমল কহিল, না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে তো তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিয়ে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে। বাড়ী-ভাড়াটা এ মাসের দেওয়াই আছে, আমি তা'হলে কাল পর্শু চলে যেতে পারি।

কোথায় যাবেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আস্‌বার সময় আপনার জন্যে কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিলাম! নেবেন।

না।

না কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি আপনার হাতে কিছু নেই। যাও বা ছিল, আজ আমারই জন্যে তা' নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয়না?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নয়।

না-ই হোলাম। কিন্তু অ-বন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয়? আবার শোধ দেয়। আপনি তাই কেন নিননা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে বলেচি আমি কখখোই মিথ্যে বলিনে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। অজিত বুঝিল ইহার অন্যথা হইবেনা। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ তাহাও নাই। সম্ভবতঃ, বাড়ী-ভাড়া

ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে শেষ হইয়াছে! সহসা ব্যথার ভারে তাহার মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির?

কমল কহিল, তা ছাড়া উপায় কি আছে?

উপায় কি আছে সে জানেনা। এবং জানে না বলিয়াই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল! শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যাঁর কাছে এ সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারেন?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি। কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্চে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা'হলে আসুন। নমস্কার। এই বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট দুই সেইখানে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

১১

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের অবধি নাই। আশুবাবুর বসিবার ঘরের শার্সিগুলা সারাদিনই বন্ধ আছে, তিনি আরাম-কেদারার দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন, সেই কাগজের পাতায় পিছনের দরজার দিকে

একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার বেহারার দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠোনি তো বাবা, তা'হলে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্ট বোধ না করো ত গায়ের কাপড়টা দিয়ে গরীবের পা দু'টো একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একখানা মোটা বালাপোষ লুটাইতেছিল, আগন্তুক সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাঁহার দুই পা ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবাবু কহিলেন, হয়েছে বাবা, আর অতি-যত্নে কাজ নেই। এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাওগে,—এখনো একটু বেলা আছে। কিন্তু বুঝবে বাবা কাল।

অর্থাৎ কাল তোমার চাকুরি যাইবেই। কোন সাড়া আসিলনা, কারণ প্রভুর এবম্বিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবাবু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন, এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অভিভূতের মত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, তাই তো বলি, একি যোদোর হাত। এমন কোরে পা ঢেকে দিতে তো তার চোদ্দ পুরুষে জানেনা।

কমল বলিল, কিন্তু এদিকে যে হাত পুড়ে যাচ্চে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন, এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার

প্রশ্নের যে কোন অর্থ নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেননা, বলিলেন, ওখানে নয় মা, তুমি আমার খুব কাছে এসে বোসো। এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এমন হঠাৎ যে কমল?

কমল কহিল, আজ ভারি ইচ্ছে হ'ল আপনাকে একবার দেখে আসি,—তাই চলে এলাম।

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেচো। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী সাথী নাই, কেহ তাহাকে চাহেনা, কাহারও বাটীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই,—নিতান্ত নিঃসঙ্গ জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—কমল, তোমার যখন খুসি স্বচ্ছন্দে আসিয়ো। আর যাহার কাছেই হোক্, আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই তিন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলা নীচে খসিয়া পড়িতে কমল হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন কোরলাম।

আশুবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে তা না পড়লেও চলে—পড়বার ইচ্ছেও নেই। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, তা'ছাড়া তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকতেই তো হবে, তার চেয়ে বোসে দু'টো গল্প করো আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি তো আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করিতে পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু আর সকলে রাগ করবেন যে? তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও আশুবাবু ব্যথা পাইলেন; কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যে নয় কমল। কিন্তু যাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালী। তাঁর স্ত্রী হচ্চেন মণির বন্ধু, এক সঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন দুই হ'ল তিনি স্বামীর কাছে এসেছেন,—মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, আপনি বল্‌লেন যাঁরা রাগ করবেন। একজন তো মনোরমা, কিন্তু বাকি কারা?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হোতো অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিদ্বেষই যেন সবচেয়ে বেশি। যেন অক্ষয় বাবুকেও হার মানিয়েছে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখিনি, কিন্তু হঠাৎ দিন দুত্তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই। এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।

এবার কমল হাসিল, কহিল অর্থাৎ, কুশাঙ্কুরের উপর বজ্রাঘাত! কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরে তুচ্ছ একজন মেয়ে মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্যে? আমি তো কারও বাড়ীতে যাইনে।

আশুবাবু বলিলেন, তা' যাওনা সত্যি। সহরের কোথায় তোমাদের বাসা তাও কেউ জানেনা, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয় কমল। তাই তোমাকে এরা ভুলতেও পারেনা, মাপ করতেও পারেনা। তোমার

আলোচনা না ক'রে, তোমাকে খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই, শান্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলা তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এটা কি জানো? অক্ষয় বাবুর রচনা। ইংরিজী না হলে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। নাম ধাম নেই, কিন্তু এর আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা, তোমাকেই আক্রমণ। কাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে নাকি নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধন হবে,—এ তারই মঙ্গল-অনুষ্ঠান। এই বলিয়া তিনি সেগুলা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, এ শুধু প্রবন্ধ নয়, মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বার করা হয়েছে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই,—বিরোধ থাকতেই পারে না, কিন্তু, এ তো সে নয়। ব্যক্তি-বিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে পারাই যেন এর আসল আনন্দ। কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমায় আনন্দ তো এক নয় কমল, একে তো আমি ভাল বলতে পারিনে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি তো আর এ লেখা শুনতে যাবোনা,—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতাই নেই। তাই বোধহয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছে। ভেবেছে ভরাডুবির মুষ্টি লাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শটুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিলনা, তবু তাহার ভিতরটায় কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া কহিল, আপনার দুর্ব্বলতাটুকু তাঁরা ধরেছেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁরা চিনতে পারেননি।

তুমিই কি পেরেচো মা?

বোধহয় ওঁদের চেয়ে বেশি পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেননা, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই ভাবে এই সদানন্দ বুড়ো-লোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিষয় আশয়—

কিন্তু সে তো মিথ্যে নয়।

আশুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে! কিন্তু ও মানুষের কতটুকু কমল ?

কমল সহাস্যে কহিল, অনেকখানি আশুবাবু।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন, যদি কিছু না মনে করো ত তোমাকে একটা কথা বলি,—

বলুন।

আমি বুড়োমানুষ, আর তুমি আমার মণির সম-বয়সী। তোমার মুখ থেকে আমার নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধে কমল। তোমার বাধা না থাকে তো আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকো।

কমলের বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায় আছে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া,—বাতে পঙ্গু। বাজারে আশুবদ্যির কেউ কানা-কড়ি দাম দেবেনা। এই বলিয়া তিনি সহাস্য কৌতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, না-ই দিলে মা, কিন্তু যার বাবা বেঁচে নেই তার অত খুঁত্‌খুঁতে হলে চলেনা। তার খোঁড়া-কাকাই ভালো।

অন্য পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁচাই দেয় কমল, তাকে বিনয় কোরো বোস্বো, এই আমার ঢের। বোলো, গরীবের রাঙই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রু নিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিলনা। এই দু'জনের কোথাও মিল নাই; শুধু অনাত্মীয়-অপরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়, শিক্ষা, সংস্কার, রীতি-নীতি, সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ! কোন সম্বন্ধই যেখানে নাই, সেখানে শুধু কেবল একটা সম্বোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে কমলের চোখে বহুকাল পরে জল আসিয়া পড়িল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে তো বল্‌তে?

কমল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল, না।

না? না কেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিলনা, অন্য কথা পাড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায়?

আশুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি, হয়ত' বাড়ীতেই আছে! পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার কাছে বড় একটা সে আসেনা। হয়ত সে এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবে।

কোথায় যাবেন?

আশুবাবু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব কথা বলে মা? বলে না। হয়ত' প্রয়োজনও বোধ করেনা। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধহয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেছে। কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কয়না।

কমল নীরব হইয়া রহিল, আশুবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,

জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজ্‌না নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরোনো অভ্যাস সুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার জোগাড় করচে। এই তো চল্‌চে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলনা, কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরোনো অভ্যাস ?

আশুবাবু বলিলেন, সে অনেক। ও গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী হয়েছে, মণিকে ভাল বেসেছে, দেশের কাজে হাজতে গেছে, বিলেত গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ফিরে এসে সংসারী হবার ইচ্ছে,—কিন্তু, সম্প্রতি বোধহয় সেটা একটু বদ্‌লেছে। আগে মাছ-মাংস খেতোনা, তারপরে খাচ্ছিলো, আবার দেখ্‌চি পরশু থেকে বন্ধ করেছে! যদু বলে বাবু ঘণ্টাখানেক ধ'রে ঘরে বোসে নাক টিপে নাকি যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন ?

হাঁ। চাকরটাই বল্‌ছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্র-যাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সমুদ্র-যাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবেন ? অজিতবাবু ?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ওর হ'ল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল। এবং, যে ভৃত্য এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়াছে সেই আসিয়া সশরীরে দণ্ডায়মান হইল। এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা

করাই যাঁহার স্বভাব, সেই আশুবাবুর পর্য্যন্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে আগন্তুক ভদ্রব্যক্তিরা ঘরে ঢুকিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ এই মেয়েটির এখানে এভাবে দর্শন মিলিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

অবিনাশ হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ-ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। সে সোজা পথে সোজা মৎলবে কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ষণ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর্টিকেলটা পড়লেন? বলিয়াই তাহার নজরে পড়িল সেই লেখাটা মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক্‌না অক্ষয়বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা ফেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া অক্ষয় কাগজগুলা কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ও-ধারের সোফায় বসিয়া সেই দিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইতে সুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল আমিও অক্ষয়ের লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েচি, আশুবাবু। ওর অধিকাংশই সত্য, এবং মূল্যবান। দেশের সামাজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় তো সু-পরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্ত্তব্য। ইয়োরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি, নিজেদের বহু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েচে, মানি, কিন্তু আমাদের সংস্কার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর

যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি লোভ বা মোহের বশে তাঁদের ভ্রষ্ট করি আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু ?

কথাগুলি ভালো, এবং সমস্তই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু আত্ম-প্রসাদের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে বার কয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে তো তর্ক নেই অবিনাশবাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ কথা বলে আসৃছেন, এবং বোধহয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করে না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার যো নেই। এবং, এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারী-কল্যাণ-সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বোল্‌ব।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার তো আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। আমিও বাতে কাবু। আমি না যাই, কিন্তু এ তোমাদেরই ভাল-মন্দর কথা। হাঁ কমল, তোমার তো এ প্রস্তাবে আপত্তি নেই ?

অন্য সময়ে হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত, কিন্তু, একে তার মন খারাপ, তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষ-হীন সঙ্ঘ-বদ্ধ, সদম্ভ প্রতিকূলতায় মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু ? অনুকরণটা, না ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটা ?

আশুবাবু কহিলেন, ধরো, যদি বলি দু'টোই ?

কমল কহিল, অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিল্‌লেও প্রকৃতিতে ফাঁক থাকে। কিন্তু

ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অনুকরণ বলে লজ্জা পাবার তো কিছু নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বই কি কমল, আছে। ও রকম সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে নিঃশেষে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা না থাকে তো কিসের মধ্যে আছে বলো ত?

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব আশুবাবু। ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে,—কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার আদর। আসল কথা বর্ত্তমান কালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি না। এ ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ।

আশুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তার বেশি নয়?

কমল বলিল, না, তার বেশি নয়। কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সেই ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকে হারাই। সেইখানেই সত্যিকার লজ্জা আশুবাবু।

আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা'হলে তো সমস্ত একাকার হয়ে যাবে? ভারতবর্ষীয় বলে তো আমাদের আর চেনাও যাবে না? ইতিহাসে যে এমনতর ঘটনার সাক্ষী আছে।

তাঁহার কুণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া বলিল, তখন মুনি-ঋষিদের বংশধর ব'লে হয়ত চেনা যাবেনা, কিন্তু মানুষ বলে

চেনা যাবে। আর আপনারা যাঁকে ভগবান বলেন তিনিও চিন্‌তে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিল, ভগবান্‌ শুধু আমাদের ? আপনার নয় ?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিল, এ শুধু শিবনাথের প্রতিধ্বনি, শেখানো বুলি !

হরেন্দ্র কহিল, ক্রুট ?

দেখুন হরেন্দ্র বাবু—

দেখেচি। বিষ্ট।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ঢ্যাখো কমল, অপরের কথা বলিতে চাইনে, কিন্তু, আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম্ম, কত আদর্শ, কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান, শিল্প,—কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই তো আজও জীবিত আছে। এর কিছুই তো তাহলে থাক্‌বেনা ?

কমল কহিল, থাক্‌বার জন্যেই বা এত ব্যাকুলতা কেন ? যা' যাবার নয় তা' যাবেনা। মানুষের প্রয়োজনে আবার তারা নতুন রূপ, নতুন সৌন্দর্য্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে, বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগ্‌লে রাখ্‌তে হবে এ কেমন কথা ?

অক্ষয় বলিলেন, সে বোঝবার শক্তি নেই আপনার

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি অক্ষয় বাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি

বলিনে, কিন্তু যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা কোরচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলোনা কমল, বাইরের অনেক উৎপাত আমাদের সইতে হয়েছে, তবু যে আজও সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই। জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতেই বা দুঃখ কিসের? চিরকাল ধরেই যে তাদের যায়গা জু'ড়ে বসে থাক্‌তে হবে তারই বা আবশ্যকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অন্য কথা কমল।

কমল কহিল, তা হোক্। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্য্যদের একটা শাখা ইয়োরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই। কিন্তু তাঁদের বদলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেম্‌নি যদি এদেশেও ঘট্‌তো, ওদের মতই আমরা আজ পূর্ব্ব পিতামহদের জন্যে শোক করতে বোস্‌তামনা, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দম্ভ করেও দিনপাত কোরতামনা। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিম্বা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাও তো সত্য না হ'তে পারে। তখন আমরা বেঁচে যাবো কিসের জোরে বলুন ত?

আশুবাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিলেননা, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ আমাদের দানের মধ্যে, আমাদের পুণ্যের মধ্যে, আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির

অক্ষয়-সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তারই জোরে বেঁচে যাবো। হিন্দু কখনো মরেনা।

অজিত হাতের কাগজ ফেলিয়া তাঁহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল, এবং মুহূর্ত্ত কালের জন্য কমলও নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে, এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ-উদ্দেশ্যে বহু নারীর সমক্ষে দম্ভের সহিত পাঠ করিবে। এবং, এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুধু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জ্জয় ক্রোধে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারও সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার ইচ্ছে হয়না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আশুবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, কোন আদর্শ-ই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকালস্থায়ী হয়না, এবং তার পরিবর্ত্তনেও লজ্জা নেই,—এই কথাটাই আপনাকে আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুসি করতে দাতা-কর্ণ নিজের পুত্রহত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোকে কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ, এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল,—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিলনা,—কিন্তু আজ সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে; একদিন সে হয়ত শুধু অনুকম্পার ব্যাপার হবে। এই

নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহের বাড়াবাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নির্ম্মমতায় পলকের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ ব'লে নিচ্চো কেন, এ যে আমার আনন্দ। এ যে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বহু যুগের ধন।

কমল বলিল, হোক্ বহু যুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য্য হয়না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড় আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এঁদের হয়ত বিস্ময়ের অবধি নেই, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি! আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এমন নিবিড় ঘৃণা। কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরী করবার সময় নেই,—পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। যুক্তি যখন হার মানিল তখন এই ভাবে পুরুষের দল নিজেদের জয় ঘোষণা করিয়া পৌরুষ বজায় রাখিল। তাহারা চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেছ, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নয় মা।

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়মানুষ কাকাবাবু। আপনি তো এঁদের মত মিথ্যে নয়। কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চোল্‌লাম। এই বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, এই অভাবনীয় আচরণে আশুবাবু ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আস্‌বে মা?

আর হয়ত আমি আস্‌বনা কাকাবাবু। এই বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আশুবাবু সেইদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

১২

আগ্রার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর নাম মালিনী। তাঁহারই যত্নে এবং তাঁহারই গৃহে নারী-কল্যাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম অধিবেশনের উদ্যোগটা একটু ঘটা করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু জিনিসটা সুসম্পন্ন তো হইলই না, বরঞ্চ কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। ব্যাপারটা মুখ্যতঃ, মেয়েদের জন্যই বটে, কিন্তু পুরুষদের যোগ দেওয়ার নিষেধ ছিল না। বস্তুতঃ, এ আয়োজনে তাঁহারা একটু বিশেষ করিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভার ছিল অবিনাশের উপর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অক্ষয়ের নাম ছিল; লেখার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, তাঁহারই পরামর্শ মত একা শিবনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। অবিনাশের ছোট শালী নীলিমা

ঘরে ঘরে গিয়া ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সহরের সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্র মহিলাদের আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু, যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আশুবাবুর, কিন্তু বাতের কন্‌কনানি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিলনা, মালিনী নিজে গিয়া ধরিয়া আনিল। অক্ষয় লেখা-হাতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রচলিত দুই চারিটা মামুলি বিনয়-ভাষণের পরে সোজা ও শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ পাঠে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল তাঁহার বক্তব্য-বিষয় যেমন অরুচিকর তেম্‌নি দীর্ঘ। সচরাচর যেমন হয়, পুরাকালের সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি আধুনিক নারী-জাতির আদর্শ-বিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। একজন আধুনিক ও শিক্ষিতা মহিলার বাটীতে বসিয়া ইহাঁদেরই 'তথাকথিত' শিক্ষার বিরুদ্ধে কটূক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। কারণ, অক্ষয়ের গর্ব্ব ছিল এই যে, তিনি অপ্রিয় সত্য বলিতে ভয় পাননা। সুতরাং, লেখার মধ্যে সত্য যাহাই থাক্, অপ্রিয়-বচনের অভাব ছিল না। এবং এই 'তথাকথিত' শব্দটার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট উদাহরণের নজির যাহা ছিল—সে কমল। অনিমন্ত্রিত এই মেয়েটিকে অক্ষয় লেখার মধ্যে অপমানের একশেষ করিয়াছে। শেষের দিকে সে গভীর পরিতাপের সহিত এই কথাটা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই সহরেই ঠিক এমনি একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে যে ভদ্র সমাজে নিরন্তর প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। যে স্ত্রীলোক নিজের দাম্পত্য-জীবনকে অবৈধ জানিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাক্, শুধু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, বিবাহ-অনুষ্ঠান যাহার কাছে মাত্র অর্থহীন সংস্কার, এবং পতি-পত্নীর একান্ত একনিষ্ঠ প্রেম নিছক মানসিক দুর্ব্বলতা। উপসংহারে অক্ষয় এ কথারও উল্লেখ করিয়াছে, যে নারী হইয়াও নারীর গভীরতম আদর্শকে যে অস্বীকার করে, তথাকথিত সেই

শিক্ষিতা-নারীর উপযুক্ত বিশেষণ ও বাসস্থান নির্ণয়ে প্রবন্ধ লেখকের নিজের কোন সংশয় না থাকিলেও শুধু সঙ্কোচ বশতঃই বলিতে পারেন নাই। এই ত্রুটির জন্য তিনি সকলের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহেন।

মহিলা-সমাজে মনোরমা ব্যতীত কমলকে চোখে কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাহার রূপের খ্যাতি ও চরিত্রের অখ্যাতি পুরুষদের মুখে-মুখে পরিব্যাপ্ত হইতে অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি, এই নব-প্রতিষ্ঠিত নারী-কল্যাণ-সমিতির সভানেত্রী মালিনীর কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে, এবং, এ লইয়া নারী-মণ্ডলে, পর্দ্দার ভিতরে ও বাহিরে কৌতূহলের অবধি নাই। সুতরাং, রুচি ও নীতির সম্যক্ বিচারের উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশ্ন-মালার প্রখরতায় ব্যক্তিগত আলোচনা সতেজ হইয়া উঠিতে বোধকরি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু লেখকের পরম বন্ধু হরেন্দ্রই ইহার কঠোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। সে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, অক্ষয়-বাবুর এই লেখার আমি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলে নয়, কোন মহিলাকেই তাঁর অসাক্ষাতে আক্রমণ করার রুচি বিষ্ট্‌লি, এবং তাঁর চরিত্রের অকারণ উল্লেখ অভদ্রোচিত ও হেয়। নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধ লেখককে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

ইহার পরেই একটা মহামারী কাণ্ড বাধিল। অক্ষয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যা-খুসি তাই বলিতে লাগিলেন, এবং, প্রত্যুত্তরে স্বল্পভাষী হরেন্দ্র মাঝে মাঝে কেবল বিষ্ট এবং ব্রুট বলিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল।

মালিনী নূতন লোক, সহসা এই প্রকার বাক্-বিতণ্ডার উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সেই উত্তেজনার মুখে স্ব-স্ব মতামত প্রকাশ করিতে প্রায় কেহই কার্পণ্য করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন শুধু আশুবাবু। প্রবন্ধ পাঠের গোড়া হইতে সেই যে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া

ছিলেন সভা শেষ না হইলে আর তিনি মুখ তুলিলেন না। আরও একটি মানুষ তর্ক-যুদ্ধে তেমন যোগ দিলেন না। ইনি হরেন্দ্র-অক্ষয়ের আলাপ-আলোচনায় নিত্য-অভ্যস্ত অবিনাশ।

ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের ভাল-মন্দ নিরুপণ করা এই সমিতির লক্ষ্য নয়, এবং এ প্রকার আলোচনায় নর নারী কাহারও কল্যাণ হয়না মালিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ, লেখার মধ্যে আশুবাবুকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই কথা কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিয়া তাহার অতিশয় ক্লেশ বোধ হইল। সভা শেষ হইলে সে নিঃশব্দে নিজের আসন ছাড়িয়া আসিয়া এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পাশে বসিয়া লজ্জিত মৃদু কণ্ঠে কহিল, নিরর্থক আজ আপনার শান্তি নষ্ট করার জন্যে আমি দুঃখিত আশুবাবু।

আশুবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বাড়ীতেও তো আমি একাই বসে থাকৃতাম। তবু সময়টা কাটৃলো।

মালিনী কহিল, সে এর চেয়ে ভাল ছিল। একটু থামিয়া কহিল, আজ উনি নেই, মণি এখান থেকে খেয়ে যাবে।

বেশ, আমি ফিরে গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু আর সব মেয়েরা?

তাঁরাও আজ এখানেই খাবেন।

অবিনাশ ও অজিতকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবু গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, হরেন্দ্র ও অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদেরও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রাস্তা হইতে হইল, সমস্ত পথটা আশুবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। কমলকে উপলক্ষ করিয়া মেয়েদের মাঝখানে অক্ষয় তাঁহাকে অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়াছে এই কথা তাঁহার নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া বাসায় পৌঁছিল। নীচের বারান্দায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়া ছিল। বোম্বাই-ওয়ালার মত তাহার পোষাক, কাছে আসিয়া আশুবাবুকে ইংরাজিতে অভিবাদন করিল।

কি ?

জবাবে সে একটুকরা কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, চিঠি।

চিঠিখানি তিনি অজিতের হাতে দিলেন। অজিত মোটরের ল্যাম্পের আলোকে পড়িয়া দেখিয়া কহিল, চিঠি কমলের।

কমলের ? কি লিখেচে কমল ?

লিখেচেন, পত্রবাহকের মুখেই সমস্ত জানতে পারবেন।

আশুবাবু জিজ্ঞাসু মুখে তাহার প্রতি চাহিতেই সে কহিল, এ পত্র আর কাহারো হাতে পড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আপনি তাঁর আত্মীয়,—আমি কিছু টাকা পাই—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, আশুবাবু সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তার আত্মীয় নই, বস্তুতঃ, সে আমার কেউ নয়। তার হয়ে আমি টাকা দিতে যাবো কিসের জন্যে ?

গাড়ীর উপর হইতে অক্ষয় কহিল, just like her !

কথাটা সকলেরই কানে গেল। পত্রবাহক ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া কহিল, টাকা আপনাকে দিতে হবে না, তিনিই দেবেন। আপনি শুধু কিছুদিনের জন্যে জামিন হলে—

আশুবাবুর রাগ চড়িয়া গেল। বলিলেন, জামিন হওয়ার গরজ আমার নয়। তাঁর স্বামী আছে, ধারের কথা তাঁকে জানাবেন।

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্মিত হইল ; বলিল, তাঁর স্বামীর কথা তো শুনিনি।

খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন। Good night. এসো অজিত,

আর দেরি কোরোনা। এই বলিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। উপরের গাড়ী-বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আর একবার ড্রাইভারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে গাড়ী পৌঁছিতে যেন বিলম্ব না হয়। অজিত সোজা তাহার ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, বোস। মজা দেখ্‌লে একবার?

এ কথার অর্থ কি অজিত তাহা বুঝিল। বস্তুতঃ, তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা, শান্তিপ্রিয়তা ও চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার এই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের অকারণ ও অভাবিত রূঢ়তা একা অক্ষয় ব্যতীত আঘাত করিতে বোধ করি উপস্থিত কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কমল তাহার নির্জ্জন নিশীথ গৃহকক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারী-জীবনের অসংবৃত ইতিহাস একান্ত অবলীলায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিলনা। এম্‌নি করিয়া তাহার এই কয়টা দিন কাটিয়াছে। তাই আজ নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে আদর্শ-পত্নী-অক্ষয় নারীত্বের আদর্শ নির্দ্দেশের ছলনায় যত কটূক্তিই এই মেয়েটিকে করিয়া থাক্, অজিত দুঃখ বোধ করে নাই। এমনিই যেন সে আশা করিয়াছিল। তথাপি, অক্ষয়ের ক্রোধান্ধ বর্ব্বরতায় যত তীক্ষ্ণ শূলই থাক্, আশুবাবু এইমাত্র যাহা করিয়া বসিলেন, তাহাতে কমলের যেন কান মলিয়া দেওয়া হইল। কেবল অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া। কমলকে ভালো সে বলেনা। তাহার মতামত ও সামাজিক আচরণের সুতীব্র নিন্দায় অজিত অবিচার দেখে নাই। তাহার নিজের মধ্যে এই

রমণীর বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণার ভাবই পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। সে বলে ভদ্র-সমাজে যে অচল তাহাকে পরিত্যাগ করায় অপরাধ স্পর্শে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কি হইল! দুর্দ্দশাপন্ন, ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্য কয়টা টাকার ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যেন সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল। সেই রাত্রের সমস্ত আলোচনা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মাঝখানে সেই সকল চা-বাগানের অতীত দিনের ঘটনার বিবৃতি, তাহার মায়ের কাহিনী, তাহার নিজের ইতিহাস, ইংরাজ ম্যানেজার সাহেবের গৃহে তাহার জন্মের বিবরণ। সে যেমন অদ্ভুত তেমনি অরুচিকর। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? গোপন করিলেই বা ক্ষতি কি হইত? কিন্তু, দুনিয়ার এই সহজ সুবুদ্ধির জমা-খরচের হিসাব বোধ করি কমলের মনে পড়ে নাই। যদি বা পড়িয়াছে গ্রাহ্য করে নাই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য তাহার সুকঠিন ধৈর্য্য। দৈবক্রমে তাহারই মুখে সে প্রথম সম্বাদ পাইল যে শিবনাথ কোথাও যায় নাই, এই সহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখের পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এতবড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন সম্রাট-মহিষী মমতাজের স্মৃতি-সৌধের তীরে বসিয়া যে কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

আশুবাবু নিজেও বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সচেতন হইয়া পূর্ব্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, মজা দেখ্‌লে তো অজিত? আমি নিশ্চয় বল্‌চি এ ঐ শিবনাথ লোকটার কৌশল।

অজিত কহিল, না-ও হ'তে পারে। না জেনে বলা যায় না।

আশুবাবু বলিলেন, তা বটে! কিন্তু আমার বিশ্বাস এ চাল শিবনাথের। আমাকে সে বড়লোক বলে জানে।

অজিত কহিল, এ খবর তো সবাই জানে। কমল নিজেও না জানে তা নয়।

আশুবাবু বলিলেন, তা'হলে তো ঢের বেশি অন্যায়। স্বামীকে লুকোনো তো ভালো কাজ নয়।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, স্বামীর অগোচরে, হয়ত বা তাঁর মতের বিরুদ্ধে পরের কাছে টাকা ধার করতে যাওয়া স্ত্রীলোকের কতবড় অন্যায় বলো ত? এ কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া চলেনা।

অজিত কহিল, তিনি টাকা তো চান্‌নি, শুধু জামিন হতে অনুরোধ করেছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, সে ঐ একই কথা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ঐ আমাকে আত্মীয় পরিচয়ে লোকটাকে ছলনা করাই বা কিসের জন্য? সত্যিই তো আমি তার আত্মীয় নই।

অজিত বলিল, তিনি হয়ত আপনাকে সত্যিই আত্মীয় মনে করেন। বোধহয় কাউকেই ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

না না, কথাটা ঠিক ও-ভাবে আমি বলিনি অজিত। এই বলিয়া তিনি নিজের কাছেই যেন জবাবদিহি করিলেন। সেই লোকটাকে হঠাৎ ঝোঁকের উপর বিদায় করা পর্য্যন্ত মনের মধ্যে তাঁহার ভারি একটা গ্লানি চলিতেছিল; কহিলেন, সে আমাকে আত্মীয় বলেই যদি জানে, আর দু'-পাঁচশো টাকার যদি দরকারই পড়েছিল, সোজা নিজে এসে তো নিয়ে গেলেই হোত। খামোকা একটা বাইরের

লোককে সকলের সাম্‌নে পাঠানোর কি আবশ্যকতা ছিল? আর যাই বলো, মেয়েটার বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

বেহারা আসিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে জানাইয়া গেল। অজিত উঠিতে যাইতেছিল, আশুবাবু কহিলেন, লোকটাকে মার্ক করেছিলে অজিত, বিশ্রী চেহারা,—মনি-লেন্‌ডার কিনা। ফিরে গিয়ে হয়ত নানান্ খানা করে বানিয়ে বল্‌বে।

অজিত হাসিয়া কহিল, বানানোর দরকার হবেনা আশুবাবু,—সত্যি বল্‌লেই যথেষ্ট হবে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই তিনি বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, এই অক্ষয় লোকটা একেবারে নুইসেন্স। মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। না হয় একটা কাজ করোনা অজিত। যদুকে ডেকে ঐ দেরাজটা খুলে দেখোনা কি আছে। অন্ততঃ, পাঁচ-সাতশো টাকা,—আপাততঃ যা আছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের ড্রাইভার বোধহয় তাদের বাসাটা চেনে,—শিবনাথকে মাঝে-মাঝে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিলেন।

অজিত বাধা দিয়া বলিল, যা' হবার তা' হয়েই গেছে,—আজ রাত্রে থাক্, কাল সকালে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেই হবে।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন, তুমি বোঝোনা অজিত, বিশেষ প্রয়োজন না থাক্‌লে সে রাত্রেই কখনো লোক পাঠাতনা।

অজিত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বলিল, ড্রাইভার বাড়ী নেই, মনোরমাকে নিয়ে কখন্ ফিরবে তারও ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে কমল সমস্তই শুনতে পাবেন। তারপরে আর টাকা পাঠানো উচিত হবেনা আশুবাবু। বোধহয় আপনারি হাত থেকে আর তিনি সাহায্য নেবেননা।

কিন্তু, এ তো তোমার শুধু অনুমান মাত্র অজিত।

হাঁ, অনুমান বই আর কি।

কিন্তু, বিদেশে তার টাকার প্রয়োজন তো এর চেয়ে-ও বড় হতে পারে?

তা' পারে, কিন্তু তাঁর আত্ম-মর্য্যাদার চেয়েও বড় না হতে পারে।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ-ও তো শুধু তোমার অনুমান।

অজিত সহসা উত্তর দিলনা। ক্ষণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, না, এ আমার অনুমানের চেয়ে বড়। এ আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া সে ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশুবাবু আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেননা, কেবল বেদনায় দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস অসম্ভব-ও নয়, অসঙ্গতও নয়। ইহা তিনি নিজেও জানিতেন। নিরুপায় অনুশোচনায় বুকের ভিতরটা যেন তাঁহার আঁচড়াইতে লাগিল।

১৩

নারী-কল্যাণ সমিতি হইতে ফিরিয়া নীলিমা অবিনাশকে ধরিয়া পড়িল, মুখুয্যে মশাই, কমলকে আমি একবার দেখ্‌বো। আমার ভারি ইচ্ছে করে তাকে নেমতন্ন করে খাওয়াই।

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তোমার সাহস তো কম নয় ছোট গিন্নী; শুধু আলাপ নয়, একেবারে নেমতন্ন করা?

কেন, সে বাঘ না ভালুক? তাকে এত ভয়টা কিসের?

অবিনাশ বলিলেন, বাঘ-ভালুক এদেশে মেলেনা, নইলে তোমার হুকুমে তাদেরও নেমতন্ন করে আস্‌তে পারি। কিন্তু এঁকে নয়। অক্ষয় খবর পেলে আর রক্ষে থাক্‌বেনা। আমাকে দেশছাড়া কোরে ছাড়বে।

নীলিমা কহিল, অক্ষয়বাবুকে আমি ভয় করিনে।

অবিনাশ বলিলেন, তুমি না করলেও ক্ষতি নেই, আমি একা করলেই তাঁর কাজ চলে যাবে।

নীলিমা জিদ্‌ করিয়া বলিল, না সে হবেনা। তুমি না যাও আমি নিজে গিয়ে তাঁকে আহ্বান কোরে আস্‌বো।

কিন্তু আমি তো তাদের বাসাটা চিনিনে।

নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো চেনেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তিনি তোমাদের মত ভীতু লোক নন।

একটু ভাবিয়া বলিল, তোমাদের মুখে যা শুনি তাতে শিবনাথ বাবুরই দোষ,—তাঁকে তো আমি নেমতন্ন করতে চাইনে। আমি চাই কমলকে দেখ্‌তে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে! কমল যদি আস্‌তে রাজী হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী,—তিনিও বলেচেন আস্‌বেন। বুঝ্‌লে?

অবিনাশ বুঝিলেন সমস্তই কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সম্মতি দিতে পারিলেন-না, অথচ, বাধা দিতেও ভরসা পাইলেননা। নীলিমাকে তিনি শুধু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাই নয়, মনে মনে ভয় করিতেন।

পরদিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আর একটি কাজ কোরে দিতে হবে। তুমি আইবুড়ো মানুষ, ঘরে বৌ নেই যে সদাচারের নাম করে তোমার কান

মলে দেবে। বাসায় তো থাকো শুধু বাপ-মা-মরা একপাল ছাত্র নিয়ে,—তোমার ভয়টা কিসের ?

হরেন্দ্র কহিল, ভয়ের কথা হবে পরে,—কিন্তু করতে হবে কি ?

নীলিমা কহিল, কমলকে আমি দেখ্‌বো, আলাপ কোরব, ঘরে এনে খাওয়াবো। তুমি কি ওদের বাসা চেনো, আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে নেমতন্ন করে আস্‌তে হবে। কখন যেতে পার্‌বে বলো ত ?

হরেন্দ্র বলিল, যখনই হুকুম করবেন। কিন্তু বাড়ীওয়ালা ? সেজ্‌দা ? ওঁর অভিপ্রায়টা কি ? এই বলিয়া সে বারান্দার ও-ধারে অবিনাশকে দেখাইয়া দিল। তিনি ইজিচেয়ারে শুইয়া পাইয়োনিয়ার পড়িতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন সমস্তই, কিন্তু সাড়া দিলেন না।

নীলিমা বলিল, ওঁর অভিপ্রায় নিয়ে উনিই থাকুন, আমার কাজ নেই। আমি ওঁর শালী, শালীর বোন্‌ নই যে পতি-পরম-গুরুর গদা ঘুরিয়ে শাসন কর্‌বেন। আমার যাকে ইচ্ছে খাওয়াবো। ম্যাজিষ্ট্রেটের বউ বলেছেন খবর পেলে তিনিও আস্‌বেন। ওঁর ভালো না লাগে তখন আর কোথাও গিয়ে যেন সময়টা কাটিয়ে আসেন।

অবিনাশ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, কিন্তু কাজটা সমীচীন হবেনা হরেন। কাল্‌কের ব্যাপারটা মনে আছে তো ? আশুবাবুর মত সদাশিব ব্যক্তিকেও সাবধান হতে হয়।

হরেন্দ্র জবাব দিলনা। এবং, পাছে সেই লজ্জাকর টাকার কথাটা উঠিয়া পড়ে, এবং নীলিমার কানে যায়, এই ভয়ে সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বলিল, তার চেয়ে বরঞ্চ একটা কাজ করুনলা বৌদি, আমার বাসাতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনুন। আপনি হবেন গৃহ-কর্ত্রী।

লক্ষ্মীছাড়ার গৃহে একদিন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে। আমার ছেলেগুলোও দু'টো ভালোমন্দ জিনিস মুখে দিয়ে বাঁচ্‌বে।

নীলিমা অভিমানের সুরে বলিল, বেশ তাই হোক্ ঠাকুরপো, আমিও ভবিষ্যতে খোঁটার জ্বালা থেকে নিস্তার পাবো।

অবিনাশ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ, কেলেঙ্কারীর তা হলে আর অবশিষ্ট থাক্‌বেনা। কারণ, শিবনাথকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁকে তোমার বাসায় আহ্বান করে নিয়ে যাবার কোন কৈফিয়তই দেওয়া যাবেনা। তার চেয়ে বরঞ্চ মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, এই ঢের ভালো শোনাবে।

কথাটা সত্যই যুক্তিসঙ্গত। তাই ইহাই স্থির হইল যে কলেজের ছুটির পরে হরেন্দ্র গাড়ী করিয়া নীলিমাকে লইয়া গিয়া কমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।

বৈকালে হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল, যে কষ্ট করিয়া আর যাবার প্রয়োজন নাই, কাল রাত্রে খাবার কথা তাঁকে বলা হইয়াছে, তিনি রাজী হইয়াছেন।

নীলিমা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, ফের্‌বার পথে হঠাৎ রাস্তার ওপরে দেখা। সঙ্গে মুটের মাথায় একটা মস্ত বাক্স। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওটা? কোথায় যাচ্চেন? বললেন, যাচ্চি একটু কাজে। তখন আপনার পরিচয় দিয়ে বোল্‌লাম, বৌদি যে কাল সন্ধ্যার পরে আপনাকে নেমতন্ন করেছেন। নিতান্তই মেয়েদের ব্যাপার, যেতে হবে যে। একটুখানি চুপ করে থেকে বল্‌লেন, আচ্ছা। বোল্‌লাম, কথা আছে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি নিজে গিয়ে আপনাকে যথারীতি বলে আস্‌বেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে কি? একটুখানি হেসে বল্‌লেন, না। জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম, কিন্তু

একলা তো যেতে পারবেননা, কাল কখন এসে আপনাকে নিয়ে যাবো ? শুনে তেম্‌নি হাস্‌তে লাগলেন। বল্‌লেন, একলাই যেতে পারবো, অবিনাশবাবুর বাসা আমি চিনি।

নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল, মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভালো। ভারি নিরহঙ্কার।

পাশের ঘরে অবিনাশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন, অন্তরাল হইতেই প্রশ্ন করিলেন, আর সেই মুটের মাথার মোটা বাক্সটা ? তার ইতিহাস তো প্রকাশ করলেনা ভায়া ?

হরেন্দ্র বলিল, জিজ্ঞাসা করিনি।

করলে ভালো করতে। বোধহয় বিক্রী কিম্বা বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, হতেও পারে। আপনার কাছে বন্ধক দিতে এলে ইতিহাসটা জেনে নেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কহিল, বৌদি, আপনাদের নারী-কল্যাণ সমিতিতে অক্ষয়ের প্রবন্ধ শুনেছেন তো ? আমরা লোকটাকে ব্রুট বলি। কিন্তু, ও-বেচারার আর একটুখানি ভণ্ডামি বুদ্ধি থাক্‌লে সমাজে অনায়াসেই সাধু-সজ্জন বলে চলে যেতে পারতো কি বলেন সেজ্‌দা ? ঠিক না ?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, হাঁ হে নিত্যানন্দ-শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ! এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্ধুবরকে কৌশলটা শিখিয়ে দাওগে যাও

চেষ্টা কোরব। কিন্তু চোল্‌লাম বৌদি, কাল আবার যথা-সময়ে হাজির হব। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নীলিমা উদ্যোগ আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। মনোরমা গোড়া হইতেই কমলের অত্যন্ত বিরুদ্ধে, সে কোনমতেই আসিবেনা জানিয়া

আশুবাবুদের কাহাকেও বলা হয় নাই। মালিনীকে খবর পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি আসিলেননা।

ঠিক সময়ে আসিল কমল। যান-বাহনে নয়, একাকী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। অবিনাশ সুমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহাঁর চেহারা ও জামা-কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দৈন্যের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে একাকী হেঁটে এলে যে কমল ?

কমল বলিল, কারণ খুবই সাধারণ অবিনাশবাবু, বোঝা একটুও শক্ত নয়।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইলেন, এবং তাহাই গোপন করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, কি যে তুমি বল। কাজটা ভালো হয়নি কিন্তু— ছোটগিন্নী, ইনিই কমল। আর একটা নাম শিবাণী। এঁকে দেখ্‌বার জন্যেই এতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে ? এসো, বাড়ীর ভেতরে গিয়ে বস্‌বে চ'লো। যোগাড় বোধহয় তোমার সমস্ত হয়ে গেছে ; তা'হলে অনর্থক দেরি করে লাভ হবেনা,—ঠিক সময়ে আবার ওঁর বাসায় ফিরে যাওয়া চাই তো !

এ সকল উপদেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাহুল্য। উত্তরের আবশ্যকও হয়না, প্রত্যাশাও থাকেনা।

হরেন্দ্র আসিয়া কমলকে নমস্কার করিল। কহিল, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নেবার সময়ে জুট্‌তে পারিনি, বৌদি, ত্রুটি হয়ে গেছে। অক্ষয় এসেছিলেন তাঁকে যথোচিত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিতে বিলম্ব হ'ল। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল

নীরবে থাকিয়া কহিল, আমার খাওয়াই হয়েছে, কিন্তু এ সব আমি খাইনে! সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলে সে কহিল, আপনারা যাকে হবিষ্যান্ন বলেন আমি তাই শুধু খাই।

শুনিয়া নীলিমা অবাক্ হইল, কহিল, সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি খেতে যাবেন কিসের দুঃখে?

কমল কহিল, সে ঠিক। দুঃখ নেই তা' নয়, কিন্তু এ সব খাইনে বলেই অভাবটাও আমার কম। আপনি কিছু মনে করবেননা।

কিন্তু মনে না করিলে চলেনা। নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, না খেলে এতো জিনিস যে আমার নষ্ট হবে?

কমল হাসিল, কহিল, যা' হবার তা হয়েছে,—সে আর ফিরবেনা। তার ওপর খেয়ে আবার নিজে নষ্ট হই কেন?

নীলিমা কাতর হইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, শুধু আজকের মত, কেবল একটা দিনের জন্যেও কি নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেননা?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার হাসিমুখের একটি মাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয়না। কিন্তু ইহার দৃঢ়তা যে কত বড় তাহা পৌঁছিল হরেন্দ্রের কানে। শুধু সেই বুঝিল ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাই গৃহকর্ত্রীর দিক হইতে অনুরোধের পুনরুক্তির সূত্রপাতেই সে বাধা দিয়া কহিল, থাক্ বৌদি, আর না। খাবার আপনার নষ্ট হবেনা, আমার বাসার ছেলেদের এনে চেঁচে-পুঁচে খেয়ে যাবো, কিন্তু ওঁকে আর নয়। বরঞ্চ, যা খাবেন তার যোগাড় কোরে দিন।

নীলিমা রাগ করিয়া বলিল, তা' দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবেনা ঠাকুরপো, তুমি থামো। এ ঘাস নয় যে তোমার

একপাল ভেড়া নিয়ে এসে চরিয়ে দেবে। আমি বরঞ্চ রাস্তায় ফেলে দেবো তবু তাদের খাওয়াবোনা।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কেন, তাদের ওপর আপনার রাগ কিসের?

নীলিমা বলিল, তাদের জন্যেই তো তোমার যত দুর্গতি। বাপ টাকা রেখে গেছেন, নিজেও উপার্জ্জন কম করোনা, এতদিনে বৌ এলে তো ছেলে-পুলেয় ঘর ভরে যেতো। এ হতভাগা কাণ্ড তো ঘটতোনা। নিজেও যেমন আইবুড়ো কার্ত্তিক, দলটিও তৈরি হচ্চে তারি উপযুক্ত। তাদের আমি কিছুতে খাওয়াবোনা এই তোমাকে আমি বলে দিলাম। যাক আমার নষ্ট হয়ে।

কমল বুঝিতে কিছুই পারিলনা, আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, বৌদির অনেকদিন থেকে আমার ওপরে নালিশ আছে, এ তারই শাস্তি। এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জিনিসটা বিবৃত করিয়া কহিল, বাপ-মা-মরা নিরাশ্রয় গুটি কয়েক ছাত্র আছে আমার, তারা আমার কাছে থেকে ইস্কুল কলেজে পড়ে। তাদের ওপরেই ওঁর যত আক্রোশ।

কমল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই না কি? কৈ, এ তো, এতদিন শুনিনি?

হরেন্দ্র বলিল, শোনবার মতো কিছুই নয়। কিন্তু চরিত্রবান ভালো ছেলে তারা। তাদের আমি ভালোবাসি।

নীলিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বড় হয়ে তারা দেশোদ্ধার করবে এই তাদের পণ। অর্থাৎ, গুরুর মত ব্রহ্মচারী হয়ে দিগ্বিজয়ী বীর হবে বোধ করি।

হরেন্দ্র বলিল, যাবেন একবার তাদের দেখ্‌তে? দেখ্‌লে খুসি হবেন।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই যেতে পারি যদি নিয়ে যান।

হরেন্দ্র বলিল, না, কাল নয়, আর একদিন। আমাদের আশ্রমের রাজেন এবং সতীশ গেছে কাশী বেড়াতে; তারা ফিরে এলে আপনাকে নিয়ে যাবো। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি তাদের দেখলে আপনি খুসি হবেন।

অবিনাশ সেই মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কতকগুলো লক্ষ্মী-ছাড়ার আড্ডা বুঝি এরই মধ্যে আশ্রম হয়ে উঠ্‌লো? কত ভণ্ডামিই তুই জানিস্ হরেন।

নীলিমা রাগ করিল। কহিল, এ তোমার অন্যায় মুখুয্যে মশায়। ঠাকুরপো তো তোমার কাছে আশ্রমের চাঁদা চাইতে আসেননি যে ভণ্ড বলে গাল দিচ্চো? নিজের খরচে পরের ছেলে মানুষ করাকে ভণ্ডামি বোলোনা। বরঞ্চ যারা বলে তাদেরই তাই বলে ডাকা উচিত।

হরেন হাসিয়া বলিল বৌদি, এইমাত্র যে আপনি নিজেই তাদের ভেড়ার পাল বলে তিরস্কার করছিলেন,—এখন আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে সেজদার ভাগ্যে এই পুরস্কার?

নীলিমা কহিল, আমি বল্‌ছিলাম রাগে। কিন্তু উনি বলেন কোন্ লজ্জায়? ভণ্ডামির ধারণা আগে নিজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তার পরে যেন পরকে বল্‌তে যান্।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেরা তো সবাই ইস্কুল কলেজে পড়েন?

হরেন বলিল, হাঁ, প্রকাশ্যে তাই বটে।

অবিনাশ কহিলেন, আর অপ্রকাশ্যে কি সব প্রাণায়াম, রেচক-কুম্ভকের চর্চ্চা করা হয় সেটাও অমনি খুলে বলো?

শুনিয়া সবাই হাসিল। নীলিমা অনুনয়ের সুরে কমলকে কহিল, মুখুয্যে মশায়ের আজকের মেজাজ দেখে যেন ওঁর বিচার করে নেবেননা। মাঝে মাঝে মাথা ওঁর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। নইলে বহু পূর্ব্বেই আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হোতো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কোথায় একটুখানি যেন উত্তাপের বাষ্প জমিয়া উঠিতেছিল, এই স্নিগ্ধ পরিহাসটুকুর পরে যেন তাহা মিলাইয়া গেল। বামুন-ঠাকুর আসিয়া জানাইল কমলের খাবার তৈরী হইয়া গেছে। অতএব, এখনকার মত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া সকলকে উঠিতে হইল।

ঘণ্টা দুই পরে আহারাদি সমাধা হইলে পুনরায় সকলে আসিয়া যখন বাহিরের ঘরে বসিলেন, কমল তখন পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলেরা রেচক-কুম্ভক না করুক কলেজের পড়া মুখস্ত করা ছাড়াও ত কিছু করে,—সে কি ?

হরেন্দ্র বলিল, করে। ভবিষ্যতে যাতে সত্যিই মানুষ হতে পারে সে চেষ্টাতেও তাদের অবহেলা নেই। কিন্তু পায়ের ধূলো যেদিন পড়বে সেদিন সমস্ত বুঝিয়ে বোলব। আজ নয়।

এই মেয়েটির প্রতি সম্মানের আতিশয্যে অবিনাশের গা জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

নীলিমা কহিল, আজ বল্‌তেই বা বাধা কি ঠাকুরপো ? তোমার শেখানোর পদ্ধতি না হয় না-ই ভাঙলে, কিন্তু পুরাকালের ভারতীয় আদর্শে নিজের মতো করে যে তাদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিচ্ছো এ কথা জানাতে দোষ কি ? তোমার কাছে তো আমি আভাসে একদিন এই কথাই শুনেছিলাম।

হরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল, মিথ্যে শুনেচেন তাও তো বল্‌চিনে বৌদি।

বলিয়াই তাহার সেদিনের তর্কের ব্যাপারটা স্মরণ হইল, কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনারও বোধ করি আমার কাজে সহানুভূতি নেই ?

কমল কহিল, কাজটা আপনার ঠিক কি না জান্‌লে তো বলা যায়না হরেন্দ্রবাবু। কিন্তু পুবাকালের ছাঁচে তৈরি ক'রে তোলাটাই যে সত্যিকার মানুষের ছাঁচে গড়ে তোলা এও তো যুক্তি নয়।

হরেন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই যে আমাদের ভারতের আদর্শ ?

কমল জবাব দিল, ভারতের আদর্শ-ই যে চিরযুগের চরম আদর্শ,—এই বা কে স্থির করে দিলে বলুন ?

অবিনাশ এতক্ষণ কথা কহেন নাই, রাগ চাপিয়া বলিলেন, চরম আদর্শ না হতে পারে, কমল, কিন্তু এ আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহগণের আদর্শ। ভারতবাসীর এই নিত্যকালের লক্ষ্য,—এই তাদের একটি মাত্র চল্‌বার পথ ! হরেনের আশ্রমের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু সে এই লক্ষ্যই যদি গ্রহণ করে থাকে আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করি।

কমল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, জানিনে কেন মানুষের এ ভুল হয়। নিজেদের ছাড়া তারা যেন আর কোন ভারত-বাসীকে চোখে দেখ্‌তেই পায়না। আরও তো ঢের জাত আছে—তারা এ আদর্শ নেবে কেন ?

অবিনাশ কুপিত হইয়া কহিলেন, চুলোয় যাক্ তারা। আমার কাছে এ আবেদন নিষ্ফল। আমি শুধু নিজেদের আদর্শ-ই স্পষ্ট কোরে দেখতে পেলে যথেষ্ট মনে কোরব।

কমল ধীরে ধীরে বলিল, এ আপনার অত্যন্ত রাগের কথা অবিনাশ বাবু। নইলে এতবড় অন্ধ ভাব্‌তে আপনাকে আমার প্রবৃত্তি হয়না। একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু কি জানি, পুরুষেরা সবাই বুঝি শুধু এম্‌নি কোরেই ভাবে। সেদিন অজিতবাবুর সুমুখেও হঠাৎ এই প্রসঙ্গই

উঠে পড়েছিলো। ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবার উল্লেখে তাঁর সমস্ত মুখ ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একদিন তিনি ছিলেন উৎকট স্বদেশী,—আজও মনে মনে হয়তো তাই আছেন,—এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে কেবল প্রলয়ের নামান্তর। এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস মোচন করিল। অবিনাশ কি একটা বোধ হয় জবাব দিতেছিলেন, কিন্তু কমল সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি ভাবি এতে ভয় কিসের? বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেছি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে। এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায় কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবেনা এই তো ভয়? না-ই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানব-জাতির একজন বলে পরিচয় দিতে তো কেউ বাধা দেবেনা। তার গৌরবই কি কম?

অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কমল, তুমি যা' বোল্‌চ, নিজে তার অর্থ বোঝোনা। এতে মানুষের সর্ব্বনাশ হবে।

কমল উত্তর দিল, মানুষের হবেনা অবিনাশবাবু,—যারা অন্ধ তাদের অহঙ্কারের সর্ব্বনাশ হবে।

অবিনাশ কহিলেন, এ সব নিছক শিবনাথের কথা।

কমল কহিল, তা তো জানিনে তিনিও এ কথা বলেন।

এবার অবিনাশ আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। বিদ্রূপে মুখ কালো করিয়া বলিলেন, খুব জানো। কথাগুলো মুখস্ত করেচো, আর জানোনা কার?

তাঁহার এই কদর্য্য রূঢ়তার জবাব কমল দিলনা, দিল নীলিমা।

কহিল, কথা যারই হোক্ মুখুয্যে মশায়, মাষ্টারগিরি কাজে কড়া কথার ধমক্ দিয়ে ছাত্রের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয়না। প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে ত লজ্জা নেই, কিন্তু ভদ্রতা লঙ্ঘন করার লজ্জা আছে। কিন্তু ঠাকুরপো, একটা গাড়ী ডাকৃতে পাঠাওনা ভাই। তোমাকে কিন্তু গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, তোমাকে সঙ্গে দিতে তো আর ভয় নেই। এই বলিয়া সে কটাক্ষে অবিনাশের প্রতি চাহিয়া বলিল মুখুয্যে মশায়ের মুখের চেহারা যে-রকম মিষ্টি হয়ে উঠচে, তাতে বিলম্ব করা আর সঙ্গত হবেনা।

অবিনাশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ তো, তোমরা বসে গল্প করোনা, আমি শুতে চোল্‌লাম। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চাকর গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল, হরেন্দ্র কমলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমার আশ্রমে কিন্তু একদিন যেতে হবে। সেদিন আন্‌তে গেলে কিন্তু না বল্‌তে পারবেননা।

কমল সহাস্যে কহিল, ব্রহ্মচারীদের আশ্রমে আমাকে কেন হরেন বাবু? না-ই বা গেলাম?

না, সে হবেনা। ব্রহ্মচারী বলে আমরা ভয়ানক কিছু নই। নিতান্তই শাদা-সিধে। গেরুয়াও পরিনে, জটা বল্কলও ধারণ করিনে। সাধারণের মাঝখানে আমরা তাদের সঙ্গেই মিশে আছি।

কিন্তু সেও তো ভাল নয়। অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা আর একরকমের জোচ্চুরি। বোধ হয় অবিনাশ-বাবু একেই বল্‌ছিলেন ভণ্ডামি। তার চেয়ে বরঞ্চ জটা-বল্কল-গেরুয়া ঢের ভালো। তাতে মানুষকে চেনবার সুবিধে হয়, ঠকবার সম্ভাবনা কম থাকে।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার যো নেই—হট্‌তেই

হবে। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কি ভালো বলেননা? পারি, আর না পারি, এর আদর্শ কত বড়?

কমল কহিল, তা বল্‌তে পারবোনা হরেন বাবু। সমস্ত সংযমের মত যৌন-সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা কোরে তাকে জীবনের মুখ সত্য করে তুল্‌লে সে হয় আর এক ধরণের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হ'য়ে আসে। বেশ, আমি যাবো আপনার আশ্রমে।

হরেন্দ্র বলিল, যেতেই হবে,—না গেলে আমি ছাড়বোনা। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আড়ম্বর নেই, ঘটা কোরে আমরা কিছুই করিনে। সহসা নীলিমাকে দেখাইয়া কহিল, আমার আদর্শ উনি। ওঁর মতোই আমরা সহজের পথিক। বৈধব্যের কোন বাহ্যপ্রকাশ ওঁতে নেই,—বাইরে থেকে মনে হবে যেন বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে আছেন, কিন্তু জানি ওঁর দুঃসাধ্য আচার-নিষ্ঠা, ওঁর কঠোর আত্মশাসন!

কমল মৌন হইয়া রহিল। হরেন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি ভারতের অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন, ভারতের আদর্শ আপনাকে মুগ্ধ করেনা, কিন্তু বলুন ত, নারীত্বের এতবড় মহিমা, এতবড় আদর্শ আর কোন্ দেশে আছে? এই গৃহের উনি গৃহিণী, সেজ্‌দার মা-মরা সন্তানের উনি জননীর ন্যায়। এ বাড়ীর সমস্ত দায়িত্ব ওঁর উপরে। অথচ, কোন স্বার্থ, কোন বন্ধন নেই। বলুন ত, কোন্ দেশের বিধবারা এমন পরের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে?

কমলের মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর মধ্যে ভালোটা কি আছে হরেন বাবু? অপরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও অপরের ছেলের নিঃস্বার্থ জননী হবার দৃষ্টান্ত হয়ত জগতের আর

কোথাও নেই। নেই বলে অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভালো হয়ে উঠবে কিসের জোরে ?

শুনিয়া হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং নীলিমা আশ্চর্য্য দুই চক্ষু মেলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কমল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্য্যে লোকে একে যত গৌরবান্বিতই কোরে তুলুক, গৃহিণী-পনার এই মিথ্যে অভিনয়ের সম্মান নেই। এ গৌরব ছাড়াই ভালো।

হরেন্দ্র গভীর বেদনার সহিত কহিল, একটা সুশৃঙ্খল সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবার উপদেশ—এ তো আপনার কাছে কেউ আশা করে না।

কমল বলিল, কিন্তু সংসার তো ওঁর নিজের নয়—হলে এ উপদেশ দিতামনা। অথচ, এমনি কোরেই কর্ম্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি, এই বুঝি নারী-জীবনের সার্থকতা। আমাদের চা-বাগানের হরিশবাবুর কথা মনে পড়ে। ষোলো বছরের ছোট বোনটির যখন স্বামী মারা গেল তাকে বাড়ীতে এনে নিজের এক-পাল ছেলে-মেয়ে দেখিয়ে কেঁদে বল্‌লেন লক্ষ্মী দিদি আমার, এখন এরাই তোর ছেলেমেয়ে। তোর ভাবনা কি বোন্, এদের মানুষ কোরে, এদের মায়ের মত হয়ে, এ-বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে আজ থেকে তুই সার্থক হ',—এই আমার আশীর্ব্বাদ। হরিশবাবু ভালো লোক, বাগানময় তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে গেলো,—সবাই বল্‌লে লক্ষ্মীর কপাল ভালো। ভালো ত বটেই।—শুধু মেয়েমানুষেই জানে এতবড় দুর্ভোগ, এতবড় ফাঁকি আর নেই,—কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতীকারের সময় বয়ে যায়।

হরেন্দ্র কহিল, তার পরে ?

কমল বলিল, পরের খবর জানিনে, হরেন বাবু, লক্ষ্মীর সার্থকতার শেষ দেখে আসতে পারিনি, আগেই চক্ষে আসতে হয়েছিল ;—কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ী এসে দাঁড়ালো। চলুন, পথে যেতে যেতে বোল্‌ব ! নমস্কার। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষের তারকা যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল।

১৪

'আশ্রম' শব্দটা কমলের সম্মুখে হরেন্দ্রর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অবিনাশ যে-ঠাট্টা করিয়াছিলেন সে অন্যায় হয় নাই। জনকয়েক দরিদ্র ছাত্র ওখানে থাকিয়া বিনা খরচায় স্কুলে পড়া-শুনা করিতে পায় ইহাই লোকে জানে। বস্তুতঃ, নিজের এই বাসস্থানটাকে বাহিরের লোকের কাছে অতবড় একটা গৌরবের পদবীতে তুলিয়া ধরার সঙ্কল্প হরেন্দ্রর ছিলনা। ও নিতান্তই একটা সাধারণ ব্যাপার এবং প্রথমে আরম্ভও হইয়াছিল সামান্য ভাবে। কিন্তু এ সকল জিনিসের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্ব্বলতায় একবার জন্মগ্রহণ করিলে আর ইহাদের গতির বিরাম থাকেনা। কঠিন আগাছার ন্যায় মৃত্তিকার সমস্ত রস নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া ডালে-মূলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে ইহাদের বিলম্ব হয়না। হইলও তাই। এই বিবরণটাই প্রকাশ করিয়া বলি।

হরেন্দ্রর ভাই-বোন ছিলনা। পিতা ওকালতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংসারে অবশিষ্ট ছিলেন শুধু হরেনের বিধবা মা। তিনিও পরলোক গমন করিলেন ছেলের যখন লেখা-পড়া সাঙ্গ হইল। অতএব, আপনার বলিতে এমন কেহই আর রহিলনা যে তাহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিম্বা উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পরায়। অতএব, পড়া যখন সমাপ্ত হইল, তখন নিতান্ত কাজের অভাবেই হরেন্দ্র দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। সাধু-সঙ্গ বিস্তর করিল, ব্যাঙ্কের জমানো-সুদ বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-সমিতি গঠন করিল, বন্যাপ্লাবনে আচার্য্য-দেবের দলে ভিড়িল, মুক্তি-সঙ্ঘে মিলিয়া কানা খোঁড়া নুলো হাবা বোবা ধরিয়া আনিয়া সেবা করিল,—নাম জাহির হইতেই দলে দলে ভালো লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল টাকা দাও পরোপকার করি। বাড়্‌তি টাকা শেষ হইয়াছে, পুঁজিতে হাত না দিলে আর চলেনা,—এম্‌নি যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সম্বন্ধ যত দূরের হোক, পৃথিবীতে একটা লোকও যে তখনো বাকি আছে যাহাকে আত্মীয় বলা চলে, এ খবর সেই দিন সে প্রথম পাইল। অবিনাশদের কলেজে তখন মাষ্টারি একটা খালি ছিল, চেষ্টা করিয়া সেই কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া সঙ্গে করিয়া আগ্রায় আনিলেন। এ দেশে আসিবার ইহাই তাহার ইতিহাস। পশ্চিমের মুসলমানী আমলের প্রাচীন সহরগুলায় সাবেক কালের অনেক বড় বড় বাড়ী এখনও অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়, ইহারই একটা হরেন্দ্র জোগাড় করিয়া লইল। এই তাহার আশ্রম।

কিন্তু, এখানে আসিয়া যে-কয়দিন সে অবিনাশের গৃহে অতিবাহিত করিল তাহারই অবকাশে নীলিমার সহিত তাহার পরিচয়। এই মেয়েটি

অচেনা লোক বলিয়া একটা দিনের জন্যও আড়ালে থাকিয়া দাসী-চাকরের হাত দিয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিলনা, একেবারে প্রথম দিনটিতেই সম্মুখে বাহির হইল। কহিল, তোমার কখন কি চাই, ঠাকুরপো, আমাকে জানাতে লজ্জা কোরোনা। আমি বাড়ীর গিন্নী নই, অথচ, গিন্নী-পনার ভার পড়েছে আমার ওপর। তোমার দাদা বল্‌ছিলেন, ভায়ার অযত্ন হলে মাইনে কাটা যাবে। গরীব মানুষের লোকসান কোরে দিয়োনা ভাই। দরকারগুলো যেন জান্‌তে পারি।

হরেন কি যে জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইলনা। লজ্জায় সে এম্‌নি জড়-সড় হইয়া উঠিল যে, এই মিষ্ট কথাগুলি যিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া গেলেন তাঁহার মুখের দিকেও চাহিতে পারিলনা। কিন্তু লজ্জা কাটিতেও তাহার দিন দু'য়ের বেশি লাগিলনা। ঠিক যেন না কাটিয়া উপায় নাই,—এম্‌নি। এই রমণীর যেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর প্রীতি, তেম্‌নি সহজ সেবা। তিনি যে বিধবা, সংসারে তাঁহার যে সত্যকার আশ্রয় কোথাও নাই, তিনিও যে এ বাড়ীতে পর, এই কথাটাও একদিকে যেমন তাঁহার মুখের চেহারায়, তাঁহার সাজ-সজ্জায়, তাঁহার রহস্য-মধুর আলাপ-আলোচনায় ধরিবার যো নাই, তেম্‌নি, এইগুলাই যে তাঁহার সবটুকু নহে এ কথাটাও না বুঝিয়া উপায়ান্তর নাই।

বয়স নিতান্ত কম নহে, বোধ করি বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই বয়সের সমুচিত গাম্ভীর্য্য হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দায়,—এম্‌নি হাল্কা তাঁহার হাসি-খুসির মেলা, অথচ, একটুখানি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাঁহাকে অহর্নিশি ঘিরিয়া আছে যাহার ভিতরে প্রবেশের পথ নাই। বাটীর দাসী-চাকরেরও না, বাটীর মনিবেরও না।

এই গৃহে, এই আব-হাওয়ার মাঝখানেই হরেন্দ্রর সপ্তাহ দুই কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, এতো তাড়াতাড়ি করতে গেলে কেন ঠাকুরপো, এখানে কি এমন তোমার আট্‌কাচ্ছিলো?

হরেন্দ্র সলজ্জে কহিল, একদিন তো যেতেই হোতো বৌদি।

নীলিমা জবাব দিল, তা হয়ত হোতো। কিন্তু দেশ-সেবার নেশার ঘোর তোমার এখনো চোখ থেকে কাটেনি ঠাকুরপো, আরও দিন কতক না হয় বৌদির হেফাজতেই থাকৃতে।

হরেন্দ্র বলিল, তাই থাক্‌বো বৌদি। এই তো মিনিট দশেকের পথ,—আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবো কোথায়?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সেইখান হইতেই কহিলেন, যাবে জাহান্নমে। অনেক বারণ করেছিলাম, হরেন, যাস্‌নে আর কোথাও, এখানেই থাক্! কিন্তু সে কি হয়? ইজ্জত বড়ো, না দাদার কথা বড়ো! যাও নতুন আড্ডায় গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চড়াও গে। ছোট গিন্নী, ওকে বলা বৃথা। ও হোলো চড়কের সন্ন্যাসী, পিট ফুঁড়ে ঘুরতে না পেলে ওদের বাঁচাই মিথ্যে।

নূতন বাসায় আসিয়া হরেন্দ্র চাকর, বামুন রাখিয়া অতিশয় শান্ত-শিষ্ট নিরীহ মাষ্টারের ন্যায় কলেজের কাজে মন দিল। প্রকাণ্ড বাড়ীতে অনেক ঘর। গোটা দুই ঘর ছাড়া বাকি সমস্তই পড়িয়া রহিল। মাসখানেক পরেই এই শূন্য ঘরগুলা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ভাড়া দিতে হয়, অথচ, কাজে লাগেনা। অতএব পত্র গেল রাজেনের কাছে। সে ছিল তাহার দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতির সেক্রেটারি। দেশোদ্ধারের আগ্রহাতিশয্যে বছর দুই অন্তরীণ থাকিয়া মাস পাঁচ ছয় ছাড়া পাইয়া সাবেক বন্ধুবান্ধবগণের সন্ধানে ফিরিতেছিল।

হরেনের চিঠি এবং ট্রেণের মাশুল পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিল। হরেন কহিল, দেখি যদি তোমার একটা চাকুরি-বাকুরি করে দিতে পারি। রাজেন বলিল, আচ্ছা। তাহার পরম বন্ধু ছিল সতীশ। সে কোনমতে অন্তরীণের দায় এড়াইয়া মেদিনীপুর জেলার কোন্ একটা গ্রামে বসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিল; রাজেনের পত্র পাওয়ার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহার সাধুসঙ্কল্প মুলতুবি রাখিয়া আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং, একাকী আসিলনা, অনুগ্রহ করিয়া গ্রাম হইতে একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সতীশ এ কথা যুক্তি ও শাস্ত্র-বচনের জোরে নির্বিশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে ভারতবর্ষই ধর্ম্ম ভূমি। মুনি-ঋষিরাই ইহার দেবতা। আমরা ব্রহ্মচারী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের সব গিয়াছে। এ-দেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয়না, কারণ আমরাই ছিলাম একদিন জগতের শিক্ষক, আমরাই ছিলাম মানুষের গুরু। সুতরাং, বর্ত্তমানে ভারতবাসীর একমাত্র করণীয় গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে অসংখ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করা। দেশোদ্ধার যদি কখনো সম্ভব হয় তো এই পথেই হইবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। সতীসের নাম সে শুনিয়াছিল, কিন্তু পরিচয় ছিলনা, সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্য সে মনে-মনে রাজেনকে ধন্যবাদ দিল। এবং ইতিপূর্ব্বে যে তাহার বিবাহ হইয়া যায় নাই, এজন্য সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিল। সতীশ সর্ব্ববাদিসম্মত ভালো-ভালো কথা জানিত; কয়েকদিন ধরিয়া সেই আলোচনাই চলিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমির মুনি-ঋষিদের আমরাই বংশধর, আমাদেরই পূর্ব্ব-পিতামহগণ একদিন জগতের গুরু ছিলেন, অতএব আর একদিন গুরুগিরি করিবার আমরাই উত্তরাধিকারী।

আর্য্যরক্ত-সম্ভূত কোন্ পাষণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? পারেনা, এবং পারিবার মত দুর্ম্মতি-পরায়ণ লোকও কেহ সেখানে ছিলনা।

হরেন্দ্র মাতিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা তপস্যা এবং সাধনার বস্তু বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটাই সাধ্যমত গোপনে রাখা হইতে লাগিল, কেবল রাজেন ও সতীশ মাঝে মাঝে দেশে গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা বয়সে ছোট তাহারা স্কুলে প্রবেশ করিল, যাহারা সে শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা হরেন্দ্রর চেষ্টায় কোন একটা কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইল,—এইরূপে অল্পকালেই প্রায় সমস্ত বাড়ীটাই নানা বয়সের ছেলের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরের লোকে বিশেষ কিছু জানিতওনা, জানিবার চেষ্টাও করিতনা। শুধু এই টুকুই সকলে ভাসা-ভাসা রকমের শুনিতে পাইল যে হরেন্দ্রর বাসায় থাকিয়া কতকগুলি দরিদ্র বাঙালীর ছেলেরা লেখাপড়া করে। ইহার অধিক অবিনাশও জানিতনা, নীলিমাও না।

সতীশের কঠোর শাসনে বাসায় মাছ মাংস আসিবার যো নাই, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া সকলকে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি শাস্ত্র-বিহিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, পরে লেখাপড়া ও নিত্যকর্ম্ম। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদের ইহাতেও মন উঠিলনা, সাধন-মার্গ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া উঠিল। বামুন পলাইল, চাকরদের জবাব দেওয়া হইল,—অতএব, এ কাজগুলাও পালা করিয়া ছেলেদের ঘাড়ে পড়িল। কোনদিন একটা তরকারি হয়, কোনদিন বা তাহাও হইয়া উঠেনা; ছেলেদের পড়া-শুনা গেল, ইস্কুলে তাহারা বকুনি খাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিন বাঁধা নিয়মের শৈথিল্য ঘটিলনা—এমনি কড়াকড়ি। কেবল একটা অনিয়ম ছিল বাহিরে কোথাও আহারের নিমন্ত্রণ জুটিলে। নীলিমার কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই ব্যতিক্রম হরেন্দ্র জোর করিয়া

বহাল করিয়াছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোন মার্জ্জনা ছিলনা। ছেলেদের খালি-পা, রুক্ষ মাথা,—পাছে কোথাও কোন ছিদ্র-পথে বিলাসিতা অনধিকার-প্রবেশ করে সেদিকে সতীশের অতি সতর্ক চক্ষু অনুক্ষণ প্রহরা দিতে লাগিল। মোটামুটি এই ভাবেই আশ্রমের দিন কাটিতেছিল। সতীশের তো কথাই নাই, হরেন্দ্রর মনের মধ্যেও শ্লাঘার অবধি রহিলনা। বাহিরে কাহারো কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিতনা, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হরেন্দ্র আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রায়ই এই কথাটা বলিত যে, একটা ছেলেকেও যদি সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে তো এ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে মনে করিবে। সতীশ কথা কহিতনা, বিনয়ে মুখখানি শুধু আনত করিত।

শুধু একটা বিষয়ে হরেন্দ্র এবং সতীশ উভয়েই পীড়া বোধ করিতেছিল। কিছুদিন হইতে উভয়েই অনুভব করিতেছিল যে রাজেন্দ্রর আচরণ পূর্ব্বের মত আর নাই। আশ্রমের কোন কাজেই সে আর গা দেয়না, সকালের সাধন-ভজনের নিত্যকর্ম্মে এখন সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে শরীর ভাল নাই। অথচ, শরীর ভালো-না-থাকার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যায়না। কি তাহার নালিশ, কেন সে এমন হইতেছে প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাওয়া যায়না। কোনদিন হয়ত প্রভাতেই কোথায় চলিয়া যায়, সারাদিন আসেনা, রাত্রে যখন বাড়ী ফিরে তখন এম্‌নি তাহার চেহারা যে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হরেন্দ্ররও সাহস হয়না। অথচ, এ সকল একান্তই আশ্রমের নিয়ম-বিরুদ্ধ। একা হরেন্দ্র ব্যতীত সন্ধ্যার পরে কাহারো বাহিরে থাকিবার যো নাই এ কথা রাজেন ভাল করিয়াই জানে, অথচ গ্রাহ্য করেনা। আশ্রমের সেক্রেটারি সতীশ, শৃঙ্খলা রক্ষার ভার

তাহারই উপরে। এই সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে হরেন্দ্রর কাছে ঠিক যে অভিযোগ করিত তাহা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, ইহাকে আশ্রমে রাখা ঠিক সঙ্গত হইতেছেনা, ছেলেরা বিগড়াইতে পারে। হরেন নিজেও যে না বুঝিত তাহা নহে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস তাহার ছিলনা। একদিন সমস্ত রাত্রিই তাহার দেখা নাই, সকালে যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন এই লইয়াই একটা রীতিমত আলোচনা চলিতেছিল, হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি রাজেন, কাল ছিলে কোথায়?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল একটা গাছতলায় পড়ে ছিলাম।

গাছতলায়? গাছতলায় কেন?

অনেক রাত হয়ে গেল, আর ডাকাডাকি করে আপনাদের ঘুম ভাঙালাম না।

বেশ। অত রাত্রিই বা হোলো কেন?

এম্‌নি ঘুরতে ঘুরতে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ নিকটে ছিল, হরেন জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড বল ত?

সতীশ বলিল, আপনাকেই কথা কাটিয়ে চলে গেল, গ্রাহ্য করলেনা, আর আমি জান্‌বো কি করে?

তাই তো হে, এতটা তো ভালো নয়।

সতীশ মুখ ভারি করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি তো একটা কথা জানেন যে পুলিশে ওকে বছর দুই জেলে রেখেছিল?

হরেন বলিল, জানি, কিন্তু সে তো মিথ্যে সন্দেহের উপর। ওর তো কোন সত্যিকার দোষ ছিলনা।

সতীশ কহিল, আমি শুধু ওর বন্ধু বলেই জেলে যেতে-যেতে রয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশের সুদৃষ্টি ওকে আজও ছাড়েনি।

হরেন কহিল, অসম্ভব নয়।

প্রত্যুত্তরে সতীশ একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি ভাবি, ওর থেকে আমাদের আশ্রমের উপরে না তাদের মায়া জন্মায়।

শুনিয়া হরেন চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ নিজেও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বোধ হয় জানেন যে রাজেন ভগবান পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেনা?

হরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কই না।

সতীশ কহিল, আমি জানি সে করেনা। আশ্রমের কাজ-কর্ম্ম, বিধি-নিষেধের প্রতিও তার তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা নেই। আপনি বরঞ্চ কোথাও তার একটা চাকুরি-বাকুরি করে দিন।

হরেন কহিল, চাকুরি তো গাছের ফল নয়, সতীশ, যে ইচ্ছে করলেই পেড়ে হাতে দেবো। তার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়।

সতীশ বলিল, তা'হলে তাই করুন। আপনি যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট, এবং আমি এর সেক্রেটারি, তখন সকল বিষয় আপনার গোচর করাই আমার কর্ত্তব্য। আপনি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমারও সে বন্ধু। তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌তে এতদিন আমার প্রবৃত্তি হয়নি, কিন্তু এখন আপনাকে সতর্ক করে দেওয়াও আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

হরেন মনে-মনে ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি জানি তার নির্ম্মল চরিত্র—

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ। এদিক দিয়ে অতি-বড় শত্রুও তার দোষ দিতে পারেনা। রাজেন আজীবন কুমার, কিন্তু সে

ব্রহ্মচারীও নয়। আসল কারণ, স্ত্রীলোক বলে সংসারে যে কিছু আছে এ কথা ভাব্‌বারও তার সময় নেই। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তার চরিত্রের অভিযোগ আমি করিনি, সে অস্বাভাবিক রকমের নির্ম্মল, কিন্তু—

হরেন প্রশ্ন করিল, তবুও তোমার কিন্তুটা কি?

সতীশ বলিল, কলকাতার বাসায় আমরা দু'জনে এক ঘরে থাক্‌তাম। ও তখন ক্যাম্‌বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র, এবং বাসায় বি-এস্‌-সি পড়তো। সবাই জান্‌তো ওই ফার্ষ্ট হবে, কিন্তু একজামিনের আগে হঠাৎ কোথায় চলে গেল—

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি ডাক্তারি পোড়্‌ত না কি? কিন্তু আমাকে যে বলেছিল ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়া-শুনো ভয়ানক শক্ত বলে ওকে পালিয়ে আস্‌তে হয়েছিল—

সতীশ কহিল, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখ্‌তে পাবেন কলেজে থার্ড-ইয়ারে সে-ই হয়েছিল প্রথম। অথচ, বিনা কারণে চলে আসায় কলেজের সমস্ত মাষ্টাররাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। ওর পিসীমা বড়লোক, তিনিই পড়ার খরচ দিচ্ছিলেন, এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ করলেন, তার পরেই বোধ হয় আপনার সঙ্গে ওর পরিচয়। বছর দুই ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে এলো তখন পিসী তারই মত নিয়ে তাকে ডাক্তারি ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। ক্লাসে প্রত্যেক বিষয়েই ও ফার্ষ্ট হচ্ছিল,—অথচ, বছর তিনেক পরে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলে! ওই এক ছুতো। ভারি শক্ত, ও আমি পেরে উঠ্‌বোনা। ছেড়ে দিয়ে আমার বাসায় আমার ঘরে এসে আড্ডা নিলে। বল্‌লে, ছেলে পড়িয়ে বি-এস-সি পাশ করে কোথাও কোন গ্রামে গিয়ে মাষ্টারি কোরে

কাটাবো। আমি বোল্‌লাম, বেশ তাই করো। তার পরে দিন পোনর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, চোখের ঘুম কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই,—এম্‌নি পড়াই পড়লে যে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সবাই বল্‌লে এ না হলে কি আর কেউ প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারে!

হরেন এ সব কিছুই জানিতনা, রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পরে?

সতীশ কহিল, তার পরে যা আরম্ভ করলে সেও এম্‌নি অদ্ভুত। বই আর ছুঁলেনা। কোথায় রইল তার খাতা পেন্সিল, কোথায় রইল তার নোট্‌-বুক,—কোথায় যায়, কোথায় থাকে পাত্তাই পাওয়া যায়না। যখন ফিরে আসে তার চেহারা দেখ্‌লে ভয় হয়। যেন এতদিন ওর স্নানাহার পর্য্যন্ত ছিলনা!

তার পরে?

তার পরে একদিন পুলিশের দলবল এসে সকাল থেকে বাড়ীময় যেন দক্ষ-যজ্ঞ সুরু করলে। এটা ফেলে, সেটা ছড়ায়, ওটা খোলে, একে ধম্‌কায়, তাকে আটকায়,—সে বস্তু চোখে না দেখ্‌লে অনুধাবন করবার যো নেই। বাসার সবাই কেরানি, ভয়ে দু'জনের সর্দ্দি-গর্ম্মী হয়ে গেল,—সবাই ভাবলাম আর রক্ষে নেই, পুলিশের লোকে আজ আমাদের সবাইকে ধরে বোধ হয় ফাঁসি দেবে।

তার পরে?

তার পরে বিকেল নাগাদ রাজেনকে আর রাজেনের বন্ধু বলে আমাকে ধরে নিয়ে তারা বিদায় হোল। আমাকে দিলে দিন চারেক পরেই ছেড়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ আর পাওয়া গেলনা। ছাড়বার সময় সাহেব দয়া কোরে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ওয়ান ষ্টেপ্‌। ওন্‌লি ওয়ান ষ্টেপ্‌! তোমার বাসার ঘর আর এই জেলের ঘরের মধ্যে

ব্যবধান রইলো শুধু ওয়ান ষ্টেপ্! গো। গঙ্গাস্নান কোরে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন কোরে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই বল্‌লে, সতীশ তুমি ভাগ্যবান! আফিসে গেলাম, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে দু'মাসের মাইনে হাতে দিয়ে বল্‌লেন, গো। শুন্‌লাম ইতিমধ্যে আমার অনেক খোঁজ তল্লাসিই হয়ে গেছে।

হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে কহিল, তাহলে কি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে রাজেন—

সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, আমাকে জিজ্ঞেসা করবেন না। সে আমার বন্ধু।

হরেন খুসী হইলনা, কহিল, আমারও ত সে ভাইয়ের মতো।

সতীশ কহিল, একটা কথা ভেবে দেখবার যে তারা আমাকে বিনা দোষে লাঞ্ছনা করেছে সত্যি, কিন্তু ছেড়েও দিয়েছে।

হরেন বলিল, বিনা দোষে লাঞ্ছনা করাটাও তো আইন নয়। যারা তা' পারে, তারা এ-ই বা পারবেনা কেন? এই বলিয়া সে তখনকার মত কলেজে চলিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভারি অশান্তি লাগিয়া রহিল। শুধু কেবল রাজেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নয়, দেশের কাজে দেশের ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে এই যে সে আয়োজন করিয়াছে, পাছে, তাহা অকারণে নষ্ট হইয়া যায়। হরেন স্থির করিল, ব্যাপারটা সত্যই হোক, বা মিথ্যাই হোক, পুলিশের চক্ষু অকারণে আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনা কোন মতেই সমীচীন নয়। বিশেষতঃ, সে যখন স্পষ্টই এখানকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে, তখন কোথাও চাকুরি করিয়া দিয়া হোক, বা যে কোন অজুহাতে হোক তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহার দিনকয়েক পরেই মুসলমানদের কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে

দু'দিনের ছুটি ছিল। সতীশ কাশী যাইবার অনুমতি চাহিতে আসিল। আগ্রা-আশ্রমের অনুরূপ আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিরাট কল্পনা হরেন্দ্রর মনের মধ্যে ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যেই সতীশের কাশী যাওয়া। শুনিয়া রাজেন আসিয়া কহিল, হরেনদা, ওর সঙ্গে আমিও দিনকতক বেড়িয়ে আসিগে।

হরেন্দ্র বলিল, তার কাজ আছে বলে সে যাচ্ছে।

রাজেন বলিল, আমার কাজ নেই বলেই যেতে চাচ্চি। যাবার গাড়ী-ভাড়ার টাকাটা আমার কাছে আছে।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ফিরে আসবার?

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিল, রাজেন, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলি-বলি করেও বল্‌তে পারিনি।

রাজেন একটুখানি হাসিয়া কহিল, বল্‌বার প্রয়োজন নেই হরেনদা, সে আমি জানি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রির গাড়ীতে তাহাদের যাইবার কথা। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে হরেন্দ্র দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে একটা কাগজের মোড়ক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল, ফিরে না এলে বড় দুঃখ পাবো রাজেন। এবং বলিয়াই চক্ষের পলকে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার দিনদশেক পরে দু'জনেই ফিরিয়া আসিল। হরেন্দ্রকে নিভৃতে ডাকিয়া সতীশ প্রফুল্ল মুখে কহিল, আপনার সেদিনের ঐটুকু বলাতেই কাজ হয়েছে হরেনবাবু। কাশীতে আশ্রম স্থাপনের জন্যে এ ক'দিন রাজেন অমানুষিক পরিশ্রম করেছে।

হরেন্দ্র কহিল, পরিশ্রম করলে তো সে অমানুষিক পরিশ্রমই করে সতীশ।

হাঁ, তাই সে করেছে। কিন্তু এর সিকি ভাগ পরিশ্রমও যদি সে আমাদের এই নিজেদের আশ্রমটুকুর জন্যে কোরত।

হরেন্দ্র আশান্বিত হইয়া বলিল, করবে হে সতীশ, করবে। এতদিন বোধ করি ও ঠিক জিনিসটি ধরতে পারেনি। আমি নিশ্চয় বল্‌চি, তুমি দেখ্‌তে পাবে এখন থেকে ওর কর্ম্মের আর অবধি থাক্‌বে না।

সতীশ নিজেও সেই ভরসাই করিল।

হরেন্দ্র বলিল, তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় একটা কাজ স্থগিত আছে। আমি মনে মনে কি স্থির করেছি জানো? আমাদের আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখ্‌লে আর চল্‌বে না। দেশের এবং দশের সহানুভূতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন। এর বিশিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক।

সতীশ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজে বাধা পাবেনা?

হরেন্দ্র বলিল, না। এই রবিবারে আমি কয়েকজনকে আহ্বান করেচি। তাঁরা দেখ্‌তে আস্‌বেন। আশ্রমের শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও বিশুদ্ধতার পরিচয়ে সেদিন যেন তাঁদের আমরা মুগ্ধ করে দিতে পারি। তোমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কে-কে আস্‌বেন?

হরেন্দ্র বলিল, অজিতবাবু, অবিনাশ দা, বৌঠাকরুণ। শিবনাথবাবু সম্প্রতি এখানে নেই,—শুন্‌লাম জয়পুরে গেছেন কার্য্যোপলক্ষে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলের নাম বোধ করি শুনেছ,—তিনিও আস্‌বেন; এবং শরীর সুস্থ থাক্‌লে হয়ত আশুবাবুকেও ধরে আন্‌তে পারবো। জানো ত, কেউ এঁরা যে-সে লোক ন'ন। সেদিন এঁদের কাছ থেকে যেন আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। সে ভার তোমার।

সতীশ সবিনয়ে মাথা নত করিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন, তাই হবে।

রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাগতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—আসিলেন না শুধু আশুবাবু। হরেন্দ্র দ্বার হইতে তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত। কেহ আলো জ্বালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে। আপনি যাদের লক্ষ্মী-ছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর-বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়। বৌদি, আসুন আমাদের রান্না-শালায়। আজ আমাদের পর্ব্বদিন, সেখানকার আয়োজন একবার দেখে আসবেন চলুন।

নীলিমার পিছনে পিছনে সবাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। একটি বছর দশ-বারোর ছেলে উনান জ্বালিতেছিল, এবং সেই বয়সের আর একটি ছেলে বঁটিতে আলু কুটিতেছিল, উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নীলিমা ছেলেটিকে স্নেহের কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাদের কি রান্না হবে বাবা?

ছেলেটি প্রফুল্ল মুখে কহিল, আজ রবিবারে আমাদের আলুর দম হয়।

আর কি হয়?

আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর-দম? ডাল কিম্বা ঝোল কিম্বা আর কিছু—

ছেলেটি শুধু কহিল, ডাল আমাদের কাল হয়েছিল।

সতীশ পাশে দাঁড়াইয়াছিল, বুঝাইয়া বলিল, আমাদের আশ্রমে একটার বেশি হবার নিয়ম নেই।

হরেন হাসিয়া কহিল, হবার যো নেই বৌদি, হবে কোথা থেকে? ভায়া এই ভাবেই পরের কাছে আশ্রমের গৌরব রক্ষা করেন।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, দাসী চাকরও নেই বুঝি?

হরেন্দ্র কহিল, না। তাদের আন্‌লে আলুর-দমকে বিদায় দিতে হবে। ছেলেরা সেটা পছন্দ করবেনা।

নীলিমা আর প্রশ্ন করিলনা, ছেলে দু'টির মুখের পানে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। কহিল, ঠাকুরপো, আর কোথাও চল।

সকলেই একথার অর্থ বুঝিল। হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, চলুন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম বৌদি, এ আপনি সইতে পারবেননা। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, কিন্তু আপনি নিজেই এতে অভ্যস্ত, শুধু আপনিই বুঝ্‌বেন এর সার্থকতা! তাই সেদিন আমার এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আপনাকে সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেছিলাম।

হরেন্দ্রর গভীর ও গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার নিজের কথা আলাদা, কিন্তু এই সব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্য চর্চ্চার নাম কি মানুষ গড়া হরেনবাবু? এরাই বুঝি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান তো সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন,—মিথ্যে দুঃখের-বোঝা মাথায় চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো কোরে দেবেননা। তাহার বাক্যের কঠোরতায় হরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল, অবিনাশ বলিলেন, কমলকে ডেকে আনা তোমার ঠিক হয়নি হরেন।

কমল লজ্জা পাইল, কহিল আমাকে সত্যিই কারো ডাকা উচিত নয়।

নীলিমা কহিল, কিন্তু সে কারও মধ্যে আমি নয় কমল। আমার ঘরের মধ্যে কখনো তোমার অনাদর হবেনা। চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসিগে। দেখি, ঠাকুরপোর আশ্রমে আরও কি কি আতসবাজী বার হয়। এই বলিয়া সে স্নিগ্ধ হাস্যের আবরণ দিয়া কমলের লজ্জা ঢাকিয়া দিল।

দ্বিতলে আশ্রমের বসিবার ঘরখানি দিব্য প্রশস্ত! সাবেক কালের কারুকার্য্য ছাদের নীচে ও দেওয়ালের গায়ে এখনও বিদ্যমান। বসিবার জন্য একখানা বেঞ্চ ও গোটা চারেক চৌকি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ, কেহ তাহাতে বসেনা। মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। আজ বিশেষ উপলক্ষে শাদা চাদর বিছাইয়া প্রতিবেশী লালাজীর গৃহ হইতে কয়েকটা মোটা তাকিয়া চাহিয়া আনা হইয়াছে, মাঝখানে তাঁহারই বাড়ীর লতা-পাতা-কাটা বারো ডালের শেজ্, এবং তাঁহারই দেওয়া সবুজ রঙের ফানুসে ঢাকা দেওয়াল-গিরি এক কোণে জ্বলিতেছে;—নীচের অন্ধকার ও আনন্দহীন আবহাওয়ার মধ্যে হইতে এই ঘরটিতে উপস্থিত হইয়া সকলেই খুসী হইলেন।

অবিনাশ একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ! বাঁচা গেল।

হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, আমাদের আশ্রমের এ ঘরখানি কেমন সেজ্দা?

অবিনাশ বলিলেন, এই তো মুস্কিলে ফেল্লি হরেন। কমল উপস্থিত রয়েছেন, ওঁর সুমুখে কোন কিছুকে ভালো বল্‌তে সাহস হয়না, হয়ত সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদের জোরে এখুনি সপ্রমাণ কোরে দেবেন যে এর ছাদের নক্সা থেকে মেঝের গাল্‌চে পর্য্যন্ত সবই মন্দ। এই বলিয়া তিনি তাহার

মুখের প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর কোন সম্বল না থাক্ কমল, অন্ততঃ, বয়সের পুঁজিটা যে জমিয়ে তুলেচি এ তুমিও মান্‌বে। তারই জোরে তোমাকে একটা কথা আজ বলে্ রাখি, সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় তা' অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাই বলে অপ্রিয় বাক্য মাত্রই সত্য নয় কমল। তোমাকে অনেক কথাই শিবনাথ শিখিয়েছে, কেবল এইটি দেখ্‌চি সে শেখাতে বাকী রেখেচে।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার জবাব দিল নীলিমা। কহিল, শিবনাথের ত্রুটি হয়েছে, মুখুয্যে মশাই,—তাঁকে জরিমানা কোরে আমরা তার শোধ দেব। কিন্তু গুরুগিরিতে কোন পুরুষই ত কম নয়, তাই প্রার্থনা করি, তোমার বয়সের পুঁজি থেকে আরও দু'একটা প্রিয় বাক্য বার করো আমরা সবাই শুনে ধন্য হই।

অবিনাশ অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে শুধু কেবল উপহাসের জন্যই নয়, এই বক্রোক্তির অভ্যন্তরে যে তীক্ষ্ণ ফলাটুকু লুকানো ছিল তাহা বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইলনা, অপমান করিল। কিছুকাল হইতে কি এক প্রকার অসন্তোষের তপ্ত বাতাস কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝখানে পড়িতেছিল। ঝড়ের মত ভীষণ কিছুই নয়, কিন্তু খড়-কুটা ধূলা-বালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে চোখে মুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। অল্প-একটুখানি নড়া দাঁতের মত, চিবানোর কাজটা চলিতেছিল, কিন্তু চিবানোর আনন্দে বাজিতেছিল। হরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, রাগ করতে পারিনে হরেন, তোমার বৌদি নিতান্ত মিথ্যে বলেননি,—আমাকে চিন্‌তে তো তাঁর বাকি নেই,—ঠিকই জানেন আমার পুঁজি-পাটা সেই সেকেলে সোজা ধরণের, তাতে বস্তু থাকলেও রস-কস নেই।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ কথার মানে সেজ্‌দা?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মানেটা ঠিক বুঝ্‌বেনা। কিন্তু ছোট-গিন্নী হঠাৎ যে রকম কমলের ভক্ত হয়ে উঠেচেন, তাতে আশা হয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধন্য হবার পথ ওঁর আপনি পরিষ্কার হবে।

এই ইঙ্গিতের কদর্য্যতা তাঁহার নিজের কানেও লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বিনয়ের স্পর্দ্ধায় আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরেন্দ্র থামাইয়া দিল। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, সেজদা, আপনারা সকলেই আজ অতিথি। কমলকে আমি আশ্রমের পক্ষে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। এ কথা আপনারা ভুলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকবেনা।

নীলিমা বলিল, তাহলে আমার সম্বন্ধেও দয়া কোরে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দাও ঠাকুরপো, যে কাউকে ছোট-গিন্নী বলে ডাকতে থাক্‌লেই সে সত্যিকার গৃহিণী হয়ে যায়না। তাকে শাসন করার মাত্রা-বোধ থাকা চাই। আমার দিক থেকে মুখুয্যে মশায়ের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার-ঘরে এটুকু আজ বরঞ্চ জমা হয়ে থাক্‌—ভবিষ্যতে কাজে লাগ্‌তে পারে।

হরেন্দ্র হাত-জোড় করিয়া বলিল, রক্ষে করুন বৌদি, যত অভিজ্ঞতার লড়াই কি আজ আমার বাসায় এসে? যেটুকু বাকি রইল, এখন থাক্, বাড়ী ফিরে গিয়ে সমাধা ক'রে নেবেন, নইলে আমরা যে মারা যাই। যে-ভয়ে অক্ষয়কে ডাকলামনা, তাই কি শেষে ভাগ্যে ঘট্‌লো?

শুনিয়া অজিত ও কমল উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। হরেন জিজ্ঞাসা করিল, অজিতবাবু, শুন্‌লাম কাল না কি আপনি বাড়ী যাবেন?

কিন্তু আপনি শুন্‌লেন কার কাছে?

আশুবাবুকে আন্‌তে গিয়েছিলাম, তিনিই বল্‌লেন, কাল বোধহয় আপনি বাড়ী চলে যাচ্চেন।

অজিত কহিল, বোধহয়। কিন্তু সে কাল নয়, পরশু। এবং, বাড়ী কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত, বিকেল নাগাদ ষ্টেসনে গিয়ে উপস্থিত হব,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যে-কোন দিকের গাড়ী পাবো তাতেই এ যাত্রা স্নুরু করে দেবো।

হরেন্দ্র সহাস্যে কহিল, অনেকটা বিবাগী হওয়ার মত। অর্থাৎ গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ নেই।

অজিত বলিল, না।

কিন্তু ফিরে আস্‌বার?

না, তারও আপাততঃ কোন নির্দ্দেশ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, অজিতবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক। কিন্তু তল্পি বইবার লোকের দরকার হয় তো আমি একজনকে দিতে পারি, বিদেশে এমন বন্ধু আর পাবেননা।

কমল কহিল, আর রাঁধবার লোকের দরকার হয় তো আমিও একজনকে দিতে পারি রাঁধতে যার জোড়া নেই। আপনিও স্বীকার করবেন, হাঁ, অহঙ্কার করতে পারে বটে।—

অবিনাশের কিছুই আর ভালো লাগিতে ছিলনা, বলিলেন, হরেন, আর দেরি কিসের, এবার ফেরবার উদ্যোগ করা যাক্‌না। কি বল?

হরেন সবিনয়ে কহিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু পরিচয় করবেননা? দু'টো উপদেশ তাদের দিয়ে যাবেননা সেজ্‌দা?

অবিনাশ বলিলেন, উপদেশ দিতে তো আমি আসিনি, এসেছিলাম শুধু ওঁদের সঙ্গী হিসেবে। তার বোধহয় আর দরকার নেই।

সতীশ অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। দশ বারো

বছরেরর বালক হইতে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক পর্য্যন্ত তাহাতে আছে। শীতের দিন। গায়ে শুধু একটি জামা, কিন্তু কাহারও পায়ে জুতা নাই,—জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই। আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এ সকল শিক্ষার অঙ্গ। হরেন্দ্র আজ একটি সুন্দর বক্তৃতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে তাহাই আবৃত্তি করিয়া লইয়া যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, এই ছেলেরা স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ যাতে নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে প্রচার করতে পারে আজ এদের সেই আশীর্ব্বাদ আপনারা করুন।

সকলে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, যদি সময় থাকে আমাদের বক্তব্য আমি পরে নিবেদন কোরব। এই বলিয়া সে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আপনাকেই আজ আমরা বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছি কিছু শুন্‌বো বলে। ছেলেরা আশা করে আছে আপনার মুখ থেকে আজ তারা এমন কিছু পাবে যাতে জীবনের ব্রত তাদের অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমল সঙ্কোচ ও দ্বিধায় আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমি তো বক্তৃতা দিতে পারিনে হরেনবাবু।

উত্তর দিল সতীশ, কহিল, বক্তৃতা নয়, উপদেশ। দেশের কাজে যা তাদের সব চেয়ে বেশি কাজে লাগ্‌বে, শুধু তাই।

কমল তাহাকেই প্রশ্ন করিল, দেশের কাজ বল্‌তে আপনারা কি বোঝেন আগে বলুন।

সতীশ কহিল, যাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয় সেই তো দেশের কাজ।

কমল বলিল, কিন্তু কল্যাণের ধারণা তো সকলের এক নয়।

আপনার সঙ্গে আমার ধারণা যদি না মেলে আমার উপদেশ তো আপনাদের কাজে লাগ্‌বেনা।

সতীশ মুস্কিলে পড়িল। এ কথার ঠিক উত্তর সে খুঁজিয়া পাইলনা। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হরেন্দ্র কহিল, দেশের মুক্তি যাতে আসে সেই হ'ল দেশের একমাত্র কল্যাণ। দেশে এমন কে আছে যে এ সত্য স্বীকার করবেনা?

কমল বলিল, না বল্‌তে ভয় হয় হরেনবাবু, সবাই ক্ষেপে যাবে। নইলে আমিই বোলতাম এই মুক্তি শব্দটার মত ভোলবার এবং ভোলাবার এতবড় ছল আর নেই। কার থেকে মুক্তি হরেনবাবু? ত্রিবিধ দুঃখ থেকে, না ভব-বন্ধন থেকে? কোন্‌টাকে দেশের একমাত্র কল্যাণ স্থির করে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন বলুন ত? এই কি আপনার স্বদেশ সেবার আদর্শ?

হরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, এসব নয়, এসব নয়। এ আমাদের কাম্য নয়।

কমল কহিল, তাই বলুন এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন, সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার শিক্ষা কি ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, পরনে জীর্ণ বস্ত্র, মাথায় রুক্ষ কেশ, একবেলা অর্দ্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠ্‌চে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেন বাবু, পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েচে, এমন

অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হয়নি।

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিল, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি ধর্ম্মের সাধনা, ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন ?

কমল কহিল, মুক্তি-সংগ্রামের অর্থ-টা আগে পরিষ্কার হোক্।

সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কমল হাসিয়া বলিল, ভাবে বোধহয় আপনি বিদেশী রাজশক্তির বন্ধন মোচনকেই দেশের মুক্তি-সংগ্রাম বল্‌চেন। তা' যদি হয়, সতীশবাবু, আমি নিজে তো ধর্ম্মের সাধনাও করিনি, ত্যাগের দীক্ষাও নিইনি, তবুও আমাকে ঠিক সাম্‌নের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলাম। কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাবো ত ?

সতীশ কথা কহিলনা, কেমন একপ্রকার যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহারই চঞ্চল দৃষ্টির অনুসরণ করিতে গিয়া কমল কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু ফিরাইতে পারিলনা। এই লোকটিই রাজেন্দ্র। কখন্ নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সে আচ্ছন্নের ন্যায় নিষ্পলক চক্ষে এতক্ষণ তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল, এখনও ঠিক তেম্‌নি করিয়াই চাহিয়া রহিল। ইহার চেহারা একবার দেখিলে ভোলা কঠিন। বয়স বোধকরি পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে, রঙ অতিশয় ফর্সা, হঠাৎ দেখিলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড কপাল, সুমুখের দিকটায় এই বয়সেই টাকের মত হইয়া ঢের বড় দেখাইতেছে, চোখ গভীর এবং অতিশয় ক্ষুদ্র,—অন্ধকার গর্ত্ত হইতে ইঁদুরের চোখের মত জ্বলিতেছে, নীচেকার পুরু মোটা ঠোঁট সুমুখে ঝুঁকিয়া যেন অন্তরের সুকঠোর সঙ্কল্প কোনমতে চাপা দিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয় এই মানুষটাকে এড়াইয়া চলাই ভালো।

হরেন্দ্র কহিল, ইনিই আমার বন্ধু,—শুধু বন্ধু নয়, ছোট ভাইয়ের মত রাজেন্দ্র। এতবড় কর্ম্মী, এতবড় স্বদেশ-ভক্ত, এতবড় ভয়-শূন্য, সাধু-চিত্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি। বৌদি, এঁর গল্পই সেদিন আপনার কাছে করেছিলাম। ও যেমন অবলীলায় পায়, তেম্‌নি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য্য মানুষ! অজিতবাবু, এঁকেই আপনার তল্পি বইতে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম।

অজিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল অক্ষয় বাবু আসিয়াছেন।

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল,—অক্ষয় বাবু?

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, হাঁ হে হাঁ,—তোমার পরমবন্ধু অক্ষয়কুমার। সহসা চমকিয়া বলিল, অ্যাঁ! ব্যাপার কি আজ? সবাই উপস্থিত যে! আশুবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, পথে নাবিয়ে দিলেন। সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হ'লো হরিঘোষের গোয়ালটা একটু তদারক করেই যাইনা। তাই আসা, -তা' বেশ।

এ সকল কথার কেহ জবাব দিলনা, কারণ, জবাব দিবারও কিছু নাই, বিশ্বাসও কেহ করিলনা। অক্ষয়ের এটা পথও নয়, এ বাসায় সে সহজে আসেওনা।

অক্ষয় কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার ওখানে কাল সকালেই যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়ীটা ত চিনিনে,—ভালই হল যে দেখা হয়ে গেল। একটা সুসংবাদ আছে।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, সুসম্বাদটা কি শুনি? খবরটা যখন শুভ তখন গোপনীয় নয় নিশ্চয়ই।

অক্ষয় কহিল, না—গোপন করবার আর কি আছে। পথের মধ্যে

আজ সেই সেলাইয়ের কল-বিক্রী-আলা পার্শী বেটার সঙ্গে দেখা। সেই সেদিন যে কমলের হয়ে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল। গাড়ী থামিয়ে ব্যাপারটা শোনা গেল। কমলকে দেখাইয়া কহিল, উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া টতুয়া শেলাই করে খরচ চালাচ্ছিলেন,—শিবনাথ তো দিব্যি গা ঢাকা দিয়েছেন—কিন্তু কড়ার মত দাম দেওয়া চাই তো! তাই সে কলটা কেড়ে নিয়ে গেছে,—আশুবাবু আজ পূরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল, কাল সকালেই লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া-পরা চল্‌ছিলনা, আমাদের তো সে কথা জানালেই হোতো।

তাহার বলার বর্ব্বর নিষ্ঠুরতায় সকলেই মর্ম্মাহত হইল। কমলের লাবণ্যহীন শীর্ণ মুখের একটা হেতু দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অবিনাশের পর্য্যন্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

কমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বল্‌বেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।

কেন? কেন?

হরেন্দ্র কহিল, অক্ষয় বাবু আপনি যান্ এ বাড়ী থেকে। আপনাকে আমি আহ্বান করিনি—ইচ্ছে করিনি যে আপনি আসেন, তবু এসেছেন। মানুষের ব্রুট্যালিটির কি কোথাও কোন সীমা থাক্‌বেনা।

কমল হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের দুই চক্ষু যেন জলভারে ছল্ ছল্ করিতেছে। কহিল, অজিতবাবু, আপনার গাড়ী সঙ্গে আছে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দেবেন?

অজিত কথা কহিলনা, শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কমল নীলিমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আর বোধহয় শীঘ্র দেখা হবেনা, আমি এখান থেকে যাচ্ছি।

কোথায় এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিলনা। নীলিমা শুধু তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটুখানি চাপ দিল। এবং পরক্ষণেই সে হরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া অজিতের পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৫

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিল, গাড়ী থামিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ তো নয়?

অজিত উত্তর দিল, না, এ পথ নয়।

নয়? তা' হলে ফিরতে হবে বোধ করি?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরবো। শুনিয়া কমল আশ্চর্য্য হইল। এই অদ্ভুত উত্তরের জন্য যতটা না হোক্, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ ভোলবার অনুরোধ তো আমি করিনি অজিতবাবু, যে সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে। ঠিক যায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার,—আমার কর্ত্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস ক'রে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণায় যদি ভুল ক'রে থাকি কমল?

যদির ওপর তো বিচার চলে না অজিতবাবু। ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তার পরে এর বিচার কোরব।

অজিত অস্ফুট স্বরে বলিল, তা' হলে বিচারই করুন,—আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার, সেদিন তো ঠিক এম্‌নি অন্ধকারই ছিল।

হাঁ, এম্‌নি অন্ধকারই ছিল। এই বলিয়া সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে গিয়া বসিল। জনপ্রাণীহীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কথা কহিল না।

অজিতবাবু?

হুঁ।

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়া কথা তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুন না শুনি?

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বলিল, সেদিন আশুবাবুর বাড়ীতে আমার আচরণটা তোমার মনে পড়ে? সেদিন পর্য্যন্ত ভেবেছিলাম তোমার অতীতটাই বুঝি তোমার বড় অংশ, তার সঙ্গে আপোষ কোরব আমি কি ক'রে? পিছনের ছায়াটাকেই সাম্‌নে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে,সূর্য্যি যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে। কিন্তু—থাক্, কিন্তু। আমি আজ কি ভাব্‌চি তুমি বুঝ্‌তে পারোনা?

কমল বলিল, মেয়ে মানুষ হ'য়ে এর পরেও বুঝ্‌তে পারবো না আমি কি এতই নির্ব্বোধ? পথ যখনি ভুলেচেন, আমি তখনি বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্চে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সাম্‌লাতে পারবো না।

কমল সরিয়া বসিল না। তাহার আচরণে বিস্ময় বা বিহ্বলতার লেশমাত্র নাই। সহজ, শান্ত কণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই, অজিতবাবু, এমনিই হয়। কিন্তু আপনি তো শুধু কেবল পুরুষ মানুষই নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্র পুরুষ মানুষ। এর পরে ঘাড় থেকে আমাকে নামাবেন কি কোরে? ততখানি ছোট কাজ তো আপনি পেরে উঠ্‌বেন্ না।

অজিত গাঢ় কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ আশঙ্কা তুমি কেন কোরচ কমল?

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্যে করিনে অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্যে। পারলে ভয় ছিলনা, পারবেননা বলেই ভাবনা। শুধু একটা রাত্রির ভুলের বদলে এত বড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমার মায়া হয়। আর না, চলুন ফিরে যাই।

কথাগুলো অজিতের কানে গেল, কিন্তু অন্তরে পৌঁছিল না। চক্ষের পলকে তাহার শিরার রক্ত পাগল হইয়া গেল,—বক্ষের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পারো না কমল?

মুহূর্ত্তের তরে কমলের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, পারি।

তবে কিসের জন্যে ফিরতে চাও, কমল, চল আমরা চলে যাই।

চলুন।

গাড়ী চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি তোমার কিছু নেই?

না। কিন্তু আপনার?

অজিতকে ভাবিতে হইল। পকেটে হাত দিয়া কহিল, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই,—তার তো দরকার।

কমল কহিল, গাড়ীখানা বেচে ফেল্‌লেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যাবে।

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ী বেচ্‌বো? কিন্তু এ তো আমার নয়,—আশুবাবুর।

কমল কহিল, তাতে কি? আশুবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ীর নাম কখনো মুখে আন্‌বেন না। কোন চিন্তা নেই, চলুন।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্খলিত হইয়া নীচে পড়িল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে উপহাস কোর্‌চ?

না, সত্যিই বল্‌চি।

সত্যিই বোল্‌চ, এবং সত্যিই ভাবচো পরের জিনিস আমি চুরি করতে পারি? এ কাজ তুমি নিজে পারো?

কমল বলিল, আমার পারা না পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতাম। পরের জিনিস আত্মসাৎ করবার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিস বলে তোমার ধারণা?

কমল কহিল, বড় ছোটর কথা বলিনি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেচি।

না নেই, এবং সেজন্যে লজ্জা বোধ করিনে। এই বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাক্‌লেই লজ্জা বোধ কোরতাম। আর আমার বিশ্বাস সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এ কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশি নয়? শিক্ষিত ভদ্র মন ব'লে কি কখনো কিছু দেখোনি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন কোরব যদি সময় আসে। আজ নয়। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হলে বিদ্রুপ কোরে বোল্‌ত যে কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় তো ভদ্র মনের সঙ্কোচে বাধেনি? আমি কিন্তু তা বল্‌তে পারবো না, কারণ, কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই আর কারও নয়।

কোনদিন বোধ করি হতেও পারো না?

এ তো ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু,—আজ কি কোরে এর জবাব দেবো?

জবাব বোধ হয় কোনদিনই দিতে পারবেনা। মনে হয়, এই জন্যেই শিবনাথের এতবড় নির্ম্মমতাও তোমাকে বাজেনি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচো। এই বলিয়া সে নিশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ী। পাশেই বোধ হয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন-তেমন ভাবে গাড়ীগুলা রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, কমল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিয়া কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক তো বুঝেছিলেন পথ ভুললেই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত, সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল? এত ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হবে কবে? অজিতবাবু, নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে

শিখুন। অমন কোরে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেন না।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয় কমল?

না, তা' হয় না। কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার তো কেবল আপনাকে নিয়েই নয়,—তা'হলে তো সব গোলই চুকে যেতো। এখানে আরো দশজনের বাস, তাদেরও ইচ্ছে—অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই, শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল ব'লে ধিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা প্রকাশ আর কি আছে বলুন তো?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয়? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার আত্মানুশোচনা হয়নি কমল? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল?

কমল এ প্রশ্নের বোধ হয় ঠিক মত উত্তর দিলনা, কহিল, বিশ্বাস করা না করার গরজ আপনার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারো কাছে কোন দিন তো আমি নালিশ জানাইনি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও। কিন্তু ভুলের জন্যে নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে ধিক্কার দাওনি?

না।

তা'হলে এইটুকু মাত্র বল্‌তে পারি তুমি অদ্ভুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিল না, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট-দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পরে অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া

বসিল, কমল, এম্‌নি ভুল যদি আবার কালও ক'রে বসি, তখনো কি তোমার দেখা পাবো ?

কিন্তু, যদির উত্তর তো যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু। অনিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ, ঐ মোহ আমার কাল পর্য্যন্ত টিক্‌বে না এই তোমার বিশ্বাস ?

অন্ততঃ, অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই, কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিত-বাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশি ক'রে জানি।

অজিত কহিল, জান্‌লে কখনো এ বিশ্বাস করতে না যে আজ তোমাকে আমি মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম। এর মধ্যে সত্যি কিছুই ছিলনা।

কমল কহিল, মিথ্যের কথা তো হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। ও দু'টো এক বস্তু নয়। আজ মোহের বশে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চান্‌নি তা' জানি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত তো তুমিই হ'তে কমল। আমার রাত্রের মোহ দিনের আলোতে কেটে যাবে এ নিশ্চয় বুঝেও তো সঙ্গে যেতে অসম্মত হওনি ? একি শুধুই উপহাস ?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই ক'রে দেখলেননা কেন ? পথ খোলা ছিল, একবারও তো নিষেধ করিনি।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না ক'রে থাকো তবে এই কথাই

বোল্‌ব যে তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর ভালবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেম্‌নি অচেতন করে। করুক, কিন্তু একটা যত বড় সত্য, আর একটা তত বড়ই মিথ্যে। তুমি তো জান্‌তে এ আমার ভালবাসা নয়, এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি কোরে একে তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছিলে? কমল, কুহেলিকা যত বড় ঘটা করেই সূর্য্যালোক ঢেকে দিক্‌ তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্য্যই ধ্রুব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্ণিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে শান্ত কণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়, সত্যও নয়। কোন্‌ আদিমকালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্য্যকে সে বারবার আবৃত করেছে এবং বারবার আবৃত করবে। সূর্য্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দু'টোই নশ্বর, হয়ত, ও দু'টোই নিত্যকালের। তেমনি, হোক্‌ মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বারবার ফিরে আসে। মালতী ফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর ন্যায় দীর্ঘ নয় ব'লে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে? আজ একটা রাত্রির মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু, আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এতবড় সত্য?

কথাগুলা যে অজিত বুঝিতে পারিলনা তাহা বুঝিয়াই সে বলিতে লাগিল, আমার কথা আজও বোঝবার দিন আপনার আসেনি। তাই, শিবনাথের প্রতি আপনাদের ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করেচি। যা' পেয়েছি তার বেশি কেন পাইনি এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এম্‌নিই নির্ব্বিকার ক'রে তুলেচ। আচ্ছা, সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই?

কমল তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

কার বিরুদ্ধে শুনি না কমল?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে?

অপরের কথা? যাই হোক্, তবু তো নিশ্চিন্ত হতে পারবো, অন্ততঃ, আমার ওপর তোমার রাগ নেই।

কমল কহিল, নিশ্চিন্ত হলেই কি খুসি হবেন? কিন্তু তার এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েচি, গাড়ী থামান, আমি নেবে যাই!

গাড়ী থামিল। অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, কাছে আসিতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। অজিত সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে?

আমি রাজেন। আজ হরেনদার আশ্রমে দেখেছেন।

ওঃ—রাজেন? এত রাত্রে এখানে কেন?

আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছি। আপনারা চলে আসার পরেই আশুবাবুর বাড়ী থেকে লোক গিয়েছিল আপনাকে খুঁজতে। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল।

কমল কহিল, আমাকে খুঁজতে যাবার হেতু?

লোকটী কহিল, আপনি বোধ হয় শুনেচেন চারিদিকে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্চে। শিবনাথবাবু অতিশয় পীড়িত। হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়ীতে নিয়ে এসেছে। আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন, তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।

রাত এখন কত ?

বোধ হয় তিনটে বেজে গেছে।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাবো।

অজিত একটা কথাও কহিল না। কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ী চালাইয়া হরেন্দ্রের বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। রাজেন অবতরণ করিলে কমল কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করলেন।

এ আমার কাজ। প্রয়োজন হলেই সম্বাদ দেবেন? এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, শাদা কথায় জানাইয়া গেল এ তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। আজই সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্রের মুখে এই ছেলেটির সম্বন্ধে যত কিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই মনে পড়িল। একদিকে তাহার একৃজামিন পাশ করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তাহা ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য। বয়স তাহার অল্প, সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া কিছুই হাতে রাখে নাই, পরের কাজে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সেই অবধি নীরব হইয়াছিল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেছে শোনার পরে কোন কিছুতে মন দিবার শক্তি আর তাহার ছিল না। শুধু একটা কাল্পনিক, অসম্বন্ধ প্রশ্নোত্তর মালার আঘাত অভিঘাতের নীচে এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায় অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবে না, শুধু আপন আপন ইচ্ছা, অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার

আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশি ব্যাকুল করিয়াছিল তাহাকে এই লজ্জাহীনা মেয়েটার নির্ভয় সত্যবাদিতা। এ জগতে মিথ্যা বলার ইহার প্রয়োজন নাই। এ যেন পৃথিবী শুদ্ধ সকলকে শুধু অপমান করা।

এদিকে শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারা উপস্থিত হইয়াছে সে জানে না। এই মেয়েটীকে তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কমলকে সে ঘৃণা করে, এবং ইহারই লুব্ধ আশ্বাসে সে যে আত্ম-বিস্মৃত উন্মাদের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্যও জ্ঞান হারাইয়াছে ইহার কঠিন শাস্তি যেন তাহার হয় এই বলিয়া সে বারবার করিয়া আপনাকে আপনি অভিশাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া আশুবাবু স্বয়ং। বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ীর শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হাঁ।

যদু, কমলকে শিবনাথের ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচো বোধ হয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন, কহিলেন, এই ঋতু-পরিবর্ত্তনের কালটা এম্‌নই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম স্যারাম হঠাৎ যা' সুরু হয়েছে লোকে মারা পড়চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভালো নয়, যেন জ্বরভাব ক'রে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েছেন? এখানে দেখবার লোকের তো অভাব নেই।

কে আর আছে বল? ডাক্তার এসে দেখে শুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তোমার আস্‌তে দেরী হতে লাগ্‌লো,—কমল, মানুষের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখ্‌তে আছে? ঝগড়া-ঝাঁটি যে হয় না তা' নয়, কিন্তু তিন চার দিন কোথায় কোন্ বাসায় গিয়ে সে যে জ্বরে পড়েচে একটা খবর পর্য্যন্ত তো নাওনি? ছি, এ কাজ ভালো হয়নি, এখন একলা তোমাকেই তো ভুগ্‌তে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল, এই সরল-চিত্ত ব্যক্তিটি ভিতরের কোন কথাই জানেননা। সে চুপ করিয়া রহিল, আশুবাবু তাহার অভিমান শান্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুন্‌লাম তুমি বাড়ী নেই, তখনই বুঝেচি অজিত তোমাকে ছাড়ে' নি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালোবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো তো অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হলে তোমরা কি বিপদেই পড়তে।

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ নামিয়া গেল। কোন কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকিতেই চায় না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপ ধপ্ করিতেছে। স্নেহ ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল। কিন্তু, কমল তাঁহার সকল কথায় কান দেয় নাই, হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে নাই, জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাঁস্‌পাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, হাঁস্‌পাতাল? তবেই তো তোমার রাগ এখনো পড়েনি।

রাগের জন্যে বলচিনে আশুবাবু, যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক তাই শুধু বল্‌চি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত তো নয়ই। তবে, এটা স্বীকার করি এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না, উচিত ছিলনা। মণি জান্‌তেন চিকিৎসা করাবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। কমল বলিতে লাগিল, কেবল মনোরমাই নয়, শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়েই রোগ সারে না, ওষুধ পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত এ ভালোই হয়েছে যে খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁচেছে। তাঁর পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জায় ম্লান হইয়া মাথা নাড়িয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথাই নয় কমল,—সেবাই সব। যত্নই সব চেয়ে বড় ওষুধ। নইলে, ডাক্তার-বদ্যি উপলক্ষ মাত্র। তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়িয়া বলিলেন, আমি যে ভুক্তভোগী কমল, রোগ ভুগে ভুগে সে শিক্ষা হ'য়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিস তুমি যা ভালো বুঝ্‌বে তাই হবে। আমি থাকতে ওষুধ-পথ্যির ত্রুটি হবেনা। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না বুঝিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ লইল। রোগীর গৃহ পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে রোগীর বুকের পরে অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া বোধকরি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার পরে পরস্পর সন্নদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল

নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মাত্র। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল,—তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

১৬

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা; রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্ব্বাকৃতি ঘষা-কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, তাহার অস্পষ্ট আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাত্মীয়া ভদ্র-মহিলার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান? চাইলে আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ বাড়ীতে আর তো আপনার এক মুহূর্ত্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্যত্র চলে যাবো।

কমল কহিল, সেই ভালো, আমিও তখনই যাবো। আপাততঃ, এই চেয়ারটায় বসে বাকি রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝঞ্ঝাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরি করবেন না।

সকালে বেহারা আসিয়া অজিতকে আশুবাবুর শয়নকক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল,—ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভালো ছিলনা, আজ মনে হচ্ছে যেন,—আচ্ছা, বোস অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুন্‌লাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাক্‌তে বল্‌তেও পারিনে, বেশ, গুড্‌বাই। আর কখনো যদি দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আশীর্ব্বাদ করেচি,—যেন, আমাদের ক্ষমা ক'রে তুমি জীবনে সুখী হ'তে পারো।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। নির্ব্বাক বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এতবড় পরিবর্ত্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই তিন মৌন থাকিয়া এবার কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখো-চোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারা রাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেচে, কত-কি যে ভেবেচি, সে আমি কা'কে জানাবো?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন, শিবনাথ

নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটায় কান দিইনি, ভেবেছিলাম, এ তার অত্যুক্তি, এ তার বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝিনি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে,—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল ; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারিনি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম, কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্চে, আগ্রায় যদি আমরা না আস্‌তাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার এক ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর !

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েছে আশুবাবু।

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা' হোক্। কমল, আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার কিছু-একটা তুমি উপায় ক'রে দাও। আমার বাড়ীতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দিয়েচে।

কমল চাহিয়া দেখিল, অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি কি করতে বলেন, বলুন। কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চাননা, কিন্তু তিনি পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠানো, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়, তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানেন তো,

চিকিৎসা করাবার শক্তি নেই আমার; আমি প্রাণপণে শুধু সেবা করতেই পারি, তার বেশি পারি নে।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, কমল, কেন জানিনে, কিন্তু এম্‌নি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষাণ হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিস তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্যে ভয় কোরোনা, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বল্‌বার দরকার নেই কমল, সে আমি জানি। একদিন সমস্ত আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি বেঁচে থাক্‌তে এতবড় অন্যায়-অত্যাচার তোমার ওপরে ঘট্‌তে দেবনা।

কমল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিলনা।

কি ভাব্‌চো কমল?

ভাব্‌ছিলাম আপনাকে বলার প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু মনে হচ্চে প্রয়োজন আছে, নইলে, পরিষ্কার কিছুই হবেনা, বরঞ্চ ময়লা বেড়ে যাবে! আপনার টাকা আছে, হৃদয় আছে, পরের জন্যে খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ ভুল যদি আপনার থাকে সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ কোরবনা।

আশুবাবুর সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পাড়ল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি কমল, তার কি ক্ষমা নেই?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেননি যেমন এখন করতে যাচ্চেন। ভাব্‌চেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকেই বাঁচানো,—আমাকেই অনুগ্রহ করা। কিন্তু তা' নয়। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এম্‌নি রাগই হয় বটে কমল; এ তোমার অস্বভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথ-কেই বাঁচাতে যাচ্চি, তোমাকে অনুগ্রহ করচিনে। এ হলে হবে তো?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না, হবেনা। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারবনা তখন আমার উপায় নেই। ওঁকে হাঁসপাতালে পাঠাতে না চান্‌, হরেন্দ্রবাবুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনার যা' খরচ করবার তা' সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি। এই বলিয়া সে যথার্থ-ই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কথায় ও আচরণে আশুবাবু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কমল। উভয়ের কল্যাণের জন্যে যা' করতে যাচ্চি তাকে তুমি অকারণে বিকৃত করে দেখ্‌চ। একদিক দিয়ে যে আমার লজ্জার অবধি নেই এবং এ কদাচার অঙ্কুরে বিনাশ না করলে যে আমার গ্লানির সীমা থাক্‌বেনা সে আমি জানি, কিন্তু আমার কন্যা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্চি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে আমি নানামতেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু কেবল সেটুকুই আমি চাইনি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেম্‌নি কোরেই আবার ফিরে পাও, সেই কামনা করেই আমি এ প্রস্তাব করেচি, নিছক স্বার্থপরতা বশেই করিনি।

কথাগুলি সত্য, সকরুণ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পড়িলনা। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম আশুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেচি, এ আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাইনে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়,—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারবনা।

তাহার বলার মধ্যে উষ্মাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্তই শাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন স্তব্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, এ কি কথা কমল? এই সামান্য কারণে স্বামী ত্যাগ করতে চাও? এ শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ শিক্ষা তোমাকে যে-ই কেননা দিয়ে থাক্, সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। এ অন্যায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাকো তুমি বাঙ্‌লা দেশেরই মেয়ে, এ পথ তোমার আমার নয়,—এ তোমাকে ভুলতেই হবে। জানো কমল, এক দেশের ধর্ম্ম আর এক দেশের অধর্ম্ম। আর স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং, কথা শেষ করিয়া যেন তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল, সে লেশমাত্র বিচলিত হইলনা।

আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু ভ্রান্তি ধরা পড়ে গেল জন কয়েক মনীষীর চক্ষে। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা

বারবার শুধু এই কথাই বলতে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেছো কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্য, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাত্তে হবেনা, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্ব্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই তো স্বচক্ষে দেখে এসেচি, এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্ক-বাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন, আজ দেশের কি হোতো! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে তো—উঃ—শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা! এই বলিয়া তিনি স্বর্গগতঃ মনীষিগণের উদ্দেশে যুক্ত-করে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধচক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেশে যেন তাহার সংজ্ঞা নাই,—এম্নি অবস্থা।

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এই জন্যেই দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাক্তেন।

শুধু কেবল এই জন্যেই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়?

হাঁ, শুধু কেবল এই জন্যেই। বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেরাতে বলেছিলেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যদি আলো জ্বলে, যদি পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যোদয় হয় তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাক্তে হবে? সেই হবে দেশপ্রীতি?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেলনা, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম্ম, দেশের পুরাণ ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যা' বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে এ তো শুধু

তাঁদেরই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ফল। জাতি হিসেবে আমরা যে ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা যে কোনমতেই রক্ষা পাবোনা, এ বোধশক্তি আমাদের দিলে কে বলো ত?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এ সব চিন্তাও যে আপনার মনে স্থান পেতে পারে এ কখনো আমি কল্পনাও করিনি। আমার ভারি দুঃখ যে এতকাল আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে আরও কত-কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন, এবং পরক্ষণেই তিনি সতীশ ও রাজেন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, খবর নিয়ে জান্‌লাম শিবনাথবাবু ঘুমোচ্চেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়ীটা অম্‌নি ঘুরে এলাম; তাঁর বিশ্বাস অসুখ সিরিয়স্‌ নয়, শীঘ্রই সেরে উঠবেন। এই বলিয়া তিনি কমলকে একটা নমস্কার করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি। এবং তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেছে এ তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছে থেকে দেখা যায়না, যায় শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েচি শিক্ষিত-মনের পরিবর্ত্তন। এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডাল-পালা ছড়াবার আয়োজন, এ কি শুধু এইজন্যেই নয়? বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা কোরে দেখো। সেই ব্রহ্মচর্য্য, সেই সংযম সাধনা, সেই পুরাণো রীতি-নীতির প্রবর্ত্তন—এ সবই কি আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃ প্রতিষ্ঠার

উদ্যম নয়? তাই যদি ভুলি, তারই প্রতি যদি আস্থা হারাই, আশা করবার আর আমাদের বাকি থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিল্‌বে অজিত? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্যবসায়ী ছিলেননা, ছিলেন সন্ন্যাসী; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে, নত শিরে নিতে পারাই হ'ল আমাদের চরম সার্থকতা; এই আমাদের কল্যাণের পথ কমল, এ ছাড়া আর পথ নেই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রর বিস্ময়ের পরিসীমা নাই,—এই সাহেবী চাল-চলনের মানুষটি আজ বলে কি! এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইলনা, অকস্মাৎ কিসের জন্য আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বক্তার নিজের বিস্ময়ও কম ছিলনা। শুধু বলিবার শক্তির জন্যই নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার সুযোগও তিনি কখনও পান নাই,—তাঁহার মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য ক্ষণকাল পূর্ব্বের দুঃখ যেন ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, বুঝলে কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না? না কেন?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে, এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখাননি। অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলেচে। এ হয় ত

সত্যি, কিন্তু তাতে ভালোই যে হবে তার প্রমাণ কি আশুবাবু? কই, সে তো বলেননি?

বলিনি কি রকম?

না, বলেননি। যা বল্‌ছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবক মাত্রেই ঠিক এম্‌নি কোরে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধার মাত্রই যে ভালো তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেননা, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্যে কেউ শক্তি ক্ষয় করেনা।

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতন মাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভালো মনে কো'রে করে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বল্‌তে চেয়েছিলাম আশুবাবু, কিন্তু আপনি কান দেননি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হোক্‌ বা পারলৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্মই হোক্‌, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ-প্রীতির বাহোবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুসি করা যায়না। তিনি ক্ষুণ্ণ হন।

আশুবাবু অবাক হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি বলো কি কমল? দেশের ধর্ম্ম, দেশের আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে নিজের বলতে আর বাকি থাক্‌বে কি? জগতে মানুষ বলে দাবী জানাতে যাবো কোন্‌ পরিচয়ে?

কমল কহিল, দাবী আপনি এসে ঘরে পৌঁছবে পরিচয়ের প্রয়োজন হবেনা। বিশ্ব জগৎ বিনা পরিচয়েই চিন্‌তে পারবে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, তোমাকে তো বুঝ্‌তে পারলামনা কমল।

বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু। এম্‌নিই হয়। এই চলমান

সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তের পদে পদে যে সত্য নিত্য নূতন রূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিন্‌তে পারেনা। ভাবে এ কোন আপদ কোথা থেকে এলো। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিন্‌তে পারাও যাবেনা। মনে হবে সে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে। কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়,—এম্‌নি ভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের ঝোড়োহাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল,—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছি। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরুত্তরে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটিকে কোথাও তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও বা একেবারেই বুঝিলেন না; শুধু ইহাই মনে হইতে লাগিল এইমাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল, সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-মুখে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আবেদন নিবেদন ভাসিয়া গেছে।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে কোরে এনেছিলেন, চলুননা পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিলনা। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেন্দ্রর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেনবাবু, তুমি চলোনা ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পরে কহিল, চলুন।

দ্বারের কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,

আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করিনি। ঐ সর্ত্তে ইচ্ছা হয় পাঠিয়ে দেবেন আমি যথাসাধ্য ক'রে দেখ্‌বো। বাঁচেন ভালোই, না বাঁচেন অদৃষ্ট। এই বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন,—অসুস্থ গৃহস্বামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্য্যন্ত বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধেক পথে রাজেন্দ্র বিদায় লইল, বলিয়া গেল ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্যমনস্কতা বশতঃই বোধ করি আপত্তি করিলনা, কিম্বা, হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। যে নীচ-জাতীয়া দাসীটি তাহার কাজ-কর্ম্ম করিয়া দিত, সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদীর দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট নাতিনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গেছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। একরকম কাল হইতেই সে অভুক্ত; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাঁধিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্রামের তাহার একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয়না। চারিদিকে এত যে আবর্জ্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিন এম্‌নি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল। ছাদের পুরাণো চুণ-বালি আসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই; চড়াই পাখীর বাসা তৈরির অতিরিক্ত মাল-মস্‌লা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদোর বদলানো প্রয়োজন; বালিশের অড় অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার; চেয়ার টেবিল স্থানভ্রষ্ট, দরজার পা-পোষটায় কাদা জমাট বাধিয়াছে, আয়নাটার এমনি অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে

একটা বেলা লাগিবে, দোয়াতের কালি শুকাইয়াছে, কলমগুলা খুঁজিয়া পাওয়া দায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজগুলার চিহ্নমাত্র নাই,—এমনিধারা যেদিকে চাহিয়া দেখিল অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মানুষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিলনা। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধূলা-মাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবেই বা কোথা হইতে? যাইতেই হইবে, শুধু যাওয়ার দিনটারই যেন সে কেমন করিয়া যেন নাগাল পাইতেছিলনা,—রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না।

গৃহের প্রতি মমতা নাই, অথচ আজ কিসের জন্য যে এতটা খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ কি ইহার প্রয়োজন হইল, এম্‌নি একটা ঘোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে যখনই আবর্ত্ত উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শূন্য চক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যেন ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল। এম্‌নি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দুই শেষ হইয়াছে। কিন্তু বেলা তো রোজই শেষ হয়, শুধু এম্‌নি করিয়াই হইতে পায় না। সন্ধ্যার পর সে আলো জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল, এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্যই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উল্টাইতে বসিল। কিন্তু শ্রান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিলনা, কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দুই-ই বুজিয়া আসিল সে টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন ঘরে দীপের আলো নিবিয়াছে, এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের

অরুণালোকে সমস্ত গৃহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না। অতএব বাসাটা খোঁজ করিয়া তাহার অসুখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন, এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

ডাক আসিল, ঘরে আছেন? আসতে পারি?

আসুন।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র। চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, কোথাও বেরুচ্ছিলেন না কি?

হাঁ। যে বুড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে তার অসুখের খবর পেয়েচি। তাকেই দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম।

বেশ খবর। ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্মেই বোধ করি সুরু হ'ল। বস্তীগুলোতে মরতেও আরম্ভ করেছে। মথুরা-বৃন্দাবনের মত সুরু হলে হয় পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে। এ বুড়ী থাকে কোথায়?

ঠিক জানিনে। শুনেচি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ ক'রে নিতে হবে।

হরেন্দ্র কহিল, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন। এ দিকের খবর পেয়েছেন বোধ হয়?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া এক মুহূর্ত্তে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কাল আসতাম, কিন্তু সময় ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেন নি, শুনলাম তাঁর শরীর খারাপ, আশুবাবু বিছানা নিয়েছেন সে তো

কাল দেখেই এসেছেন,—ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকেল থেকে জ্বর, বৌদির মুখটাও দেখলাম শুক্‌নো-শুক্‌নো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এ সকল খবরে সে যেন ভালো করিয়া মন দিতেই পারিলনা।

হরেন্দ্র কহিল, এ ছাড়া শিবনাথবাবু। ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার,—বলা কিছু যায়না। অথচ, হাঁসপাতালে যেতেও চাইলেননা। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হ'ল। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জনকয়েক পাঞ্জাবী আছে,—ঠিকেদারী করে। শুন্‌লাম তারা লোক ভালো।

কমল নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেন বাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন?

পারি, কিন্তু তাকে পাবো কোথায়? আজ ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। ঐ দিকের কোন্ একটা মুচীদের মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেছে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে তো খবর দেবো।

তাঁকে রিমুভ করলে কে? আপনি?

না, রাজেন। তার মুখেই জানতে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্চে। তবে, তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েছে তখন সহজে ত্রুটি হতে দেবেনা,—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা ওকে রোগে ধরেনা। পুলিশে না ধরলে ও একাই একশ'। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জব্দ, নইলে ওকে কাবু করে দুনিয়ায় এমন তো কিছু দেখ্‌লাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি ?

আশা তো করি। অন্ততঃ, আশ্রমটা তা'হলে বাঁচে।

ওঁকে চলে যেতে বলে দেননা কেন ?

ঐটি শক্ত। বল্‌লে এম্‌নি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবেনা।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি ?

ক্ষতি ? ওকে তো জানেন না, না জান্‌লে সে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায়না। আশ্রম না থাকে সেও সইবে, কিন্তু, ও-ক্ষতি আমার সইবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিটখানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদ্‌লাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনাও করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম ব্যাপার কি ? অসুখ বাড়লো নাকি ? না, সে-সব কিছু নয়, বাক্স বিছানা নিয়ে তিনি এসেছেন আশ্রম-বাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে,—আশ্রমের নিয়মে আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন এই তাঁর পণ, এর আর নড়-চড় নেই। বড়লোক পেলে আমাদের ভালই হয়, কিন্তু শঙ্কা হোলো ভেতরে কি একটা গোলযোগ আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বল্‌লেন সঙ্কল্প অতিশয় সাধু, কিন্তু ভারতে আশ্রমের তো অভাব নেই, সে আগ্রা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে এ-বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিনকতক টিকৃতে পারতাম। আমাকে দেখছি তল্পি বাঁধ্‌তে হোল।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলনা, চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিল, তাঁর ওখান থেকেই এখানে আস্‌চি। ভাব্‌চি ফিরে গিয়ে অজিতবাবুকে বোল্‌ব কি।

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ প্রতিবাদ হইয়া গেছে। হয়ত, প্রকাশ্যে এবং স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কর্কশতায় সে-যে সর্ব্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার নাই। কিন্তু একটা কথারও সে উত্তর করিলনা, তেম্‌নিই নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেছেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্ম্মাহত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ী-থেকে বিদায় করেছেন। মনোরমার বোধ হয় এ-ইচ্ছে ছিলনা, শিবনাথ তাঁর গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করাবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেলেনা। অজিতবাবু বোধ হয় এ-পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া করে ফেলেছেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শুন্‌লেন কার কাছে? রাজেন্দ্র বল্‌লে?

সে? সে পাত্রই ও নয়। জান্‌লেও বল্‌বেনা। এ আমার অনুমান। তাই ভাব্‌চি, মিটমাট তো হবেই, মাঝে থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি? চুপ্-চাপ থাকাই ভালো; যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ত্রুটি হবেনা।

কমল কহিল, সেই ভালো।

হরেন্দ্র কহিল, কিন্তু এখন উঠি। সেজ্‌দার জন্যেই ভাব্‌না, ভারি অল্পে কাতর হ'ন। সময় পাইতো কাল একবার আস্‌বো।

আস্‌বেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেন্দ্রকে পাঠাতে ভুল্‌বেননা। বল্‌বেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাক্‌চেন ? হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু আমাকে বলা যায়না ? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জান্‌বেন।

তা জানি। কিন্তু তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন।

দেবো, নিশ্চয় দেবো, এই বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্ণ বেলায় রাজেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন্‌, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

তা' দেবো। কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও খস্‌লো ?

বেশ ত হাল্‌কা হয়ে গেলো। না চাও তো বল জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো ?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয়না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারি করে তুল্‌তে আমার লজ্জা করে। 'আপনি' বলবারও দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

ইহার স্পষ্ট জবাবটা রাজেন্দ্র এড়াইয়া গিয়া কহিল, কি আমাকে করতে হবে ?

আমার বন্ধু হতে হবে। লোকে বলে তুমি বিপ্লব-পন্থী। তা' যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগ্‌বে ?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল, কহিল, অমন কথা বল্‌তে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটা সংসারে দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার

চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনোনা তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো কোরোনা।

কিন্তু এ অনুযোগ লোকটিকে কুণ্ঠিত করিলনা, সে স্মিতমুখে সহজ ভাবেই বলিল, অশ্রদ্ধার জন্যে নয়,—বন্ধুত্বের প্রয়োজন বুঝিনে তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগ্‌বে, আমি অস্বীকার কোরবনা। কিন্তু কি কাজে লাগ্‌বে তাই ভাব্‌ছি।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা, তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কের আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেচো?

রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এ সব ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি বড় খারাপ। কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বোল্‌চ?

সত্যিই বল্‌চি।

কমল জেরা করিল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল, স্ত্রীলোকের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেম্‌নি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস বুঝিল! 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই,—'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ত-তলে আজিও নারী-মূর্ত্তির ছায়া পড়ে নাই,—'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন জানো?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁক ছিলনা। সবাই সন্দেহ ক'রে নানা কথা কইলে, বল্‌লে এ বিবাহ পাকা হোলোনা। আমার কিন্তু ভয় হোলোনা; বল্‌লাম, হোক্‌গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েছে তখন বাইরের গ্রন্থিতে ক'পাক পড়্‌লো আমার দেখ্‌বার দরকার নেই। বরঞ্চ, ভাব্‌লাম এ ভালই হল যে স্বামী বলে যা'কে নিলাম তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আল্‌গাই থাকে তো থাক্‌না। মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল তো ডুব্‌লো। কিন্তু এ সব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝ্‌বেনা।

রাজেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানিনি যে তাঁর টাকার লোভটা এত ছিল! জান্‌লে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দায় এড়াতে পারতাম।

রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে?

কমল সহসা আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক্‌গে মানে। এ তোমার শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ঘরের মধ্যে বাহিরের সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। কমল আলো জ্বালিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তা হোক্, আমাকে ওঁর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি কর্‌বেন গিয়ে ?

নিজের চোখে একবার দেখ্‌তে চাই। যদি প্রয়োজন হয় থাক্‌বো। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এই জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবেনা। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই। বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ, চলুন। আমি একটা গাড়ী ডেকে আনিগে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন্দ্র বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ করে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম ; কিন্তু, এখানে আমার থাকা চল্‌বেনা,—শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করেছে ?

তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে,—সেজন্যে নয়।

কমল হরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এঁরা বুঝি তোমাকে চলে যেতে বল্‌চেন ? কিন্তু পুলিশের ভয়ে যাঁরা এমন আতঙ্কিত, ঘটা কোরে তাঁদের দেশের কাজে না নামাই উচিত। কিন্তু,

তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে কেন ? এই আগ্রা শহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবেনা।

রাজেন্দ্র কহিল, সে বোধকরি আপনি স্বয়ং। কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে ভুল্‌বনা। কিন্তু এ দৌরাত্ম্যে ভয় পায়না ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল। থাক্‌লে দেশের সমস্যা ঢের সহজ হয়ে যেতো।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার যাওয়া সে জন্যে নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারিনে। আর যারই হোক্, আমাকে যাও বলা হরেনদার মুখে আস্‌বেনা।

তবে যাবে কেন ?

যাবো নিজেরই জন্যে। দেশের কাজ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলেনা, কাজের ধারাতেও মেলেনা। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়। কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবেনা।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন ? মন যেখানে মিলেচে, থাক্‌না সেখানে মতের অমিল ; হোক্‌না কাজের ধারা বিভিন্ন ; কি যায় আসে তাতে ? সবাই একই রকম ভাব্‌বে, একই রকম কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চল্‌বে এ কেন ? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল তো সে কিসের শিক্ষা ? মত এবং কর্ম্ম দুই-ই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ, এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বল্‌ছিলে তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্যে কায়া ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।

রাজেন্দ্র কথা কহিলনা, শুধু হাসিল।

হাস্‌লে যে?

হাস্‌লাম তখন হাসিনি বলে। আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলটাকেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিচ্ছুনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।

তার মানে?

রাজেন্দ্র বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হোয়েচে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য্য এবং মহত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায়না। সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।

একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্তবড় শিক্ষা বল্‌ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায়না।

কমল অতি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারের সর্ব্বনাশ করিনে,—বন্ধুর হলেও না,—তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বলো?

রাজেন্দ্র কহিল, বলি। কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্ম্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই

মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই। শিবানি—

কমল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমার এ নামটাও তুমি শুনেচ?

শুনেচি। কর্ম্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক্, অন্তরের বিচার অন্তর্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলেনা। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দু'জনের মনের মিল দিয়ে তো সঙ্গীত সৃষ্টি হয়না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে-সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের ঐক্যটাই রাজার শক্তি। হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম,—এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। গাড়োয়ান রোকো রোকো,—শিবানি, এই তাঁর বাসা।

সম্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া নীচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের স্বল্পালোকে বোধ হয় চিনিতে পারিলনা। মুহূর্ত্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

১৭

চারিদিকে চাহিয়া কমল স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের এ কি চেহারা! এখানে যে' মানুষে বাস করিয়া আছে সহজে যেন প্রত্যয় হয়না। লোকের সাড়া পাইয়া সতেরো আঠারো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা আসিয়া দাঁড়াইল; রাজেন্দ্র তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবনাথ বাবুর চাকর। পথ্য তৈরি করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্য্যন্ত এরই ডিউটি। সুর্য্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমোতে সুরু করেছিল, এখন উঠে আস্‌চে। রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে তো একেই দিন্‌ বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাৎ বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে?

আজ ওযুধ খাইয়েছিলি?

ছেলেটা বাঁ হাতের দু'টা আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া।

আউর কুছ খিলায়া?

হুঁ,—দুধ ভি পিলায়া।

বহুত আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবী বাবুরা কেউ এসেছিল?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়েদ দো পহরমে একঠো বাবু আয়া রহা।

শায়েদ? তখন্‌ তুমি কি করছিলে বাবা, ঘুমুচ্ছিলে?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফগুয়া, তোর এখানে ঝাড়ু টাড়ু কিছু আছে?

ফগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল, রাজেন্দ্র কহিল, ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিট্‌বেন না কি?

কমল গম্ভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাসার সময়? মায়া-মমতা কি তোমার শরীরে কিছু নেই?

আগে ছিল। ফ্লাড্‌ আর ফ্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জ্জন দিয়ে এসেচি।

ফগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন্দ্র বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দু'টো খেয়ে আসিগে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর এই ছেলেটাকে নিয়ে যা' পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবো। ভয় পাবেননা, আমি ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই ফিরবো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জ্জন হইয়া উঠিল। যাহারা উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলের পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা গেল তাহারা শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সম্বাদ লইতে কেহ আসিলনা। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝেয় কম্বল পাতিয়া ফগুয়া ঝিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইক্লের ঘণ্টা শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন্দ্র প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকাল মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে, হাতের ছোট পুঁটুলিটা পাশের টিপায়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অন্যান্য মেয়েদের মত আপনাকে যা' ভেবেছিলাম তা' নয়। আপনার পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন্দ্র কহিল, ইতিমধ্যে দেখ্‌চি বিছানাটা পর্য্যন্ত বদ্‌লে ফেলেচেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন, কিন্তু ওঁকে তুলে শোয়ালেন কি করে ?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জান্‌লে শক্ত নয়।

কিন্তু জান্‌লেন কি কোরে ? জানার তো কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই ? ছেলেবেলায় চা' বাগানে আমি অনেক রুগীর সেবা করেচি।

তাই তো বলি। এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আস্‌বার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বস্‌চি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, খাবার কথা তো তোমাকে বলিনি, হঠাৎ এ খেয়াল হোল কেন ?

রাজেন্দ্র বলিল, খেয়াল হঠাৎই হোল সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন কি জানি কেন মনে হ'ল আপনারও হয়ত ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। আস্‌বার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরি কর্‌বেননা, বসে যান্‌। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজাটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ বাড়ীর কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া এক টুক্‌রা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি জল ঢেলে দিচ্চি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁরও এম্‌নি কথার মধ্যে বিশেষ রস-কস ছিলনা, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে

আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারবোনা ভাই। তুমি হয়ত জানোনা যে, আমি নিজে রেঁধে খাই, আর এই সব দামী ভালো-ভালো খাবারও খাইনে। আমার জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অন্যান্য দিন যেমন হয়, তেম্‌নি বাসায় ফিরে গিয়েই খাবো।

তা' হলে আর রাত না ক'রে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে।

তুমি এখানেই আবার ফিরে আস্‌বে?

আস্‌বো।

কতক্ষণ থাক্‌বে?

অন্ততঃ কাল সকাল পর্য্যন্ত। ওপরের পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না ক'রে নোড়বনা। একটু ক্লান্ত, তা হোক্। এতটা অযত্ন হবে ভাবিনি। উঠুন, এদিকে গাড়ী পাওয়া যাবেনা, হাঁট্‌তে হবে। ফেরবার পথে মুচীদের বস্তিটা একবার ঘুরে আসা দরকার। দু-ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে।

কমলের আবার সেই কথাই মনে পড়িল, এ লোকটার অনুভূতি বলিয়া কোন বালাই নাই। অনেকটা যন্ত্রের মত। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারম্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করে,—কর্ম্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জল-বায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে। অথচ, অন্যের বিস্ময়ের অবধি থাকেনা, ভাবে, কেমন করিয়া এমন হয়। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজেও তো ডাক্তার?

ডাক্তার? না। ওদের ডাক্তারি-ইস্কুলে সামান্য কিছুদিন শিক্ষানবিসি করেছিলাম।

তাহলে ওদের দেখ্‌চে কে?

যম।

তবে তুমি করো কি ?

আমি করি তাঁর তদ্বির। তাঁর গুণ-মুগ্ধ পরম ভক্ত আমি। এই বলিয়া সে কমলের বিস্ময়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল, যম নয়, তিনি যমরাজ। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন। রাজাই বটে। যেমন দয়া তেমনি সুবিবেচনা। বিশ্ব-ভুবনে স্থষ্টিকর্ত্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা-সৃষ্টি আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস কোরচ রাজেন ?

একেবারে না। শুনে সতীশদা মুখ গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে বলেন আমাকে সিনিক, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছ্রতা, সংযম, ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতার অস্ত্র-শস্ত্র শানিয়ে যম-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অতএব, মনে করেন আমি তাঁদের উপহাস করি। কিন্তু তা' করিনে। দুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যাননা, গেলে আমার ধারণা আমারই মত পরম রাজ ভক্ত হয়ে উঠতেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মৃত্যু-রাজার গুণগান করতেন, এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গাল দিয়ে আর বেড়াতেননা।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয় তোমাকে সিনিক বলাটা কি দোষের ?

দোষেব বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচীদের পাড়ায় ? গড়া-গড়া পড়ে আছে,—আজকের ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে-কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুট্‌লেই হ'ল। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার

কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই,—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা আছে কোথায়? তখনি কুল দেখ্‌তে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি ভয় নেই, ওরে ভয় নেই,—সমস্যা যতই গুরুতর হোক্‌, সমাধান করবার ভার যাঁর হাতে তিনি এলেন বলে। অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের এ দেব-ভূমির সমস্ত ভার নিয়েছেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা ঢের বেশি সৌভাগ্যবান। কিন্তু কোথা থেকে কি সব কথা এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁট্‌তে হবে।

কিন্তু তোমাকে তো আবার এই পথটা হেঁটেই ফিবতে হবে?

তা' হবে।

তোমার মুচীদের পাড়া কত দূরে?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে।

তা'হলে তোমার পা-গাড়ী কোরে ঘুরে এসোগে,—আমি বস্‌চি।

রাজেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা। আপনার যে দু'দিন খাওয়া হয়নি।

কে দিলে তোমাকে এ খবর?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই। কিন্তু খবরটা আমি নিজেই সংগ্রহ করেচি। আস্‌বার সময়ে আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুদ, পাত্রটির চেহারা দেখ্‌লে সন্দেহ থাকেনা যে সে গত রাত্রির ব্যাপার। অর্থাৎ, দিন দুই চলেচে নিছক উপবাস। অতএব, হয় চলুন, না হয় যা এনেচি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ? কমল একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

তা' জানিনে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করচি, সম্বাদ পেলে আপনাকে জানাবো।

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা কোরোনা। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদারা তোমাকে অল্পই চিনেচেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। সুতরাং আমাকেও চিনে রাখা তোমার দরকার। অথচ, তার জন্যে সময় চাই, সে পরিচয় কথা-কাটাকাটি করে হবেনা। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা খাই, অতি দরিদ্রের যা' আহার,—সেই একমুঠো ভাত-ডাল। কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতেও পারি। কিন্তু দিন দুই খাইনি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি কোরবনা। তোমার স্নেহটুকু আমি ভুলবনা, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারবোনা রাজেন। তাই বলে রাগ কোরোনা যেন।

না।

কি ভাবচো বল ত?

ভাবচি, পরিচয়-পত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হলনা। আমিও দেখ্‌চি সহজে ভুল্‌তে পারবোনা।

সহজে ভুল্‌তেই বা আমি তোমাকে দেব কেন? এই বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু আর দেরি কোরোনা, যাও। যত শীঘ্র পারো ফিরে এসো। ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কম্বল পেতে রাখবো,—দু'চার ঘণ্টা ঘুমোবার পরে যখন সকাল হবে, তখন আমরা বাসায় চলে যাবো,—কেমন?

রাজেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ

হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর শুশ্রূষার ভার নিজের হাতেই নিলেন। ভালই। ফিরতে বোধ করি আমার দেরি হবেনা, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেননা যেন।

কমল বলিল, না। কিন্তু, এই লোকটি যে আমার স্বামী এ খবর তোমাকে দিলে কে? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি? যে-ই দিয়ে থাক্, সে তামাসা করেছে। বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞেসা করলেই খবর পাবে।

রাজেন্দ্র কোন কথা কহিলনা। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ ঠিক যেন এই জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিল। পাশ ফিরিয়া চোখ্ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? শুনিয়া কমল চমকিত হইল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক। অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্নভাব থাকে তাহার অধিক নয়। এতবড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি ঘটিয়াছে কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলনা। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এ লোকটি কে শিবানি? তোমাকে সঙ্গে করে ইনিই এনেছেন?

হাঁ। আমাকেও এনেছেন, এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েছেন, তিনি।

নাম?

রাজেন্দ্র।

তোমরা দু'জনে কি এখন এক বাড়ীতে থাকো?

সেই চেষ্টাই তো করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হু। ওকে এখানে এনেছো কেন ? আমাকে দেখাতে ?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিলনা। শিবনাথও আর কোন প্রশ্ন করিলনা, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই একথা তুমি কার মুখে শুন্‌লে ? আমি বলেচি এই কি লোকেরা বলে নাকি ?

কমল ইহার জবাব দিল্‌না, কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করোনি সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি তুমি তো করতে ? চলে আসবার সময় এ কথাটা বলে এলেনা কেন ? তোমাকে আট্‌কাতে পারি, কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি এই কি তুমি ভেবেছিলে ? এ যে আমার স্বভাব নয়, সে তো ভালো করেই জান্‌তে ? তবে, কেন করোনি তা ?'

শিবনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, কাজের ঝঞ্ঝাটে, ব্যবসার খাতিরে দিনকতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয় ? আমি তো ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্‌, থাক্‌, ও আমি জান্‌তে চাইনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনার নিজেই লজ্জা পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি সত্যিই অসুখ করেছিল ?

সত্যি না তো কি ?

সত্যিই যদি এই, আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়ীতে গেলে কিসের জন্যে ? তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের এক-শেষ করেছে। আমি দুঃখ

পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাস্‌বে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ আমি সইতে পারলাম, নইলে পারতাম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া কহিল ; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া কহিল, জানো তুমি, আমার সব সইলো, কিন্তু তোমাকে বাড়ী থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সইল না। তাই এসেছিলাম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসিনি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ শিবানি!

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকোনা, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুন্‌লে আমার ঘৃণা বোধ হয় তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটিই সবচেয়ে ভালোবাস্‌তে! এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতেও তাহার কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ করে রইলে, উত্তর দিলে না যে বড়?

কমল তেম্‌নিই নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

কি ভাব্‌চো বলতো শিবানি?

কি ভাব্‌চি জানো? ভাব্‌চি, মানুষ কতবড় পাষণ্ড হলে তবে একথা মনে কোরে দিতে পারে।

শিবনাথের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানী। একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জান্‌তে পারবে, সেদিন

তোমার পরিতাপের সীমা থাক্‌বেনা। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেছি—

কিন্তু আলাদা বাসা ভাড়া করার কারণ তো আমি একবারও জিজ্ঞেসা করিনি? আমি শুধু এইটুকুই জান্‌তে চেয়েছিলাম, এ কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আসোনি কেন? তোমাকে একদিনের জন্যেও আমি ধরে রাখতামনা।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয়নি শিবানি!

কেন?

শিবনাথ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, একে টাকার টানাটানি, তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হতে লাগ্‌লো, পাথর কিন্‌তে, চালান দিতে ষ্টেসনের কাছে একটা কিছু—

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্যে আর দুঃখ হয়না, হয় আর একজনের জন্যে। কিন্তু আজ তোমার জন্যেও দুঃখ হচ্চে শিবনাথবাবু।

অনেকদিনের পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, ভ্যাখো, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন ক'রে সংসারে বাণিজ্য করা যায়না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবেনা, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা' হবার তাতো হয়ে গেছে, সে আর ফিরবেনা, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা কোরো, হয়ত, সুখী হ'তেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলোনা। তোমার ভাল হোক্, তুমি ভালো থাকো এ আমি আজও সত্যিসত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে

সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এতবড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিলনা।

বাহিরে পা-গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্ব্বার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন্দ্র চাপা গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখচি। রুগী কেমন? ওষুধ টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আর কিছু খাওয়াইনি।

রাজেন্দ্র অঙ্গুলি সঙ্কেতে কহিল, চুপ্। ঘুম ভেঙে যাবে,—সেটা ভালো না।

না। কিন্তু তোমার মুচীরা করলে কি?

তারা লোক ভালো, কথা রেখেচে। আমার যাবার আগেই যম-রাজের মহিষ এসে আত্মা দু'টো নিয়ে গেছে, সকালে ধড়দু'টো তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের হাবালা করে দিতে পারলেই খালাস। আরও গোটা আষ্টেক শুষ্‌চে, কাল একবার দেখিয়ে আন্‌বো। আশা করি প্রচুর জ্ঞানলাভ কর্‌বেন। কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কম্বলের বিছানা কই? ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচ্‌লাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রাজেন শুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটো-ছুটিতে ঘেমে গেছি,—একটা পাখাটাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তাহার শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমি বাতাস কর্‌চি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তিনি ভাল আছেন।

বাঃ—সব দিকেই সুখবর। এই বলিয়া সে চোখ বুজিল।

১৮

ইনফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুইতিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারী রূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিতনা। সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে সুরু করিল। আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিলনা, রোগে শুশ্রূষা করিবে কি, মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিলনা। সহর ও পল্লী সর্ব্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিলনা,—এই সমৃদ্ধ, জনবহুল প্রাচীন নগরীর মূর্ত্তি যেন দিন কয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল। ইস্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানের কবাট অবরুদ্ধ, নদী-তীর শূন্য-প্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শব-বাহিকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে-কোন দিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষ-জনই নয়, গাছ-পালা, বাড়ী ঘর-দ্বারের চেহারা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন সহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়,—যেন আপনিই হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়

বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছে,—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যে মরিয়াছে,—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই,—কখনও কথা হইয়াছে,—কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচীদের পাড়ায় লোক আর বেশি নাই। যত বা মরিয়াছে তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্য রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিয়াছিল। ছেলে বয়সে চা বাগানে সে পীড়িত কুলীদের সেবা করিয়াছিল, সেই ছিল তাহার ভরসা। কিন্তু, দিন দুই তিনেই বুঝিল সে সম্বল এখানে চলেনা। মুচীদের সে কি অবস্থা! ভাষায় বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই, এবং আবর্জ্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্ব্বে কমল জানিতনা। অথচ, এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব এ কল্পনা সে মনে স্থান দিতেও পারিলনা। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও ন্যূন নয়, জগতে কোন-কিছুকেই সে ভয় করেনা, মৃত্যুকেও না। নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু আসিয়া বুঝিল ইহারও সীমা আছে। দিনকয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি, সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বারবার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখিনি।

আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সাম্‌লে দিয়ে গেলেন! কিন্তু আর আবশ্যক নেই,—আপনি দিনকতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুনগে। এদের যা করে গেলেন সে ঋণ এরা জীবনে শুধ্‌তে পারবেনা।

আর, তুমি?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করে দিয়ে আমিও পালাবো। নইলে কি ম'রব বল্‌তে চান?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইলনা, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে সে এ কয়দিন একেবারেই বাসায় আসিতে পারে নাই। রাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে বাসায় আসিতেই হইত। কিন্তু আজ আর সেই ভয়ানক যায়গায় ফিরিতে হইবেনা মনে করিয়া একদিকে যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া রহিল। কমল রাজেন্দ্রর খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক্, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িলনা।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতে হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী-বালকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অসুখের জন্য। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ ছ' দিন রোজ আস্‌চি আপনাকে ধরতে পারিনে। কোথায় ছিলেন?

কমল মুচীদের পল্লীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, সেখানে? সেখানে তো ভয়ানক লোক মরচে শুন্‌তে পাই।

এ মৎলব আপনাকে দিলে কে? যে-ই দিয়ে থাক্ কাজটা ভালো করেননি।

কেন?

কেন কি? সেখানে যাওয়া মানে তো প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ, আমরা তো ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু আগ্রা থেকে চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্যত্র গেছেন। অবশ্য দিন কয়েকের জন্যে —নইলে বাসাটা রেখে যেতেননা,—আচ্ছা, রাজেনের খবর কিছু জানেন? সে কি সহরে আছে না আর কোথাও চলে গেছে? হঠাৎ এমন ডুব মেরেছে যে কোন সন্ধান পাবার যো নেই।

তাঁকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন?

না, প্রয়োজন বল্‌তে সচরাচর লোকে যা' বোঝে তা নেই। তবুও প্রয়োজনই বটে। কারণ, আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি তো একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকেনা। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ী থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেরিয়ে গিয়ে সে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া শুধু অন্যায় কৌতূহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ী নয়, আমাদের আশ্রম। সেখানে স্থান দিতে তাকে পারিনি, কিন্তু তাই বলে সে নালিশ আর একজনের মুখ থেকেও আমার সয়না। বেশ, আমি চল্‌লাম। তাকে পূর্ব্বেও অনেকবার খুঁজে বার করেচি, এবারও বার কর্‌তে পারবো, আপনি ঢেকে রাখ্‌তে পারবেননা।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিয়া কহিল তাঁকে ঢেকে যে রাখ্‌বো হরেনবাবু, রাখ্‌তে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচ্‌বে আপনি মনে করেন?

হরেন নিজেও হাসিল, কিন্তু সে হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেকে আছেন। তাঁরা কি বল্‌বেন জানেন? বল্‌বেন, কমল, মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহু প্রকারের। তার প্রকৃতিও আলাদা, ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, আলোচনার দ্বারা একটা মোকাবিলা করে নেবেন। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচ্চে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্যক্ত করতে আমি আসিনি, কারণ, সংসারে যত লোকে আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন নীতিতে? আমার মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গেই তো আপনাদের মিল নেই।

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না, নেই। কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা করি। আর এই আশ্চর্য্য কথাটাই আমি নিজেকে নিজে বারম্বার জিজ্ঞাসা করি।

কোন উত্তর পাননা?

না। কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাবো। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি, কতক অজিতবাবুর কাছে শুনেচি,—ভাল কথা, জানেন বোধ হয় তিনি এখন আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ সম্বাদ তো আগেই দিয়েছেন।

হরেন বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায়গুলি এমন অকুণ্ঠ ঋজুতায় সুমুখে এসে দাঁড়ালো যে তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে ভয় হয়। এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেচি

আপনার জীবনটা যেন তার প্রতিবাদে মাম্‌লা রুজু করেছে। এর বিচারক কোথায় মিল্‌বে, কবে মিল্‌বে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানিনে, কিন্তু এমন কোরে যে নির্ভয়ে এলো, অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজনই যে অনুভব করলেনা তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে ?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা বড় কাজ নাকি ? দু-কান-কাটার গল্প শোনেননি ? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেননি, কিন্তু, আমি চা-বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপণা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয়না, যেন গলা ধাক্কায় দূর করে তাড়ায়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই। কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু ?

হরেন এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করে নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, সে আলাদা জিনিস।

কমল কহিল, কি ক'রে জান্‌লেন আলাদা ? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাব্‌তো। অথচ, আমি জানি তা' সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার পরেই নির্ভর করে না,—জগতের কাছে তার প্রমাণ কই ?

হরেন্দ্র এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবাই শুনেছেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেছেন। কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত সে বিষয়ে আপনি নির্ব্বাক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে লোকের চোখের সুমুখে সকলকে উপেক্ষা করেই ঘটে চলেচে এই হয়েচে আমার প্রতি আপনার

শ্রদ্ধার আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা আমি এত বেশি পাইনি যে অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেমন অনেক জেনেছেন, তেম্‌নি এটাও জেনে রাখুন যে অক্ষয়বাবুদের অশ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। সে আমার সয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্ব্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। কমলের বাক্য, বিশেষ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত কঠোরতায় সে অন্তরে অপমান বোধ করিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত এবং আচরণের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ, আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয়না এ তো আমি বলিনি হরেনবাবু, আমি বলেচি এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিল, মত এবং নীতির দিক দিয়ে অক্ষয় বাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাঁর বহুস্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রূঢ়তা না থাকলে আপনারা সকলেই এক। অশ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। শুধু, আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াইনে এই সাহসটুকুই আমার আপনাদের সমাদর লাভ করেচে। এর কতটুকু দাম হরেনবাবু? বরঞ্চ, ভেবে দেখলে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে এর জন্যেই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আস্‌ছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, বাহবা যদি দিয়েই থাকি সে কি অসঙ্গত? সাহস জিনিসটা কি সংসারে কিছুই নয়?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ কথা তো বলিনি। আমি বল্‌ছিলাম এ বস্তু সংসারে দুর্লভ, এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু

এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তাকে সাহসের অভাব বলেই দেখ্‌তে লাগে।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝ্‌তে পার্‌লামনা। আপনার অনেক কথাই অনেক সময়ে হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন তাদেরও ডিঙিয়ে গেল। মনে হচ্চে যেন আজ আপনি অত্যন্ত বিমনা। কার জবাব কাকে দিয়ে যাচ্চেন খেয়াল নেই।

কমল কহিল, তাই বটে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া যে কি জিনিস সে হয়ত এতকাল, নিজেও জানতামনা। সেদিন হঠাৎ যেন চমকে গেলাম। হরেনবাবু, আপনি দুঃখ করবেননা, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করলে আর সমস্তই আজ পরিহাস বলে মনে লাগে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রখর দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এবং সমস্ত মুখের পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে কমলের সে মূর্ত্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিলনা যে অনুদ্দিষ্ট আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কমল এই সকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ; এবং এই জন্যই আগাগোড়া সমস্তই তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্ম্মদ নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন,—ভাল কথা, শুনেছেন, শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, হাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা সর্ত্ত ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে যেন আমরা সহজেই ছেড়ে যেতে পারি। না না, চুক্তি-পত্রে লেখাপড়া ক'রে নয়, এম্‌নিই।

হরেন্দ্র কহিল ক্রুট্।

কমল কহিল, সে তো আপনার বন্ধু অক্ষয় বাবু। শিবনাথ গুণী মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিন্তু নিজের খুব বেশি নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার তো আর আপিল কোর্ট মেলেনা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালবাসার অতিরিক্ত আর কোন বাঁধনই আপনি স্বীকার করেননা?

কমল কহিল, একে তো আমাদের ব্যাপারে আর কোন বাঁধন ছিলনা, আর থাকলেই বা তাকে স্বীকার করিয়ে ফল কি? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সব চেয়ে বেশি বাজে। এই বলিয়া এক-মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবচেন সত্যিকার বিবাহ হয়নি বলেই এমন কথা মুখে আন্‌তে পারচি, হলে পারতাম না। হলেও পারতাম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতামনা। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ দেহে সংলগ্ন হয়েই থাকতো, এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাটতো। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এম্‌নিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখ্‌তে চাইতো জগতে সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হোতো। তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কল্পনায় আঁক্‌তে পারে এমন কেউ নেই। এ সম্ভাবনা ভাবাও যায়না।

কমল বলিল, যায়, এবং যাবেও একদিন। তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায়নি। একদিনের একটা

অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারাজীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলেনা। পৃথিবীতে সকল ভুল-চুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলেনা, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, আর তার নিরাকরণের্ প্রয়োজনও তেম্‌নিই অধিক, সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে থাকে। তাকে ভালো বলে মানি কি করে বলুন ?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দ্দশায় হরেন্দ্রর মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল ; বিরুদ্ধ-আলোচনায় সহজে যোগ দিতনা, এবং বিপক্ষদল যখন নানাবিধ স্যাক্ষ্য-প্রমাণের বলে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ্য আচরণ ও তেমনি নির্লজ্জ উক্তিগুলার নজির দেখাইয়া যখন ধিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্ক-যুদ্ধে হারিয়াও প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কমলের জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথায় একটা নিগূঢ় রহস্য আছে একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহিত, দয়া করে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী-সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত থাকলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই, আপনারা নিতেও পারেননা ফেল্‌তেও চান্‌না। আধুনিক কালের কতকগুলো বিলিতি চোখা-চোখা বুলি যেন আপনাদের ভূত-গ্রস্ত করে রেখেচে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা' নয় হে অক্ষয়, পূর্ব্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান দুই তিন ইংরিজি তর্জ্জমার বই পড়লেই জানা যায়। বুলির জৌলস নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের জৌলস? কমলের রূপের? অবিনাশ বাবু, হরেন অবিবাহিত, ছোকরা,—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়েছে এই আশ্চর্য্য! এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলেয়ার আলো অবিনাশবাবু, পচা পাঁকের মধ্যে এর জন্ম। পাঁকের মধ্যেই একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা' স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ সব ভোলাতে পারেনা,—সে আসল নকল চেনে।

আশুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয় বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক। আমরা সবাই মিলে পাঁকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাবো, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করবনা।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করিনে হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতেও চাইনে, বিশ্ব-বখাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারী-গিরি করেও বেড়াইনে। আশ্রমে পায়ের ধূলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করগে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্যে ভাবতে হবেনা। দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে। এবং হয়ত, চিরকালের মত তোমার একটা কীর্ত্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেন, এবং নির্ম্মল চাপা-হাসিতে আশুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। হরেন্দ্রর আশ্রমের প্রতি কাহারও আস্থা ছিলনা, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি-তর্ক চলেনা তার অন্য বিধি আছে। কিন্তু, সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনা বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান। ইতর-ভদ্র মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায়না। এই বলিয়া সে অপর দু'জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্রয় দেন কি বলে ? এতবড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিতও যেন ভারি একটা পরিহাসের ব্যাপার !

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিতেন, না না, প্রশ্রয় দেব কেন, কিন্তু জানোই তো অক্ষয়ের কাণ্ড-জ্ঞান নেই।

হরেন কহিত, কাণ্ড-জ্ঞান ওঁর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা তো দেখ্‌তে পাওয়া যায়না সেজদা, নইলে হাসি-তামাসা কম লোকের মুখেই শোভা পেতো। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েছেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাও কমল সত্যের মতই মেনে নিয়েছিলেন, সংসারের দেনা-পাওনায় লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাঁকে লোক-চক্ষে ছোট করতে চান্‌নি। কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন ? শিবনাথ তাঁর ভালোবাসার ধন, কিন্তু আপনাদের সে কে ? ক্ষমার অপব্যবহার আপনাদের সইলনা। এই তো আপনাদের ঘৃণার মূলধন ? একে ভাঙিয়ে যতকাল চালানো যায় চালান, আমি বিদায় নিলাম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রত্যয় সুদৃঢ় ছিল যে কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ কথা ব্যক্ত হইবে যে শৈব-বিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায়, সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু আজ তাহার বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র

অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নর-নারী নির্ব্বিশেষে সকলের পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল,—এই জন্যই দেশের ও দশের কল্যাণে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে তাহার সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া এ সকলের মূলেই ছিল ঐ একটি মাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে আজ তাহারই মুখের পরে, তাহারই প্রশ্নের উত্তরে এমন ভয়ানক জবাব দিবে তাহা ভাবে নাই। ভারতের ধর্ম্ম, নীতি, আচার, ইহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্যতার প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় ভক্তি ছিল। অথচ, সুদীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্ব্বলতায় ইহার ব্যতিক্রমগুলাকেও সে অস্বীকার করিতনা, কিন্তু এমন স্পর্দ্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলসূত্রকেই অস্বীকার করায় তাহার বেদনার সীমা রহিলনা। এবং কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা,—তাহার শিরার রক্তে ব্যভিচার প্রবহমান, এ কথা স্মরণ করিয়া তাহার বিতৃষ্ণায় মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন তা'হলে যাই—

কমল হরেন্দ্রর মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিলনা, শুধু একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যে জন্যে এসেছিলেন তার তো কিছু করলেননা।

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জানতে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে তার থাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি খুব বিশ্রী আলোচনা হয়? সত্যি বলবেন?

হরেন্দ্র বলিল, যদিও হয় আমি কখনো যোগ দিইনে। সে পুলিশের জিম্মায় না থাক্‌লেই আমার যথেষ্ট। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে ?

কিন্তু আপনি তো সে সব কিছু মানেননা !

অনেকটা তাই বটে। অর্থাৎ, মানৃতেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার। কিন্তু বন্ধুকেই শুধু জানলে হয়না হরেনবাবু, আর একজনকেও জানা দরকার।

বাহুল্য মনে করি। বহুদিনের বহু কাজে-কর্ম্মে যাকে নিঃসংশয়ে চিনেছি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিরুচি সে থাক, আমি নিশ্চিন্ত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয় হরেনবাবু। তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত অন্য দিনের উত্তরের সঙ্গে মেলেনা। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ করে রাখ্‌তে নেই, ঠক্‌তে হয়।

কথাগুলা যে শুধু তত্ত্ব হিসাবেই কমল বলে নাই, কি-একটা ইঙ্গিত করিয়াছে হরেন তাহা অনুমান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইলনা। রাজেন্দ্রর প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেছি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কারা ?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক্‌, তার আমি একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পীড়িত ?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্ব্বেই মনোরমা চলে গেছেন! আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী, তিনি এসে নিয়ে গেছেন।

শুনিয়া কমল চুপ করিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবেনা, এই জোরে সে তার মৃত-বন্ধুর পত্নীকে বঞ্চিত করেছে, নিজের রুগ্না-স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্ব্বনাশ করেছে। আইন সে খুব ভালই জানে, শুধু জানেনা যে দুনিয়ায় এইটেই সব নয়, এর বাইরেও কিছু বিদ্যমান আছে।

কমল সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু শাস্তিটা তাঁর কি স্থির করেছেন? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন? এই বলিয়া সে একটু হাসিল। প্রস্তাবটা হরেন্দ্রর কাছেও হঠাৎ এমনি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও না হাসিয়া পারিলনা। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল মত নির্ব্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে সেও তো হতে পারেনা? আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও তো মানে নেই?

কমল বলিল, তা'হলে হবে কি এনে? আমাকে পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন, না, ঘাড়ে ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন? প্রথমতঃ, টাকা আমি নেবোনা, দ্বিতীয়তঃ, সে বস্তু তাঁর নেই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।

তবে কি এতবড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবেনা? আর কিছু না হোক্ বাজারে যে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায় এ খবরটা তাঁকে তো জানানো দরকার?

কমল ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, না, সে করবেননা। ওতে আমার এত-বড় অপমান, যে সে আমি সইতে পারবোনা। কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জ্বলে মরছিলাম যে এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন

ছিল ? স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলে কি বাধা দিতাম ? তখন, এই লুকো-চুরির অসম্মানটাই যেন পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে দেখা দিত। তারপরে, হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এলো। সেখানে কত মরণই চোখে দেখ্‌লাম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর একপথ দিয়ে নেমে এসেছে। এখন ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিলনা সেই তো আমার সম্মান। লুকোচুরি, ছলনা, তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন মর্য্যাদা গিয়ে গেছে। পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়ে-ছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ করে যেতে হয়েছে। আর আমার নালিশ নেই, আমার সমস্ত আদায় হয়েছে। আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বল্‌বেন, আমার ভালো করবার বাসনায় আর আমার যেন ক্ষতি না করেন।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিলনা, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল, সংসারের সব জিনিস সকলের বোঝবার নয়, হরেনবাবু! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেননা। কিন্তু আমার কথা আর না। দুনিয়ায় কেবল শিবনাথ আর কমল আছে তাই নয়। আরও পাঁচ জন বাস করে, তাদেরও সুখ দুঃখ আছে। এই বলিয়া সে নির্ম্মল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন বাষ্প এক মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছে খবর দিন।

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন ?

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম, ভাল হয়েছেন ?

হাঁ। সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভালো। তাঁর কে এক জাঠ্‌তুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্য লাভের জন্য ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধকরি দু' একমাস দেরি হবে।

আর নীলিমা ? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন ?

না, তিনি এখানেই আছেন।

কমল আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে ? একলা ঐ খালি বাসায় ?

হরেন্দ্র প্রথমে একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্যাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষে করেছেন, আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্যে ঐখানে তাঁকে রেখে যাবার সুযোগ হয়েছে।

এই খবরটা এম্‌নি খাপ্‌ছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, শুধু বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রর দ্বিধা কাটিয়া গেল, এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ, এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল, বিদেশে নিজের বাসায় যা' ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্থা বিধবা-শালী নিয়ে তো জাট্‌তুতো ভায়ের বাড়ী ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও তো আত্মীয়, তোমার বাসাতে কি,—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ, আমি তোমারই আত্মীয়, তাও অত্যন্ত দূরের,—কিন্তু তাঁর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম; ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্যত্র গেছে, আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার ভাবনার অবধি রইল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরছে চারিদিকে, দাদার বাড়ী থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন তাগিদ আসচে—সেজদার সে কি বিপদ!

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ী তো আছে শুনেচি ?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে! একটা বড় রকম শ্বশুরবাড়ীও

আছে শুনেচি, কিন্তু সে সকলের কোন উল্লেখই হলনা। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানিনে, কিন্তু, পীড়িত আশুবাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি'।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপণার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্লেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনই মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সৎ চরিত্রের মেয়ে। সেজদার দারুণ দুর্দ্দিনে ছেড়ে যেতে পারেননি, এই থাকার জন্যেই হয়ত ও-দিকের সকল পথ বন্ধ হয়েছে। অথচ, এদিকেরও দেখলাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি, বিনা দোষেও এ দেশের মেয়েরা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেম্‌নি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এই সব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাস্‌চেন, না ?

কমল শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখতে। ওঁরা দু'জনেই আপনার খবর জানতে চাইছিলেন। বৌদির তো আগ্রহের সীমা নেই, —একদিন যাবেন ওখানে ?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুননা হরেনবাবু, তাঁদের দেখে আসি।

আজই যাবেন ? চলুন। আমি একটা গাড়ী নিয়ে আসি। অবশ্য যদি পাই। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়ীতে দু'জনে

একসঙ্গে গেলে আশ্রমের বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন। হেঁটেই যাই চলুন।

হরেন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে?

মানে নেই,—এম্‌নি। চলুন যাই।

১৯

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্ণ-প্রায়। শয্যার উপরে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্বামী সেই দিনের পাইয়োনিয়ার কাগজখানা দেখিতেছিলেন। দিন কয়েক হইতে আর জ্বর ছিলনা, অন্যান্য উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। ইঁহারা ঘরে প্রবেশ করিতে কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুসি হইলেন সে তাঁর মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় ছিল কমল হয়ত আর আসিবেনা। তাই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এস, আমার কাছে এসে বসো। এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন, বলিলেন, কেমন আছো বল ত কমল?

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, ভালই তো আছি।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদ। নইলে যে দুর্দ্দিন পড়েছে এতে কেউ যে ভালো আছে তা' ভাবতেই পারা যায়না। এতদিন কোথায় ছিলে বল ত? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা

করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয় বাসায় তালাবন্ধ, তাঁর সন্ধান পাইনে। নীলিমা সন্দেহ করছিলেন হয়ত বা তুমি দিন কয়েকের তরে কোথাও চলে গেছো।

হরেন্দ্রই ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না,—এই আগ্রাতেই মুচীদের পাড়ায় সেবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখা পেয়ে ধরে এনেচি।

আশুবাবু ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, মুচীদের পাড়ায়? কিন্তু কাগজে লিখচে যে পাড়াটা উজোড় হয়ে গেল। এতদিন তাদের মধ্যেই ছিলে? একা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন্দ্র ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কিছু বলিলনা। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করিয়াছিলাম। যেথায় দৈবের এতবড় নিগ্রহ সুরু হইয়াছে সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পা নড়িবেনা এ আমি জানিবনা তো জানিবে কে?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু'তিন দিনের বেশি দেখিনি, কিছুই জানিনে, তবু মনে হয় কি যেন এক সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরি। তাকে নিয়ে এলেনা কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞাসা করতাম। খবরের কাগজ থেকে তো সব বোঝা যায়না?

কমল বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনও দেরি আছে।

কেন?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয়নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা না করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেননা এই তাঁর পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা'হলে

তোমারই বা কি ক'রে ছুটি হ'ল ? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে ? নিষেধ করতে পারিনে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা কমল ?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্যে নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই ? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে দিয়েই এসেচি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন্দ্র। এক-এক জনের দেহ-যন্ত্রে প্রকৃতি এম্‌নি অফুরন্ত দম্ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে সে না হয় কখনো শেষ, না যায় কখনো বিগড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হোতো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচবে কি ক'রে ? ক'দিনই বা বাঁচ্‌বে ? সেখান থেকে একলা যখন চলে এলাম কিছুতেই যেন আর ভাবনা ঘোচেনা, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন কোরে যেন নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেচি, প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে দুঃখীর কুটীরে বন্যার মত যখন মৃত্যু ঢোকে তখন তার ধ্বংস লীলার সাক্ষী থাক্‌বে কে ? আজই হরেন বাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথবাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম—

আশুবাবু এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে কমল ? শুনেচি তাঁকে সেবা করার জন্যেই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে,—

কমল কহিল, লজ্জা সে জন্যে নয় আশুবাবু। যখন দেখতে পেলাম তাঁর কোন অসুখই নেই, সমস্তই ভান্, কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু তাও সফল হতে পায়নি, আপনি বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছেন, তখন কি যে আমার হোলো সে আপনাকে বোঝাতে পারবনা। যে সঙ্গে ছিল তাকেও এ কথা জানাতে

পারিনি,—শুধু কোনমতে রাত্রির অন্ধকারে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। পথের মধ্যে বার বার কোরে কেবল এই একটা কথাই মনে হতে লাগলো, এই অতি ক্ষুদ্র কাঙাল লোকটাকে রাগ কোরে শাস্তি দিতে যাওয়ায় না আছে ধর্ম্ম, না আছে সম্মান।

আশুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল, শিবনাথের অসুখটা কি শুধু ছলনা? সত্যি নয়?

কিন্তু জবাব দিবার পূর্ব্বেই দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপরে রাখিয়া দিয়া প্রতি-নমস্কার করিল, এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ যে দুর্ব্বলতা কমল! এ জিনিস তো তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলেনা। আমি বরাবর ভাবতাম যা' অন্যায়, যা মিথ্যাচার তাকে তুমি মাপ করোনা।

হরেন্দ্র কহিল, ওঁর স্বভাবের খবর জানিনে, কিন্তু মুচীদের পাড়ায় মরণ দেখে ওঁর ধারণা বদ্‌লেছে, এ সংবাদ ওঁর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক্, এখন কারও বিরুদ্ধেই নালিশ করতে উনি নারাজ।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি?

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সেই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশি একটা

কথাও কহিতনা। কহিল, এ প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে। যা' নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আজ আমার লজ্জা। বোধহয়, যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশি পারলেন না বলে রাগা-রাগি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনাদের কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানাটানি করবেননা। এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দ্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখুন তো খেতে পারবেন, না আবার গরম করে আন্‌তে বোল্‌ব ?

আশুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, পড়ে থাক্‌লে চল্‌বেনা,—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙ্‌তে আমি দেবোনা।

আশুবাবু অবসন্নের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যবস্থাপক নিজের দেহ। এ কথা তোমারও ভোলা উচিত নয়।

আমি ভুলিনে, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়েসের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, তাই বই কি। দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখানো আপনার অনেক—অনেক, বাকি। আচ্ছা, কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও-ঘরে গিয়ে গল্প করিগে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন ? যাই ?

আশুবাবুর এ ইচ্ছা বোধহয় ছিলনা, তথাপি সম্মতি দিতে

হইল, কহিলেন, কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেওনা, ডাকলে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসিগে। এই বলিয়া সে সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গীটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার আজিকার এই গুটি কয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিলনা, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চক্ষে যাহা এড়াইল ধরা পড়িল রমণীর দৃষ্টিতে। নীলিমা শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছে, এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতায় আশ্চর্য্যের কিছু নাই সাধারণের কাছে এ কথা বলা চলে, কিন্তু সেই সাধারণের একজন কমল নয়। নীলিমার এই একান্ত-সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিস্ময় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিস্ময় বহু দিক দিয়া। সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাঁই দিতে পারিলনা! নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে। আশুবাবুর যৌবন ও রূপের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে, কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে যে। সে দিক আশুবাবুর নিজের। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিত্ততলে পত্নীপ্রেমের যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় নিত্য পূজিত হইতেছে, কোন দিনের কোন প্রলোভনই তাহার গায়ে দাগ ফেলিতে পারে নাই। ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশুবাবুর বয়স বেশি ছিলনা, —তখনও যৌবন অতিক্রম করে নাই, কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই

লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মূলিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের দল উদ্যম-আয়োজনের ক্রটি রাখে নাই, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ার ভাঙিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এ সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী। এ ঘরে আসিয়া অন্যমনস্কের মত নীরবে বসিয়া সে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাসও এই মানুষটির চোখে পড়িয়াছে কি না। যদি পড়িয়াই থাকে, দাম্পত্যের যে সুকঠোর নীতি অত্যাজ্য ধর্ম্মের ন্যায় একাগ্র সতর্কতায় তিনি আজীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন আসক্তির এই নব-জাগ্রত চেতনায় সে ধর্ম্ম লেশমাত্রও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে কি না।

চাকর চা-রুটি ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেই সমস্ত আগাইয়া দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর ন্যায় সরলতার ছোট খাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার চোখে পড়িয়াছে,—এমনি অনেক কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র স্ত্রীলোকের লোভের বস্তু। এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাক্‌শক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিলনা যে যে-বৌদিদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে সে-ই এই কি না! সেই পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য, সেই কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা, সেই সুপরিচিত সমস্ত কিছুই এই কয়দিনে বিসর্জ্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতায় বালিকার ন্যায় যে প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই এই কি না!

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, চায়ের বাটিতে

দু'একবার চুমুক দেওয়া ছাড়া কমল কিছুই খায় নাই। ক্ষুণ্ণস্বরে সেই অনুযোগ করিতেই কমল সহাস্যে কহিল, এর মধ্যেই আমাকে ভু'লে গেলেন ?

ভু'লে গেলাম ? তার মানে ?

তার মানে এই যে আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি তো কিছু খাইনে।

এবং, সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই,—এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেমনিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ, এ একগুঁয়েমির পরিবর্ত্তন নেই। কিন্তু অত দর্প আমি করিনে, হরেন বাবু, তবে সাধারণতঃ, এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে' তা মানি।

পথে বাহির হইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেছেন বলুন ত ?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই, আপনার বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌বনা, কিন্তু যেখান থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্যায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ, অতি-ঘনিষ্ঠের ন্যায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বোধ আপনার কত সূক্ষ্ম দাঁড়িয়েছে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভালো হইলনা, এমন করিয়া পথ চলায় যে বিপদ আছে, এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু না বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিলনা। ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকিল,

এবং এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই তাহারা বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের ? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া তো কেউ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়ীতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ, কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল. গিয়ে খাবেন কি ? আশ্রমে পাচক রাখবার তো ব্যবস্থা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ, আপনি আর অজিতবাবু ?

হাঁ। কিন্তু হাস্‌চেন যে ? নিতান্ত মন্দ রাঁধিনে আমরা।

তা' জানি। এবং পরক্ষণে সত্যই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিত বাবু নেই, সুতরাং ফিরে গিয়ে আপনাকে নিজেই রেঁধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন তো আমার ভারি ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে ?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অন্যায়। আপনি কি সত্যই মনে করেন আমি ঘৃণায় অস্বীকার করতে পারি ? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ক্রটি করিনি যে যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন। আমার আপত্তি শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাইনে।

কমল বলিল, আমি দুঃখ বিশেষ পাবোনা তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কহিল, আমার আয়োজন সামান্য,' কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা' দেখে এসেচি তাকেও প্রচুর বলা চলেনা।' সুতরাং,

এখানে খাবার কষ্ট যদি বা হয়, অন্যের মত অসহ্য হবেনা এইটুকুই আমার ভরসা।

হরেন্দ্র খুসি হইয়া উত্তর দিল, আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা' দেখে এসেছেন তাই বটে। সত্যিই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অস্বচ্ছল নয়,—কষ্ট পাওয়ার তো কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাক্ প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ আপনিও বোঝেন বলে নিজের সম্বন্ধেও এম্‌নি ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। অথচ, বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এর হেতু দিতে পারেন?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি, ভিতরের লোককে দিতে পারবো। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র, নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে তাতে এর বেশি চলেনা। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেননি কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজমন্ত্রটুকু দান করে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জন্যই নয়,—সমাজ, সম্মান সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই তাহার তাকাইবার কিছু নাই। কিন্তু, এ সত্যও সে স্মরণ না করিয়া পারিলনা যে এতবড় নিঃসহায়তাও এই রমণীকে লেশমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহেনা—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এতবড় দুর্গতির মূল তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হয় নাই। এবং বোধকরি সাহস ও সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচিনে, কমল, কিন্তু এ ছাড়া আর

কিছু ভাব্‌তেও পারিনে যে আমাদের মত আপনার দারিদ্র্যও প্রকৃত নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই, কারণ, আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্য্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ,—দুঃখের অভিনয় বলে'। সকল অভিনয়ের মধ্যেই খানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করায় বাধা নেই। এই বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারি একটা বেসুরা বাজিল। খোঁচা খাইয়া হরেন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জবাব দিল,—কিন্তু এটা তো মানেন যে প্রাচুর্য্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে?

কমল ষ্টোভের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল, এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্যে ওদিকেও খানিকটা সত্য থাকা চাই হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্ত[illegible]ক অভাব নেই, তবু ছদ্ম-অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েছেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি দৈন্য-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায়না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাক্‌লেই এ বস্তু দেখ্‌তে পাবেন,—দৃষ্টান্তের জন্যে ভারত পর্য্যটন করে বেড়াতে হবেনা। কিন্তু তর্ক থাক্‌, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুস্কিল এই যে ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে ম্লেচ্ছ-রক্তের

ঢেউ বয়ে যাচ্ছে,—হিন্দুর আদর্শ ও-চোখে তামাসা বলেই ঠেক্‌বে। দিন্, কি রান্না হয়েছে খেতে দিন্।

এই যে দিই, বলিয়া কমল আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিলনা।

হরেন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা ধরুন কেউ যদি যথার্থ-ই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্যের মাঝেই নেমে আসে তখন তো অভিনয় বলে তাকে তামাসা করা চল্‌বেনা? তখন তো—

কমল বাধা দিয়া কহিল, না, তখন আর তামাসা নয়,—তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপ্‌ড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেনবাবু, কিছুকাল পূর্ব্বে আমিও কতকটা আপনার মতো করেই ভেবেচি, উপবাসের নেশার মতো আমাকেও তা' মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেচে, কিন্তু এখন সে সংশয় আমার ঘুচেচে। দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতেই আসুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই। ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্ব্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ,—অভাব যে মানুষকে কত হীন, কত ছোট করে আনে সে আমি দেখে এসেচি মহামারীর মধ্যে,—মুচীদের পাড়ায় গিয়ে। আরও একজন দেখেচেন তিনি আপনার বন্ধু রাজেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তো কিছু পাওয়া যাবেনা,—আসামের গভীর অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানেনা। আমি প্রায় ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় করে। সেই যে কথায় আছে মণি ফেলে অঞ্চলে কাচ-খণ্ড গেরো দেওয়া,—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেননা? আশ্চর্য্য!

হরেন্দ্র উত্তর দিলনা, চুপ করিয়া রহিল।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রর বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল; নারীত্বের শান্ত মাধুর্য্য ও শুচিতার আদর্শে ইহাঁর চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না, মনে মনে বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে বিভেদ ইঁহাদের মধ্যে যত বেশিই থাক, সেবা ও মমতায় ইঁহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না, কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্ব্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত, সেই গূঢ় অন্তর্দ্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রর ক্ষুধা ছিলনা, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কি একটা তরকারি ভালো লাগিয়াছে বলিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল, কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এম্‌নিকরেই জব্দ করেচি, কমল।

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জব্দ হতেন?

নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার করতেননা।

কমল হাসিয়া বলিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষ মানুষেরই এম্‌নি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেচি যে!

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ চোখে-দেখার অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে-বেলা বৌদিদির

খাওয়া হোতনা,—উপবাস করে কাটাতেন, তবু হার মানতে চাইতেননা।

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিল, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মোটা বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাক্,—এতেই লাভ বেশি। আপনাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভিমানে উপোস ক'রে মরতে আমরা নারাজ।

কমল এ কথারও জবাব দিলনা। হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটাকেও মধ্যে মধ্যে যাচাই করে দেখ্‌বো।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেন না, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটায় অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল, দেখুন, এ কথার জবাব দিতে বাধে। কেন জানেন? মনে হয় যেন রাজরাণী হওয়াই যা'কে সাজে, কাঙালপণা তাকে' মানায়না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত বড়লোকের মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে এবার উঠুন। ও-ঘরে গিয়ে সারারাত গল্প শুন্‌বো, এ ঘরের কাজটা ততক্ষণ সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বসিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বোনা, তা' যত রাত্রিই হোক। বলুন।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল, বৌ-দিদির সমস্ত কথা তো আমি জানিনে। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আগ্রায়, অবিনাশ-

দাদার বাসায়। বস্তুতঃ, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানিনে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে, আমিও ততটুকুই জানি। কেবল একটা কথা বোধকরি সংসারে সকলের চেয়ে বেশি জানি, সে তাঁর অকলঙ্ক শুভ্রতা।

স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ওঁর উনিশ-কুড়ি,—তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই পেয়েছিলেন। সে মোছেনি, মোছবার নয়,—জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সে স্মৃতি অক্ষয় হ'য়ে থাক্‌বে। পুরুষ মহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে,—তাঁর নিষ্ঠাও অনন্যসাধারণ—আমি অস্বীকার করিনে,

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'ল এখন তো আর বাসায় যাওয়া চলেনা,—এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই?

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানেই শোব। আর তো ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল। কমল হাসিয়া বলিল, আপনি তো ব্রহ্মচারী। আপনারও ভয়ের কারণ আছে না কি?

হরেন্দ্র স্তব্ধ নির্নিমেষ চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতেও পারিলনা। স্ত্রীলোক হইয়া একথা এ উচ্চারণ করিল কি করিয়া?

তাঁহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকেও ধাক্কা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েছে হরেন বাবু, আপনি বাসায় যান। তাইতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলেনি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ী। নির্জ্জন গৃহে অনাত্মীয় নর-নারীর একটি মাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন,—পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ এর বেশি খবর আপনার কাছে

আজও পৌঁছায়নি। ব্রহ্মচারী হলেও না। যান্, আর দেরি করবেননা আশ্রমে যান। এই বলিয়া সে নিজেই বাহিরের অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মূঢ়ের মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

২০

প্রায় মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। আগ্রায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী মূর্ত্তিটা শান্ত হইয়াছে; স্থানে স্থানে দুই একটা নূতন আক্রমণের কথা না শুনা যায় তাহা নয়, তবে, মারাত্মক নয়। কমল ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সেলাই করিতেছিল, হরেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা পুঁটুলি, নিকটে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, যে রকম খাট্‌চেন তা'তে তাগাদা করতে লজ্জা হয়। কিন্তু লোকগুলো এম্‌নি বেহায়া যে দেখা হলেই জিজ্ঞেসা করবে, হ'ল? আমি কিন্তু স্পষ্টই জবাব দিই যে ঢের দেরি। জরুরি থাকে তো না হয় বলুন কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু মজা এই যে, আপনার হাতের তৈরি জিনিস যে একবার ব্যবহার করেচে সে আর কোথাও যেতে চায়না। এই দেখুননা লালাদের বাড়ী থেকে আবার একখান গরদ আর নমুনার জামাটা দিয়ে গেল,—

কমল সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, নিলেন কেন?

নিই সাধে? বোল্‌লাম ছ'মাসের আগে হবেনা,—তাতেই রাজি।

বল্‌লে ছ'মাসের পরে তো হবে, তাতেই চল্‌বে। এই দেখুননা মজুরির টাকা পর্য্যন্ত হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা নোটের মধ্যে মোড়া কয়েকটা টাকা ঠক্‌ করিয়া কমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

কমল কহিল, অর্ডার এত বেশি আস্‌তে থাক্‌লে দেখ্‌চি আমাকে লোক রাখ্‌তে হবে। এই বলিয়া সে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিয়া পুরাণো পাঞ্জাবি জামাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, এ কোন বড় দোকানের বড় মিস্ত্রির তৈরি,—আমাকে দিয়ে এরকম হবেনা। দামী কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনার চেয়ে বড কারিগর এখানে কেউ আছে নাকি?

এখানে না থাকে কলকাতায় আছে। সেখানেই পাঠিয়ে দিতে বল্‌বেন।

না না, সে হবে না। আপনি যা' পারেন তাই করে দেবেন, তাতেই হবে।

হবে না হরেনবাবু, হলে দিতাম। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, অজিতবাবু বড় লোক, সৌখিন মানুষ; যা-তা তৈরি করে দিলে তিনি পরতে পারবেন কেন? কাপড়টা মিথ্যে নষ্ট ক'রে লাভ নেই, আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হরেন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল. কি ক'রে জানলেন এটা অজিতবাবুর?

কমল কহিল, আমি হাত গুনতে পারি। গরদের কাপড়, অগ্রিম মূল্য, অথচ ছ'মাস বিলম্ব হলেও চলে,—হিন্দুস্থানী লালাজিরা অত নির্ব্বোধ নয় হরেনবাবু। তাঁকে জানাবেন তাঁর জামা তৈরি করার

যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুধু গরীবের শস্তা গায়ের কাপড়ই সেলাই করতে পারি। এ পারিনে।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল। শেষে কহিল, এ তার ভারি ইচ্ছে। কিন্তু পাছে আপনি জান্‌তে পারেন, পাছে আপনার মনে হয় আমরা কোনমতে আপনাকে কিছু দেবার চেষ্টা করচি, সেই ভয়ে অনেকদিন আমি স্বীকার করিনি। তাকে বলেছিলাম অল্প মূল্যের সাধারণ একটা কোন কাপড় কিনে দিতে। কিন্তু সে রাজি হোলনা। বল্‌লে, এ তো আমার নিত্য-ব্যবহারের মেরজাই নয়, এ কমলের হাতের তৈরি জামা, এ শুধু বিশেষ উপলক্ষে পর্ব্ব-দিনে পরবার। এ আমার তোলা থাক্‌বে। এ জগতে তার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা বোধকরি আপনাকে কেউ করেনা।

কমল বলিল, কিছুকাল পূর্ব্বে ঠিক এর উল্টো কথাই তাঁর মুখ থেকে বোধকরি অনেকেই শুনেছিল। নয় কি? একটু চেষ্টা করলে আপনারও হয়ত স্মরণ হবে। মনে করে দেখুন ত?

এই সেদিনের কথা, হরেন্দ্রর সমস্তই মনে ছিল; একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, মিথ্যে নয়; কিন্তু এ ধারণা তো একদিন অনেকেরই ছিল। বোধহয় ছিলনা শুধু আশুবাবুর, কিন্তু তাঁকেও একদিন বিচলিত হতে দেখেচি। আমার নিজের কথাটাই ধরুননা,—আজ তো আর প্রমাণ দিতে হবেনা, কিন্তু সেদিনের কষ্ঠি-পাথরে ঘষে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাচাই করতে চাইলে আমিই বা দাঁড়াই কোথায়?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, রাজেনের খোঁজ পেলেন?

হরেন বুঝিল এই সকল হৃদয়-সম্পর্কিত আলোচনা আর একদিনের মত আজও স্থগিত রহিল। বলিল, না, এখনো পাইনি। ভরসা আছে এসে উপস্থিত হলেই পাবো।

কমল বলিল, সে আমি জানতে চাইনি, পুলিশের জিম্মায় গিয়ে পড়েছে কিনা এই খোঁজটাই আপনাকে নিতে বলেছিলাম।

হরেন কহিল, নিয়েছি। আপাততঃ তাদের আশ্রয়ে নেই।

শুনিয়া কমল নিশ্চিন্ত হইতে পারিলনা বটে, কিন্তু স্বস্তি বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন মুচীদের পাড়ায় চেষ্টা করে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা যায়না? হরেনবাবু, তাঁর প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জানি, এ সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু ক'দিন থেকে এ ছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারিনে আমার এমনি দশা হয়েছে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুল চক্ষে চাহিল যে হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া পূর্ব্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে এক-একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসে, কৌতূহলের সীমা নাই,—মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িতেও চায়, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লয়। কিছুতেই স্থির করিতে পারেনা এ জিজ্ঞাসার ফল কি হইবে। এই ভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পরে কমল নিজেই কথা কহিল। সেলাইটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা সমাপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক্, আজ আর না। এই বলিয়া মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ কি, দাঁড়িয়ে আছেন যে? একটা চৌকি টেনে নিয়ে বস্‌তেও পারেননি?

বস্‌তে আপনি তো বলেননি।

বেশ যা হোক্। বলিনি বলে বস্‌বেননা?

না; না-বল্‌লে বসা উচিতও নয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাক্‌তেও তো বলিনি,—দাঁড়িয়েই বা আছেন কেন?

এ যদি বলেন তো আমার না দাঁড়ানোই উচিত ছিল। ত্রুটি স্বীকার করচি।

শুনিয়া কমল হাসিল। বলিল, তাহলে আমিও দোষ স্বীকার করচি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা আমার অপরাধ। এখন বসুন।

হরেন্দ্র চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলে কমল হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। একবার কি একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে কহিল, দেখুন হরেনবাবু, আসলে এর মধ্যে যে কিছুই নেই এ আমিও জানি, আপনিও জানেন। তবু লাগে। এই যে বস্‌তে বল্‌তে ভুলেচি, যে আদরটুকু অতিথিকে করা উচিত ছিল, করিনি,—হাজার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও সে ত্রুটি আপনার চোখে পড়েচে। না না, রাগ করেছেন বলিনি,—তবুও কেমন যেন মনের মধ্যে একটু লাগে। এ সংস্কার মানুষের গিয়েও যেতে চায়না,—কোথায় একটুখানি থেকেই যায়। না?

হরেন্দ্র ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলনা, একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়। অথচ, এইটিই লোকে সবচেয়ে বেশি ভোলে। না?

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এসব আমাকে বল্‌চেন, না আপনাকে আপনি বল্‌চেন? যদি আমার জন্যে হয় তো আর একটু খোলসা করে বলুন। এ হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুক্‌চেনা।

কমল হাসিয়া বলিল, হেঁয়ালিই বটে। সহজ সরল রাস্তা, মনেই হয়না যে বিপত্তি চোখ রাঙিয়ে আছে। চলতে হোঁচট লেগে আঙুল দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ে, তখনি

কেবল চৈতন্য জাগে আর একটুখানি চোখ মেলে চলা উচিত ছিল। না?

হরেন্দ্র কহিল, পথের সম্বন্ধে হাঁ। অন্ততঃ, আগ্রার রাস্তায় একটু হুঁস্ করে চলা ভালো,—ও দুর্ঘটনা আশ্রমের ছেলেদের প্রায়ই ঘটে। কিন্তু হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেল, মর্ম্মার্থ উপলব্ধি হ'লনা।

কমল কহিল, তার উপায় নেই হরেনবাবু। বললেই সকল কথার মর্ম্ম বোঝা যায়না। এই দেখুন, আমাকে তো কেউ বলে দেয়নি কিন্তু অর্থ বুঝ্‌তেও বাধেনি।

হরেন্দ্র বলিল, তার মানে আপনি ভাগ্যবতী, আমি দুর্ভাগা। হয়, সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এম্‌নি ভাষায় বলুন, নাহয় থামুন। চিনে-বাজির মত এ যত চাচ্চি খুল্‌তে তত যাচ্চে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে ঐ কোথায় এসে দাঁড়ালো তার কূল-কিনারা পাচ্চিনে। এ সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলচেন? তাকে আমিও তো চিনি, সহজ করে বললে হয়ত কিছু কিছু বুঝতেও পারবো। নইলে, এ ভাবে ঘুমন্ত-মানুষের বক্তৃতা শুন্‌তে থাক্‌লে নিজের বুদ্ধির পরে আর আস্থা থাক্‌বেনা।

কমল হাসি-মুখে বলিল, কার বুদ্ধির পরে? আমার না নিজের?

দু'জনেরই।

কমল বলিল, শুধু রাজেনকেই নয়, কি জানি কেন, সকাল থেকে আজ আমার সকলকেই মনে পড়চে। আশুবাবু, মনোরমা, অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, শিবনাথ,—এমন কি আমার বাবা—

হরেন্দ্র বাধা দিল,—ও চলবেনা। আপনি আবার গভীর হয়ে উঠ্‌চেন। আপনার বাপ-মা স্বর্গে গেছেন তাঁদের টানাটানি আমার

সইবেনা। বরঞ্চ, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কথা,—আপনি রাজেনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন,—তাই বলুন আমি শুনি। সে আমার বন্ধু, তাকে চিনি, জানি, ভালোবাসি,—আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রমই করি, আর যাই করি,—আপনাকে ঠকাবোনা। সংসারে আরও পাঁচজনেব মত ভালোবাসার গল্প শুন্‌তে আমিও ভালবাসি।

কমলের গাম্ভীর্য্য সহসা হাসিতে ভরিয়া গেল, প্রশ্ন করিল, শুধু পরের কথা শুন্‌তেই ভালোবাসেন? তার বেশিতে লোভ নেই?

হরেন্দ্র বলিল, না। আমি ব্রহ্মচারীদের পাণ্ডা,—অক্ষয়ের দল শুন্‌তে পেলে আমাকে খেয়ে ফেলবে।

শুনিয়া কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, না, তারা খাবেনা। আমি উপায় করে দেবো।

হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারবেননা। আশ্রম ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গিয়েও আর আমার নিস্তার নেই। অক্ষয় একবার যখন আমাকে চিনেছে যেখানেই যাই সৎপথে আমাকে সে রাখ্‌বেই। বরঞ্চ, আপনি নিজের কথা বলুন। রাজেনকে যে ভুলে থাকতে পারেননা আবার সেইখান থেকে আরম্ভ করুন। কি কোরে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটাকে এতখানি ভালবাসলেন আমার শুনতে সাধ হয়!

কমল কহিল, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি বারে বারে আপনাকে আপনি করি।

সন্ধান পাননা?

না।

পাবার কথাও নয়। এবং সত্যি বলে আমার বিশ্বাসও হয়না।

কেন বিশ্বাস হয়না?

সে যাক। মনে হচ্ছে আগে একবার বলেছি। কিন্তু আরও

ভালো ক্যান্‌ডিডেট আছে। মীমাংসা চূড়ান্ত করবার আগে তাদের কেসগুলো একটুখানি নজর করে দেখ্‌বেন। এইটুকু নিবেদন।

কিন্তু কেস তো অনুমানে ভর করে বিচার করা যায়না, হরেনবাবু, রীতিমত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে হয়। সে করবে কে?

তারা নিজেরাই করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে, হাঁক দিলেই হাজির হয়।

কমল জবাব দিলনা, মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিল। তাহার পরে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সেলায়ের কাজগুলা একে-একে পরিপাটি ভাঁজ করিয়া একটা বেতের টুকৃরিতে তুলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনার বোধ করি চা খাবার সময় হয়েছে হরেনবাবু একটুখানি তৈরি করি আনি, আপনি বসুন।

হরেন্দ্র কহিল, বসেইত আছি। কিন্তু জানেন ত চা খাবার আমার সময় অসময় নেই, কারণ, পেলেই খাই, না পেলে খাই নে। ওর জন্যে কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

স্বচ্ছন্দে।

অনেকদিন আপনি কোথাও যাননি। ওটা কি ইচ্ছে করেই বন্ধ করেছেন?

কমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, না। এ আমার মনেও হয়নি।

তাহলে চলুন না আজ আশুবাবুর বাড়ী থেকে একটু ঘুরে আসি। তিনি সত্যিই খুব খুসি হবেন। সেই অসুখের মধ্যে একবার গিয়েছিলেন; এখন ভাল হয়েছেন। শুধু ডাক্তারের নিষেধ বলে বাইরে আসেন না, নইলে হয়ত একদিন নিজেই এসে উপস্থিত হতেন।

কমল বলিল, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। যাওয়া আমারই উচিত ছিল, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারিনি। অন্যায় হয়ে গেছে।

তাহলে আজিই চলুন না ?

চলুন। কিন্তু সন্ধ্যেটা হোক। আপনি বসুন, চট্ করে একবাটি চা নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে উভয়ে পথে বাহির হইয়া হরেন্দ্র বলিল, একটু বেলা থাক্‌তে গেলেই ভালো হত।

কমল কহিল, হোতোনা। চেনা-লোক কেউ হয়ত দেখে ফেল্‌তো।

দেখ্‌লেই বা। ওসব আমি আর গ্রাহ্য করিনে।

কিন্তু আমি এখন গ্রাহ্য করি।

হরেন্দ্র মনে করিল পরিহাস, কহিল, কিন্তু ওই চেনা-লোকেরাই যদি শোনে আপনি আমার সঙ্গে একলা বার হোতে আজ-কাল সঙ্কোচ বোধ করেন, কি তারা ভাবে ?

বোধ হয় ভাবে ঠাট্টা করচি।

কিন্তু আপনাকে যে চেনে সে কি অন্য কিছু ভাব্‌তে পারে ? বলুন ?

এবার কমল চুপ করিয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া হরেন্দ্র বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, সমস্তই দুর্বোধ্য।

কমল বলিল, যা বোঝবার নয় সে না বোঝাই ভালো। রাজেনকে যে ভুল্‌তে পারিনে এ সবচেয়ে বেশি টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হোলোনা, কিন্তু গাছ-তলায় থাক্‌লেও তার চলে যেতো, শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলাম। ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলেনা। হাওয়া-আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো, পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম। এ ভালো কি মন্দ, ভেবে দেখ্‌বার সময় পাইনি,—হয়ত বুঝ্‌তে দেরি হবে।

হরেন্দ্র কহিল, এ মস্ত সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা? কেন?

তা জানিনে।

কেহই আর কথা কহিল না,—উভয়েই কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই বোধ করি একটু ঘুর-পথ লইয়াছিল, আশুবাবুর বাটীতে আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। খবর দিয়া ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিন পাঁচ ছয় হরেন্দ্র আসিতে পারে নাই বলিয়া বেয়ারাটাকে সুমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ভালো আছেন?

সে প্রণাম করিয়া কহিল, হাঁ—ভালোই আছেন।

তাঁর ঘরেই আছেন?

না, উপরে সামনের ঘরে বসে সবাই গল্প করচেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কমল জিজ্ঞাসা করিল, সবাইটা কারা?

হরেন্দ্র কহিল, বৌদি—আর বোধ হয় কেউ—কি জানি!

পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দু'জনেই একটু আশ্চর্য্য হইল। এসেন্স ও চুরুটের কড়া গন্ধ একত্রে মিশিয়া ঘরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা উপস্থিত নাই, আশুবাবু বড় চেয়ারের হাতলে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া চুরুট টানিতেছেন এবং অদূরে সোফার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া একজন অপরিচিতা মহিলা। ঘরের কড়া আব-হাওয়ার মতই কড়া ভাব,—বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু বাঙলা বলায় রুচি নাই। হয়ত, অভ্যাসও নাই। হরেন্দ্র ও কমল ঘরে পা দিয়াই শুনিয়াছিল তিনি অনর্গল ইংরাজি বলিয়া যাইতেছেন!

আশুবাবু মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। কমলের প্রতি চোখ পড়িতেই

সমস্ত মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধকরি একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু হঠাৎ পারিয়া উঠিলেননা। মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া শুধু বলিলেন, এসো কমল, এসো। অপরিচিতা রমণীকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি আমার একজন আত্মীয়া। পরশু এসেছেন, খুব সম্ভব এখানে কিছুদিন ধরে রাখতে পারবো।

একটু থামিয়া বলিলেন, বেলা, ইনি কমল। আমার মেয়ের মত।

উভয়েই উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

হরেন্দ্র কহিল, আর আমি?

ওহো—তাও তো বটে। ইনি হরেন্দ্র—প্রফেসর অক্ষয়ের পরম বন্ধু। বাকি পরিচয় যথাসময়ে হবে,—চিন্তার হেতু নেই হরেন্দ্র। কমলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কাছে এসো ত কমল, তোমার হাতখানি নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসি। এই জন্যে প্রাণটা যেন কিছুদিন থেকে ছট্‌ফট্ করছিল।

কমল হাসিমুখে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল, এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার মোটা, ভারি হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল।

আশুবাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, খেয়ে এসেছো তো?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আশুবাবু ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, জেনেই বা লাভ কি? এ বাড়ীতে খাওয়াতে পারবোনা ত।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

২৬

বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া আশুবাবু একটু হাসিলেন, কহিলেন, কেমন, বর্ণনা আমার মিল্‌লো ত? বুড়োবয়সের extravaganco ব'লে উপহাস করা যে উচিত হয়নি মান্‌লে তো?

মহিলাটি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু কমলের হাতখানি বার কয়েক নাড়াচাড়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মেয়েটির বাইরেটা দেখেও মানুষের যেমন আশ্চর্য্য লাগে ভেতরটা দেখতে পেলেও তেম্‌নি অবাক্ হতে হয়। কেমন হরেন্দ্র ঠিক নয়?

হরেন্দ্রও চুপ করিয়া রহিল; কমল হাসিয়া জবাব দিল, এ ঠিক কিনা তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু কেউ যদি আপনাকে extravagant বলে তামাসা করে থাকেন তিনি যে বেঠিক ন'ন তাতে সন্দেহ নেই। মাত্রা জ্ঞানটা আপনার এ সংসারে অচল।

ইস্, তাই বই কি! বলিয়াই আশুবাবু গভীর স্নেহের স্বরে কহিলেন, এ বাড়ীতে খাওয়াতে তোমাকে কিছুতেই পারবোনা জানি, কিন্তু নিজের বাসাতে আজ কি খেলে বলোত?

রোজ যা' খাই, তাই।

তবু কি শুনিই না? বেলা ভাব্‌ছিলেন এ ও আমি বাড়িয়ে বলেচি।

কমল কহিল, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে আমার অসাক্ষাতে অনেক আলোচনাই হয়ে গেছে?

তা' হয়েছে—অস্বীকার করবনা।

রৌপ্য পাত্রে একখানা ছোট কার্ড লইয়া বেহারা ঘরে ঢুকিল। লেখাটা সকলেরই চোখে পড়িল এবং, সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন।

এ গৃহে অজিত একদিন বাড়ীর-ছেলের মতই ছিল, কিন্তু আগ্রায় থাকিয়াও আর সে আসেনা। হয়ত, ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এম্‌নিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখের পরে ভারি একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল,—কহিলেন, তাঁকে এই ঘরেই নিয়ে আয়।

খানিক পরে অজিত ঘরে ঢুকিল। পরিচিত ও অপরিচিত এতগুলি লোকের উপস্থিতির সম্ভাবনা সে আশঙ্কা করে নাই।

আশুবাবু কহিলেন, বোসো অজিত। ভালো আছো?

অজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে, হাঁ। আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে? ভালো মনে হচ্চে তো?

আশুবাবু বলিলেন, অসুখটা সেরেচে বলেই ভরসা পাচ্চি।

পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর এইখানে থামিল। কমল না থাকিলে হয়ত আরও দুই একটা কথা চলিতে পারিত, কিন্তু চোখো-চোখি হইবার ভয়ে অজিত সেদিকে মুখ তুলিতে সাহস করিলনা। মিনিট দুই তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে হরেন্দ্র প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সোজা বাসা থেকেই এখন আস্‌চেন?

কিছু একটা বলিতে পাইয়া অজিত বাঁচিয়া গেল। কহিল, না, ঠিক সোজা আসতে পারিনি, আপনার সন্ধানে একটু ঘুর-পথেই আস্‌তে হয়েছে।

আমার সন্ধানে? প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার নয়, আর একজনের। তিনি রাজেনের খোঁজে দুপুর থেকে বোধকরি বার চারেক উঁকি মেরে গেলেন। বস্‌তে

বলেছিলাম কিন্তু রাজি হলেননা। স্থির হয়ে অপেক্ষা করাটা হয়ত ধাতে সয়না।

হরেন্দ্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকটিকে দেখ্‌তে কেমন? বল্‌লেননা কেন সে এখানে নেই?

অজিত কহিল, সে সম্বাদ তাঁকে দিয়েছি।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, এই রাজেন ছেলেটিকে আমি দু'তিন বারের বেশি দেখিনি,—বিপদে না পড়লে তার সাক্ষাৎ মেলেনা,—কিন্তু মনে হয় তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কি যেন একটা মহামূল্য জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অথচ, হরেন্দ্রর মুখে শুনি সে ভারি wild,—পুলিশে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে,—ভয় হয় কোথায় কি একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বস্‌বে, হয়ত খবরও একটা পাবোনা,—এই দেখোনা হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কেউ খুঁজে পাচ্চেনা।

কমল প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যদি খবর পান সে বিপদে পড়েচে, কি করেন?

আশুবাবু বলিলেন, কি করি সে জবাব শুধু তখনই দেওয়া যায় এখন নয়। অসুখের সময় নীলিমা আর আমি বহু কাহিনীই তার হরেনের কাছ থেকে শুনেচি। পরার্থে আপনাকে সত্যি ক'রে বিলিয়ে দেওয়ার স্বরূপটা যে কি শুন্‌তে শুন্‌তে যেন তার ছবি দেখ্‌তে পেতাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন না তার কোন বিপদ ঘটে।

প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিলনা, কিন্তু মনে মনে সকলেই বোধহয় এ প্রার্থনায় যোগ দিল।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাকে আজ তো দেখতে পেলামনা? বোধকরি কাজে ব্যস্ত আছেন?

আশুবাবু কহিলেন, কাজের লোক, দিনরাত কাজেই ব্যস্ত থাকেন

সত্যি, কিন্তু আজ শুনতে পেলাম মাথা ধরে বিছানা নিয়েছেন। শরীরটা বোধহয় একটু বেশি রকমই খারাপ হয়েছে, নইলে এ তাঁর স্বভাব নয়। কোন মানুষই যে অবিশ্রান্ত এত সেবা, এত পরিশ্রম করতে পারে নিজের চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা যায়না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ আগ্রায়। মাঝে মাঝে আসি যাই,—কতটুকুই বা পরিচয়—অথচ, আজ ভাবি সংসারে আপন-পর বলে যে একটা কথা আছে সে কত অর্থহীন। দুনিয়ায় আপনার-পর কেউ নেই কমল, স্রোতের টানে কে যে কখন কাছে আসে, আর কে যে ভেসে দূরে যায় তার কোন হিসেব কেউ জানেনা।

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের দুঃখে বলা হইল তাহা শুধু সেই অপরিচিত রমণী বেলা ব্যতীত অপর দু'জনেই বুঝিল। আশুবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, এই রোগ থেকে উঠে পর্য্যন্ত সংসারে অনেক জিনিসই যেন আর এক রকম চেহারায় চোখে ঠেকে। মনে হয়, কিসের জন্যেই বা এত টানাটানি, এত বাঁধাবাঁধি, এত ভাল-মন্দর বাদানুবাদ,—মানুষে অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে। আনন্দ তো নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কমল বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য যে নিঃসংশয়ে বুঝিতেছে তাহা নয়,—যেন কুয়াশার মধ্যে আগন্তুকের মুখ দেখা। কিন্তু পায়ের চলন অত্যন্ত চেনা।

আশুবাবু আপনিই থামিলেন। বোধহয় কমলের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহাকে নিজের দিকে সচেতন করিল, বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে কমল, আর একদিন এসো।

আস্‌বো। আজ যাই।

এসো। গাড়ীটা নীচেই আছে, তোমাকে পৌঁছে দেবে বলেই বাসদেওকে এখনো ছুটি দিইনি। অজিত, তুমিও কেন সঙ্গে যাওনা, ফেরবার পথে তোমাদের আশ্রমে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আস্‌বে?

উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বেলা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আজ সময় হ'লনা, কিন্তু এবার যেদিন দেখা হবে আমি ছাড়বো না।

কমল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ভয় হয় পরিচয় পেয়ে না আপনার মত বদ্‌লায়।

গাড়ীর মধ্যে দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া। রাস্তার মোড় ফিরিলে কমল কহিল, সেদিনের রাতটাও এম্‌নি অন্ধকার ছিল,—মনে পড়ে?

পড়ে!

সেদিনের পাগ্‌লামি?

তাও মনে পড়ে।

আমি রাজি হয়েছিলাম সে মনে আছে?

অজিত হাসিয়া কহিল, না। কিন্তু আপনি যে বিদ্রূপ করেছিলেন সে মনে আছে।

কমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বিদ্রূপ করেছিলাম? কই না।

নিশ্চয় করেছিলেন।

কমল বলিল, তা'হলে আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যাক্, আজ তো আর তা করচিনে,—চলুননা, আজই দু'জনে চলে যাই ?

দ্যুৎ! আপনি ভারি দুষ্টু।

কমল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দুষ্টু কিসের ? আমার মত এমন শান্ত সুবোধ কে আছে বলুন ত ? হঠাৎ হুকুম করলেন, কমল চলো যাই,—তক্ষুণি রাজি হয়ে বল্‌লাম চলুন।

কিন্তু সে তো শুধু পরিহাস।

কমল বলিল, বেশ, না হয় পরিহাসই হ'ল, কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করেছি বলুন ত ? ডাক্‌তেন তুমি বলে, আরম্ভ করেছেন আপনি বল্‌তে। কত দুঃখে কষ্টে দিন চলে,—আপনাদেরই জামা কাপড় সেলাই করে কোন মতে হয়ত দু'টি খেতে পাই,—অথচ, আপনার টাকার অবধি নেই,—একটা দিনও কি খবর নিয়েছেন ? মনোরমা এ দুঃখে পড়লে কি আপনি সইতেন ? দিনরাত খেটে খেটে কত রোগা হয়ে গেছি দেখুন ত ? এই বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতখানি অজিতের হাতের উপর রাখিতেই আচম্বিতে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু সহসা হাত টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ড্রাইভার রোকো রোকো,—এ যে পাগলা-গারদের সাম্‌নে এসে পড়েচি। গাড়ী ঘুরিয়ে নাও। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারা যায়নি।

অজিত কহিল, হাঁ, দোষ অন্ধকারের। শুধু সান্ত্বনা এই যে হাজার অবিচারেও ও-বেচারার প্রতিবাদ করবার যো নেই। সে অধিকারেও বঞ্চিত। এই বলিয়া সে একটু হাসিল। শুনিয়া কমলও হাসিল, কহিল, তা' বটে। কিন্তু বিচার জিনিসটাই তো সংসারে সব নয়; এখানে অবিচারেরও স্থান আছে বলে আজও দুনিয়া চল্‌চে, নইলে কোন্‌কালে সে থেমে যেতো। ড্রাইভার, থামাও।

অজিত কবাট খুলিয়া দিতে কমল রাস্তায় নামিয়া আসিয়া কহিল, অন্ধকারের ওর চেয়েও বড় অপরাধ আছে অজিতবাবু, একলা যেতে ভয় করে।

এই ইঙ্গিতে অজিত নিঃশব্দে পাশে নামিয়া দাঁড়াইতেই কমল ড্রাইভারকে বলিল, এবার তুমি বাড়ী যাও, এঁর ফিরে যেতে দেরি হবে।

সে কি কথা! এত রাত্রে এ অঞ্চলে আমি গাড়ী পাবো কোথায়?

তার উপায় আমি করে দেবো।

গাড়ী চলিয়া গেল। অজিত কহিল, কোন ব্যবস্থাই হবেনা জানি, অন্ধকারে তিন চার মাইল হাঁটতে হবে। অথচ, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারতাম।

পারতেননা। কারণ, আপনাকে না খাইয়ে ওই আশ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে দিতে পারতামনা। আসুন।

বাসায় দাসী আলো জ্বালিয়া আজ অপেক্ষা করিয়া ছিল, ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া দিল। উপরে গিয়া কমল সেই সুন্দর আসনখানি পাতিয়া রান্নাঘরে বসিতে দিল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল, ষ্টোভ জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া অদূরে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ে?

নিশ্চয় পড়ে।

আচ্ছা, তার সঙ্গে আজ কোথায় তফাৎ বল্‌তে পারেন? বলুন ত দেখি?

অজিত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কোন্‌খানে কি ছিল এবং নাই মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমল হাসিমুখে কহিল, ওদিকে সারারাত খুঁজ্‌লেও পাবেননা। আর একদিকে সন্ধান করতে হবে।

কোন্ দিকে বলুন ত?

আমার দিকে।

অজিত হঠাৎ কি একপ্রকার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল, কোনদিনই আপনার মুখের পানে অমি খুব বেশি কোরে চেয়ে দেখিনি। অন্য সবাই পেরেছে শুধু আমিই কি জানি কেন পেরে উঠিনি।

কমল কহিল, অপরের সঙ্গে আপনার প্রভেদ ওইখানে। তারা যে পারতো তার কারণ, তাদের দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতি সম্ভ্রম-বোধ ছিলনা।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, আমি স্থির করেছিলাম যেমন করে হোক আপনাকে খুঁজে বার করবই। আশু বাবুর বাড়ীতে আজই যে দেখা হবে এ আশা ছিলনা, কিন্তু দৈবাৎ দেখা হয়ে যখন গেল, তখনই জানি ধরে আন্‌বই। খাওয়ানো একটা ছোট্ট উপলক্ষ,—তাই, ওটা শেষ হলেই ছুটি পাবেননা। আজ রাত্রে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেবোনা,—এই বাড়ীতেই বন্ধ করে রাখবো।

কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি?

কমল কহিল, লাভের কথা পরে বোল্‌ব, কিন্তু আমাকে 'আপনি' বল্‌লে আমি সত্যিই ব্যথা পাই। একদিন 'তুমি' বলে ডাকতেন, সেদিনও বল্‌তে আমি সাধিনি, নিজে ইচ্ছে করেই ডেকেছিলেন। আজ সেটা বদ্‌লে দেবার মত কোন অপরাধও করিনি। অভিমান করে সাড়া যদি না দিই আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা বোধ হয় পাবো।

কমল কহিল, বোধহয় নয়, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আগ্রায় এসেছিলেন মনোরমার জন্যে। কিন্তু সে যখন অমন কোরে চলে গেলো তখন সবাই ভাবলে আর একদণ্ডও আপনি এখানে থাকবেননা। কেবল

আমি জানতাম আপনি যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আমিও যে ভালো-বাসি এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

না, করিনে।

নিশ্চয় করেন। তাইতে আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে।

অজিত কৌতূহলী হইয়া বলিল, অনেক নালিশ? একটা শুনি।

কমল বলিল, শোনাবো বলেই তো যেতে দিইনি। প্রথমে নিজের কথাটা বলি। উপায় নেই বলে দুঃখী গরীবদের কাপড় সেলাই করে নিজের খাওয়া-পরা চালাই,—এ আমার সয়। কিন্তু দায়ে পড়েচি বলে আপনারও জামা সেলাই করার দাম নেবো—এও কি সয়?

কিন্তু তুমি তো কারও দান নাওনা!

না, দান আমি কারও নিইনে,—এমন-কি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বল্‌লেননা কমল, এ কাজ তোমাকে আমি করতে দেবোনা! আমি তার কি জবাব দিতাম? আজ যদি কোন দুর্বিপাকে আমার খেটে খাবার শক্তি যায়, আপনি বেঁচে থাকতে কি আমি পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবো?

কথাটা ব্যথায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল, বলিল, এমন হতেই পারেনা কমল, আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব। তোমার সম্বন্ধে আমি একটা দিনও এমন ক'রে ভেবে দেখিনি। এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায়না যে, যে-কমলকে আমরা সবাই জানি সে-ই তুমি।

কমল কহিল, সবাই যা' ইচ্ছে জানুক, কিন্তু আপনি কি কেবল তাদেরই একজন? তার বেশি নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর আসিলনা;—বোধকরি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই।

এবং ইহার পরে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। হয়ত, অপরকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দু'জনেই বেশি করিয়া অনুভব করিল।

কি-ই বা রান্না, শেষ হইতে বিলম্ব হইলনা। আহারে বসিয়া অজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, অথচ, মজা এই যে, যার যত টাকাকড়িই থাকুক তোমার উপার্জ্জনের অন্ন হাত পেতে না খেয়ে কারও পরিত্রাণ নেই। অথচ, নিজে তুমি কারও নেবেনা, কারও খাবেনা। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনারা খান্ কেন? তাছাড়া কবেই বা আপনি মাথা খুঁড়লেন?

অজিত বলিল, মাথা খোঁড়বার ইচ্ছে বহুবারই হয়েছে। আর, তোমার খাই শুধু তোমার জবরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠিনে বলে। আজ আমি যদি বলি কমল, এখন থেকে তোমার সমস্ত ভার নিলাম, এ উঞ্ছবৃত্তি আর কোরোনা, তুমি তখনি হয়ত এম্‌নি কটু কথা বলে উঠবে যে আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য বার হবেনা।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা কি বলেছিলেন কোনদিন?

মনে হয় যেন বলেছিলাম।

আর আমি শুনিনি সে কথা?

না।

তাহ'লে শোন্‌বার মতো ক'রে বলেননি। হয়ত, মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে হ'য়েই ছিল—মুখ দিয়ে তা' প্রকাশ পায়নি।

আচ্ছা, ধর আজই যদি বলি?

তা'হলে আমিও যদি বলি,—না।

অজিত হাতের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া কহিল, এই তো! তোমাকে

একটা দিনও আমরা বুঝতে পারলামনা। যেদিন তাজের সুমুখে প্রথম দেখি সেদিনও যেমন তোমার কথা বুঝিনি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে গেলে। এইমাত্র নিজেই বল্‌লে আমার ভার নিন্‌—আবার তখনি বল্‌লে, না।

কমল হাসিয়া কহিল, এম্‌নি ধারা একটা 'না' আপনি বলুন তো দেখি? বলুন তো যা' খেয়েছেন আর কোনদিন খাবেননা,—কেমন আপনার কথা থাকে।

অজিত কহিল, থাক্‌বে কি কোরে? না খাইয়ে তুমি তো ছেড়ে দেবেনা।

কিন্তু এবার কমল আর হাসিলনা। শান্তভাবে বলিল, আমার ভার নেবার সময় আজও আপনার আসেনি। যেদিন আস্‌বে, সেদিন আমার মুখ দিয়ে 'না' বেরুবেনা। রাত হয়ে যাচ্ছে আপনি খেয়ে নিন।

নিই। সেদিন কখনো আসবে কিনা বলে দিতে পারো?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারিনে। জবাব আপনাকে নিজেই একদিন খুঁজে নিতে হবে।

সে শক্তি আমার নেই। একদিন অনেক খুঁজেচি কিন্তু পাইনি। জবাব তোমার কাছে পাবো,—এই আশা করে আজ থেকে আমি হাত পেতে থাকবো।

এই বলিয়া অজিত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল। খানিক পরে কমল জিজ্ঞাসা করিল, এত যায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ হরেন্দ্রর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন কেন?

অজিত কহিল, কোথাও তো থাকা চাই। তুমি নিজেই তো জানো আগ্রা ছেড়ে আমার যাবার যো ছিলনা।

জানি তা হলে?

হাঁ, জানো বই কি।

আর তাই যদি সত্যি, সোজা আমার কাছে চলে এলেন না কেন?

যদি আসতাম সত্যিই কি স্থান দিতে?

সত্যি তো আর আসেননি? সে যাক, কিন্তু হরেন্দ্রর আশ্রয়ে তো কষ্টের সীমা নেই,—সেই ওদের সাধনা—কিন্তু অত কষ্ট আপনার সইল কি কোরে?

জানিনে কি করে সইল, কিন্তু আজ আর আমার ও-কথা মনেও হয়না। এখন ওদেরই আমি একজন। হয়ত, এই আমার সমস্ত ভবিষ্যতের জীবন। এতদিন চুপ করেও ছিলামনা। লোক পাঠিয়ে স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেচি,—তিন চারটি আশ্রমের আশাও পেয়েচি—ইচ্ছে আছে নিজে একবার বার হবো।

এ পরামর্শ আপনাকে দিলে কে? হরেন্দ্র বোধ হয়?

অজিত কহিল, যদি দিয়েও থাকেন নিষ্পাপ হয়েই দিয়েছেন। দেশের সর্ব্বনাশ যারা চোখে দেখেচে,—এর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দুঃখ, এর ধর্ম্মহীনতার গভীর গ্লানি, এর দৌর্ব্বল্যের একান্ত ভীরুতা—

কমল বাধা দিয়া বলিল, হরেন্দ্র এসব দেখেচেন অস্বীকার করিনে, কিন্তু আপনার ত শুধু শোনা কথা। নিজের চোখে কোন কিছু দেখবার তো আজও সুযোগ পাননি?

কিন্তু এ সবই ত সত্যি?

সত্যি নয় তা বলিনে, কিন্তু তার প্রতীকারের উপায় কি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা?

নয় কেন? ভারতবর্ষ বল্‌তে তো শুধু উত্তরে হিমালয় এবং অপর তিনদিকে সমুদ্র-ঘেরা কতকটা ভূখণ্ড মাত্র নয়? এর প্রাচীন সভ্যতা, এর ধর্ম্মের বিশিষ্টতা এর নীতির পবিত্রতা, এর ন্যায়-নিষ্ঠার মহিমা,—

এই তো ভারত, তাই তো এর নাম দেবভূমি,—একে নিরতিশয় হীনতা থেকে বাঁচাবার তপস্যা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে? ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী নিষ্কলুষ ছেলেদের,—জীবনে সার্থক হবার,—ধন্য হবার—

কমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল; আপনার খাওয়া হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে ও-ঘরে চলুন,—আর না।

তুমি খাবেনা?

আমি কি দু'বেলা খাই যে আজ খাবো? উঠুন।

কিন্তু আশ্রমে আমাকে তো ফিরে যেতে হবে।

না হবেনা, ও-ঘরে চলুন। অনেক কথা আমার শোনবার আছে।

আচ্ছা চলো। কিন্তু বাইরে থাকবার আমাদের বিধি নেই, যত রাত্রিই হোক্ আশ্রমে আমাকে ফিরতেই হবে।

কমল বলিল, সে বিধি দীক্ষিত আশ্রম-বাসীদের, আপনার জন্যে নয়।

কিন্তু লোকে বল্‌বে কি?

লোকের উল্লেখে কোনদিনই কমলের ধৈর্য্য থাকেনা, কহিল, লোকেরা আপনাকে শুধু নিন্দেই করবে, রক্ষে করতে পারবেনা। যে পারবে তার কাছে আপনার ভয় নেই,—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি আপনার। সেদিন সঙ্গে যেতে আমাকে ডেকেছিলেন—কিন্তু পারিনি, আজ আর না পারলে আমার চল্‌বেনা। চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা,—আমি তাদের জাত নই। উঠুন।

এ ঘরে আনিয়া কমল সম্পূর্ণ নূতন শয্যা-বস্ত্র দিয়া খাটের উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া দিল, এবং নিজের জন্য মেঝের উপর ন-তেমন গোছের আর একটা পাতিয়া রাখিয়া কহিল, আসৃচি। দশেকের বেশি দেরি হবেনা, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেননা যেন।

না।

তা'হলে ঠেলে তুলে দেবো।

তার দরকার হবেনা কমল, ঘুম আমার চোখ থেকে উবে গেছে।

আচ্ছা, সে পরীক্ষা পরে হবে,—এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রান্নার পাত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখা, উচ্ছিষ্ট বাসন বারান্দায় বাহির করিয়া দেওয়া, দাসী বহুক্ষণ চলিয়া গেছে,—নীচে সিঁড়ির কবাট বন্ধ করা—গৃহস্থালীর এম্‌নি-সব ছোট-খাটো কাজ তখনো বাকি, সে সব সারিয়া তবে তাহার ছুটি।

কমলের সযত্ন রচিত শুভ্র-সুন্দর শয্যাটির পরে বসিয়া একাকী ঘরের মধ্যে হঠাৎ তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বিশেষ কোন গভীর হেতু যে ছিল তাহা নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা ভালো-লাগার তৃপ্তি। হয়ত, একটু কৌতূহল মেশানো,—কিন্তু আগ্রহের উত্তাপ নাই,—শুধু একটি শান্ত আনন্দের মধুর স্পর্শ যেন নিঃশব্দে সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অজিত ধনীর সন্তান, আজন্ম বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত ; কিন্তু হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভর্ত্তি হওয়া অবধি দৈন্য ও আত্ম-নিগ্রহের সুদুর্গম পথে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্ম্মোপলব্ধির একাগ্র সাধনা এদিক হইতে দৃষ্টি তাহার অপসারিত করিয়াছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল হলুদ রঙের সুতা দিয়া তৈরি বালিশের অড়ের চারিধারে ছোট্ট গুটিকয়েক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। বিছানার চাদরের যে-কোণটি ঝুলিয়া আছে তাহাতে শাদা রেশম দিয়া বোনা কোন্ একটি অজানা লতার একটুখানি ছবি। এইটুকু শিল্প-কর্ম্ম,—সামান্যই ব্যাপার। কত লোকের ঘরেই তো আছে। অবসর কালে কমল নিজের হাতে সেলাই করিয়াছে। দেখিয়া অজিত মুগ্ধ হইয়া গেল। হাতে করিয়া সেইটি নাড়া-চাড়া করিতেছিল, কমল বাহিরের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বেশ তো!

কমল একটু আশ্চর্য্য হইল,—কি বেশ ? ঐ লতাটুকু ?

হাঁ, আর এই হল্‌দে রঙের ফুলগুলি। তুমি নিজে করেছো, না ?

কমল হাসিমুখে বলিল, চমৎকার প্রশ্ন। নিজে নয়ত কি কারিগর ডেকে তৈরি করিয়েছি ? আপনার চাই ঐ রকম ?

না না না,—আমার চাইনে। আমি কি কোরব ?

তাহার এই ব্যাকুল ও সলজ্জ প্রত্যাখ্যানে কমল হাসিয়া কহিল, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে শোবেন। কেউ জিজ্ঞেসা করলে বল্‌বেন কমল রাত জেগে তৈরি করে দিয়েছে।

দ্যুৎ !

দ্যুৎ কেন ? নিজের জন্যে এ সব জিনিস কেউ তৈরি করেনা, করে আর একজনের জন্যে। কষ্ট কোরে ঐ ফুলগুলি যে শেলাই করেছিলাম সে কি আপনি শোবো বলে ? একদিন একজন আস্‌বেই,—শুধু তারই জন্যে এ সব তোলা ছিল। সকালে যখন চলে যাবেন সমস্ত আপনার সঙ্গে দেবো।

এবার অজিত নিজেও হাসিল, কহিল, আচ্ছা কমল, আমি কি এতই বোকা ?

কেন ?

তুমি আমাকেই মনে করে এ সব তৈরি করেছিলে এ-ও বিশ্বাস কোরব ?

কেন করবেননা ?

কোরবনা সত্যি নয় বলে।

কিন্তু সত্যি বল্‌লে বিশ্বাস করবেন বলুন ?

নিশ্চয় কোরব। তোমার পরিহাসের কোন সীমা নেই,—কোথাও বাধেনা। সেই মোটরে বেড়াবার কথা মনে হলে আমার লজ্জার অবধি

থাকেনা। সে আলাদা। কিন্তু যা' পরিহাস নয়, সে যে তুমি কোন কিছুর জন্যেই মিথ্যে বল্‌তে পারোনা এ আমি জানি।

তা'হলে যদি বলি বাস্তবিক পরিহাস করিনি, সত্যি কথাই বল্‌চি, বিশ্বাস করবেন ?

নিশ্চয় কোর্‌ব।

কমল কহিল, তা' যদি করেন আজ আপনাকে সত্যি কথাই বোলব। তখনো রাজেন আসেনি। অর্থাৎ আশ্রমে স্থান না পেয়ে তখনো সে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়নি। আমারো ত সেই দশা। আপনারা সবাই যখন আমাকে ঘৃণায় দূর করে দিলেন, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ রইলনা,—সেই গভীর দুঃখের দিনের ঐ শিল্প কাজটুকু। সেদিন ঠিক কাকে স্মরণ করে যে করেছিলাম আমি কোনদিন হয়ত জান্‌তে পারতামনা। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ বিছানা পাত্‌তে এসে হঠাৎ মনে হোলো, না না, ওতে নয়। যাতে কেউ কোনদিন শুয়েছে তাতে আপনাকে আমি কোনমতে শুতে দিতে পারিনে।

কেন পারোনা ?

কি জানি, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঐ কথা বলে দিয়ে গেলো। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, হঠাৎ স্মরণ হ'ল ঐ গুলি বাক্সে তোলা আছে। আপনি তখন বাইরে মুখ ধুচ্ছিলেন, এখনি এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খুলে এনে পাত্‌তে গিয়ে আজ প্রথম টের পেলাম সেদিন যাকে ভেবে রাত্রি জেগে ফুল-লতা-পাতা এঁকেছিলাম সে আপনি।

অজিত কথা কহিলনা। শুধু একটা আরক্ত-আভা তাহার মুখের পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমিষে নিবিয়া গেল।

কমল নিজেও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপ্ করে কি ভাবচেন বলুন ত ?

অজিত কহিল, শুধু চুপ করেই আছি, ভাবতে পারছিনে।

তার কারণ ?

কারণ ? তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতর যেন ঝড় বয়ে গেল। শুধুই ঝড়,—না এলো আনন্দ, না এলো আশা।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অজিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কমল, একটা গল্প বলি শোন। আমার মাকে একবার আমাদের গৃহদেবতা রাধা-বল্লভজিউ পূজোর ঘরে মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে সুমুখে বসে খেয়েছিলেন,—এ তাঁর নিজের চোখে দেখা। তবুও বাড়ীর কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। সবাই বুঝ্লে এ তাঁর স্বপ্ন কিন্তু, এই অবিশ্বাসের দুঃখ তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যায়নি। আজ তোমার কথা শুনে আমার সেই কথা মনে পড়চে। তুমি তামাসা করোনি জানি, কিন্তু আমার মায়ের মতো তোমারো কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে। মানুষের জীবনে এমন বহুকাল যায় নিজের সম্বন্ধে সে অন্ধকারেই থাকে। হয়ত, হঠাৎ একদিন চোখ খোলে। আমারও তেম্নি। এতদিন পৃথিবীর কত যায়গাতেই তো ঘুরেচি—শুধু এই আগ্রায় এসে আমি নিজেকে দেখ্তে পেলাম। আমার থাকার মধ্যে আছে শুধু টাকা। বাবার দেওয়া। এ ছাড়া এমন কিছুই নিজের নেই যে আমারও অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকেই ভালোবাস্তে পারো।

কমল কহিল, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আশ্রম-বাসীরা একবার যখন সন্ধান পেয়েছে তখন সে ব্যবস্থা তারাই করবে, এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু অন্য সকল দিকেই যে আপনি এমন নিঃস্ব এ

খবর কি ছাই আগে পেয়েছি? তাছাড়া ভালো-মন্দ বুঝে দেখ্‌বার সময় পেলাম কই? মনের মধ্যে শুধু একটা সন্দেহের মতই ছিল,—ঠিকানা পেতামনা,—কেবল এই তো মিনিট দশেক হ'লো একলা ঘরে বিছানার সুমুখে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ ঠিক খবরটি কে এসে আমার কানে-কানে দিয়ে গেল।

অজিত গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সত্যি বোল্‌চো মাত্র মিনিট দশেক? কিন্তু সত্যি হলে এতো পাগ্‌লামি।

কমল বলিল, পাগ্‌লামিই তো! তাই তো আপনাকে বলেছিলাম আমাকে আর কোথাও নিয়ে চলুন। বিবাহ ক'রে ঘর-সংসার করুন এ ভিক্ষে তো চাইনি?

অজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল, কহিল, ভিক্ষে বোল্‌চ কেন কমল, এ ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তোমার ভালোবাসার অধিকার। কিন্তু অধিকারের দাবী তুমি করলেনা, চাইলে শুধু তাই যা বুদ্‌বুদের মত স্বল্পায়ু এবং তারই মত মিথ্যে।

কমল কহিল, হতেও পারে এর পরমায়ু কম, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে হবে কেন? আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাদের কেউ নয়।

কিন্তু এ আনন্দের যে কোন স্থায়িত্ব নেই কমল!

না-ই থাক্‌। কিন্তু গাছের ফুল শুকোবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুল-দানিতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলেনা। আপনাকে আরও একবার ঠিক এই কথাই বলেছিলাম যে, কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই তো মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধ্‌তে গেলেই সে মরে। তাই তো বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই

তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা ক'রে মরে।

অজিতের মনে পড়িল ঠিক এই কথাই সে ইহারি কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। শিবনাথ তাহাকে বিবাহ করে নাই, ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু এ লইয়া কমল একটা দিনের জন্যও অভিযোগ করে নাই। কেন করে নাই? আজ এই প্রথম দিনের জন্য অজিত নিঃসংশয়ে বুঝিল, এই ফাঁকির মধ্যে তাহার নিজেরও সায় ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এত বড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার কাছে গর্ব্ব করা আমার সাজেনা। কিন্তু তোমার কাছে আর আমি কিছুই গোপন কোরবনা। এঁরা বলেন সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। বুদ্ধির দিক দিয়ে এ আমি বিশ্বাস করি, এবং এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এ বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। কাঞ্চন আমার যথেষ্ট আছে, তাতে লোভ নেই, কিন্তু সমস্ত জীবনে ভালোবাসবার কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবেনা, মনে হলে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে। ভয় হয়, অন্তরের এ দুর্ব্বলতা হয়ত আমি মরণকাল পর্য্যন্ত জয় করতে পারবোনা। অদৃষ্টে তাই যদি কখনো ঘটে, আশ্রম ত্যাগ করে আমি চলে যাবো। কিন্তু, তোমার আহ্বান তার চেয়েও মিথ্যে। ও ডাকে সাড়া দিতে আমি পারবনা।

একে মিথ্যে বলচেন কেন?

মিথ্যেই ত। মনোরমা সত্যই কখনো আমাকে ভালোবাসেনি, তার আচরণ বোঝা যায়, কিন্তু শিবনাথের প্রতি শিবানীর ভালোবাসা

ত আমি নিজের চোখেই দেখেচি। সেদিন তার যেন আর সীমা ছিলনা, কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল কহিল, আজ যদি তা' গিয়েই থাকে, সেদিন কি শুধু আমার ছলনাই আপনার চোখে পড়েছিল?

অজিত বলিল, সে তুমিই জানো, কিন্তু আজ মনে হয় নারী-জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই।

কমলের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, নারীজীবনের সত্যাসত্য নির্দ্দেশের ভার নারীর 'পরেই থাক। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই,—মনোরমারও না, কমলেরও না। এম্নি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ, কলুষিত হয়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে-মামলার আর নিষ্পত্তি হতে পেলেনা। অবিচারে কবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়না অজিতবাবু, দু-পক্ষেরই সর্ব্বনাশ করে। সেদিন শিবনাথ যা' পেয়েছিলেন দুনিয়ায় কম পুরুষের ভাগ্যেই তা' জোটে, কিন্তু আজ তা' নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে, মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে কিন্তু ফিরে পাওয়া যায়না। সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক ততবড়ই সত্যি। শঠতার ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে একে ঢাকা দিতে লজ্জাবোধ করেছি বলে পুরুষের বিচারে এই হ'ল নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যে? এই সুবিচারের আশাতেই আমরা আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি?

অজিত উত্তর দিল, কিন্তু উপায় কি? যা' এমন ক্ষণস্থায়ী এমন ভঙ্গুর, তাকে এর বেশি সম্মান মানুষে দেবে কেন?

কমল বলিল, দেবেনা জানি। আমার উঠোনের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন একবেলার বেশি নয়। তার চেয়ে ওই মশলা-পেশা

নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী। সত্য যাচাই করার এর চেয়ে মজবুত মানদণ্ড আপনারা পাবেন কোথায়?

কমল, এ যুক্তি নয়, এ শুধু তোমার রাগের কথা।

রাগ কিসের অজিতবাবু? কেবল স্থায়িত্ব নিয়েই যাদের কারবার তারা এম্‌নি করেই মূল্য ধার্য্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে পারেননি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখৎ লিখে যে বন্ধন নেবেনা তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে? ফুল যে বোঝেনা তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, ওর আয়ু একটা বেলার নয়, ও নিত্য কালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মশলা পিষে দেবে—ভাত গেলবার তরকারির উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে! ও না থাক্‌লে সংসার বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এ বিদ্রুপ কিসের কমল?

কমলের কানে বোধ করি এ প্রশ্ন গেলনা, সে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, মানুষে বোঝেনা যে হৃদয়-বস্তুটা লোহার তৈরি নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলেনা। দুঃখ যে নেই তা' নয়,—কিন্তু এই তার ধর্ম্ম, এই তার সত্য।' অথচ, এ কথা বলাও চলেনা, স্বীকার করাও যায় না। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি সংসারে আর আছে কি? তাইতো কেউ ভেবেই পেলেনা শিবনাথকে কি কোরে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়াটা তারা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইলনা। অরুচি ও অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তিতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হ'ল মিথ্যে, আর

বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হ'ল সত্য ?

অজিত একমনে শুনিতেছিল, শেষ হইলে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে আসলে তুমি আমাদের আপনার নয়। তোমার রক্ত, তোমার সংস্কার, তোমার সমস্ত শিক্ষা বিদেশের। তার প্রচণ্ড সংঘাত তুমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারোনা। এবং এইখানেই আমাদের সঙ্গে তোমার অহরহ ধাক্কা লাগে। রাত অনেক হল কমল, এ নিষ্ফল কলহ বন্ধ কর,—এ আদর্শ তোমার জন্যে নয়।

কোন্ আদর্শ ? আপনার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ?

অজিত খোঁচা খাইয়া মনে মনে রাগ করিল, কহিল, বেশ তাই। কিন্তু এর গূঢ়তত্ত্ব বিদেশীদের জন্যে নয়। এ তুমি বুঝবেনা।

আপনার সাগরেদি করলেও পারবনা ?

না।

এবার কমল হাসিয়া উঠিল, যেন সে মানুষ আর নয়। কহিল, আচ্ছা বলুন তো, কি হলে ঐ সাধুদের আড্ডা থেকে আপনার নাম কাটিয়ে দিতে পারি ? বাস্তবিক, ঐ আশ্রমটা হয়েছে যেন আমার চক্ষুশূল।

অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, রাজেন্দ্রকে ডেকে এনে তুমি অনায়াসে আশ্রয় দিলে,—তোমার কিছুই বোধহয় মনে হোলোনা,—না ?

—কি আবার মনে হবে ?

এ সব বোধ করি তুমি গ্রাহ্যই করোনা ?

কি গ্রাহ্য করিনে, আপনাদের মতামত ? না।

নিজের সম্বন্ধেও বোধকরি কখনো ভয় করোনা ?

কমল বলিল, কখনো করিনে তা' বল্‌তে পারিনে, কিন্তু ব্রহ্মচারীদের ভয় কিসের ?

হুঁ, বলিয়া অজিত চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হলে তার রক্ষে নেই,—তাকে গিলে খাবার অনেক মুখ হাঁ করে আছে। লুকোনো ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় সে জানেনা। কিন্তু তুমি জানো মানুষ কেঁচো নয়। এমন কি মেয়েমানুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জান্‌তে পারাই পরম শক্তি,—এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল ?

কমল কিছুই না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অজিত কহিল, মেয়েরা যে-বস্তুটিকে তাদের ইহজীবনের যথাসর্ব্বস্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সে-ই যেন আগুনের বেড়ার মত তোমাকে অনুক্ষণ আগলে রাখে। গায়ে লাগবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে পুরুষের ভোগের বস্তু যারা তাদের জাত তুমি নও। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে আস্‌চে। আমাদের নিন্দে-সুখ্যাতিকে অবজ্ঞা করার সাহস যে তুমি কোথায় পাও তাও বুঝতে পারচি।

কমল কৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি, অজিতবাবু, কথাগুলো যে অনেকটা জ্ঞানবানের মতো শোনাচ্চে ?

অজিত কহিল, আচ্ছা কমল, সত্যি বলো আমার মতামতও কি অন্য সকলের মত তোমার কাছে এম্‌নি তুচ্ছ ?

কিন্তু এ কথা জেনে আপনার হবে কি ?

কমল, নিজেকে শক্তিমান বলে আমি তোমার কাছে কোনদিন

অহঙ্কার করিনি। বাস্তবিক, ভিতরে ভিতরে আমি যেমন দুর্ব্বল, তেমনি অসহায়। কোন কিছুই জোর ক'রে করার সামর্থ্য নেই আমার।

কমল হাসিয়া কহিল, সে আমি আপনার নিজের চেয়েও ঢের বেশি জানি।

অজিত কহিল, আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় তোমাকে পাওয়াও আমার যেমন সহজ, হারানোও আবার তেম্‌নি সহজ।

কমল বলিল, আমি তাও জানি।

অজিত নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, সেই তো। তোমাকে আজ পাওয়াই ত শুধু নয়, একদিন যদি এমনি কো'রে হারাতেই হয় তখন কি হবে?

কমল শান্ত কণ্ঠে কহিল, কিছুই হবেনা, সেদিন হারানোও ঠিক এম্‌নি সহজ হয়ে যাবে। যতদিন কাছে থাকবো আপনাকে সেই বিদ্যেই দিয়ে যাবো।

অজিত অন্তরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, বিলেতে থাকতে দেখেচি, ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজেনা? আর এই যদি তাদের ভালোবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ব্ব করে কিসের?

কমল কহিল, অজিতবাবু, বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেচেন, হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নর-নারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল,—কথা কহিলনা। তার পর ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া শুইতেই তাহার কি কারণে কোথা দিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হয়ত কমল বুঝিতে পারিল। উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপ্রান্তে

বসিয়া তাহার মাথার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথাও উচ্চারণ করিলনা।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল পূবের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অজিতবাবু, ঘুমোবার বোধ করি আর সময় নেই।

না, এইবার উঠি। এই বলিয়া সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

২২

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র,—এর বেশি দাবী আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে একদিনও করেন নাই। পৈতৃক বিপুল ধন-সম্পদও যেমন শান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহ-ভার ও আনুষঙ্গিক বাত-ব্যাধিটাও তেম্‌নি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগতের সুখ-দুঃখ যে বিধাতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব-স্ব নিয়মেই চলে,—এ সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্যা করিতে হয় নাই। সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন। একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন ভাগ্য-দেবতাকে অজস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসায় আগুন ধরাইয়া দিল সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসেন নাই। ক্ষোভ ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার বার করিয়া

বলিতে থাকিত যে এম্‌নিই হয়। এম্‌নি দুঃখ বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে, এবং এম্‌নি করিয়াই সংসার চলে। ইহার কোথাও নূতনত্ব নাই,—ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন। উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকেই নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ না আছে প্রয়োজন। তাই সর্ব্ববিধ দুঃখই তাঁহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি স্নিগ্ধ-প্রসন্নতার বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে। আগ্রায় আসিয়াও নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ, এই ব্যতিক্রম-টুকুই চোখে পড়িতে লাগিল আজকাল অনেকেরই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্য্যের অভাব বহু স্থলেই যেন চাপা পড়িতে চাহেনা, মনে হয় আলাপ-আলোচনা অকারণে রূঢ়তার ধার ঘেঁসিয়া আসে, মন্তব্য প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্ণতা চাকর-বাকরদের কানে অদ্ভুত শুনায়,—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়া-বাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাঁহাতে অবিশ্বাস্য মনে হইত, এখন তো সারিয়া আসিতেছে। কিন্তু হেতু যাই হোক, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার নিভৃত-চিত্ত-তলে যেন একটা দাহ চলিতেছে; তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ্ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে আগ্রা-বাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত, আর একটুখানি সুস্থ হওয়ার বিলম্ব। তারপরে, হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেম্‌নি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকাল বেলাটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, রায় বাহাদুর সদরআলা, কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী—নানা কারণে স্থান ত্যাগের সুযোগ যাঁহারা পান নাই তাঁহারা,—হরেন্দ্র, অজিত, এবং বাঙালী পাড়ার যাঁহারা আনন্দের দিনে বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গেছেন তাঁহাদের কেহ কেহ। আসেনা শুধু অক্ষয় এখানে সে নাই বলিয়া। মহামারীর সূচনাতেই সস্ত্রীক বাড়ী গিয়াছে, বোধহয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সম্বাদ পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর আসেনা কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আশুবাবু মজ্‌লিসি লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজ্‌লিসে আর যোগ দিতে পারেননা, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন,—তাঁহার স্বাস্থ্য-হীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে-সকল কর্ত্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া এখন বেলাকে তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তার কোথাও ত্রুটি ঘটেনা, বাহিরের লোকে বাহির হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ করে, হয়ত বা, সভা-শেষে পরিতৃপ্ত চিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়া নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়।

সম্ভব কি করিয়া যে হয় এই ইতিহাসটুকুই গোপনে থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইতনা, অভ্যাসও ছিলনা, ভালও বাসিতনা। কিন্তু, অন্তরাল হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ এই গৃহের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিগূঢ়, তেমনি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্তধারার ন্যায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধকরি কেহ অনুভবও করেনা।

হিম-ঋতুর প্রথমার্দ্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে-কারণেই হৌক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতেই টিপি-টিপি বৃষ্টি নামিয়াছিল,—বিকালের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল। বাহিরের কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিলনা। ঘরের শার্শীগুলা অসময়েই বন্ধ হইয়াছে, আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেম্‌নি পা ছড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি-একখানা বই পড়িতেছেন, বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্যই বলিয়া বসিল, এ পোড়া-দেশের সবই উল্টো। কিছুকাল আগে এ অঞ্চলে একবার এসেছিলাম,—জুন কিম্বা জুলাই হয়ত হবে,—এই জলের জন্যে যে দেশ জুড়ে এতবড় হাহাকার ওঠে না এলে এ কখনো আমি ভাবতেও পারতুমনা। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায়?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, এর কারণ কি সকলে টের পায়? পায়না।

বেলা সরল চিত্তে প্রশ্ন করিল, কেন?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারের মধ্যেই জন্মলাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহ্লাদেই যারা মগ্ন এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে?

জবাবটা এমনি অভাবিত রূপে কঠোর যে সুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন সে তেম্‌নি একমনে সেলাই করিয়া যাইতেছে, যেন, এ কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহ-প্রিয় রমণী নয়, এবং, মোটের উপর সে সুশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক, এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের

দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নাই,—অকস্মাৎ মনে হয় বুঝি-বা তেম্‌নিই আছে। রঙ উজ্জ্বল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় স্নিগ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রুক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হাস্য কৌতুকে চপল, চঞ্চল,—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ,—কোথাও কোন-কিছুতে স্থির হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূলও নাই। আনন্দ-উৎসবেই তাহাকে মানায়; দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্বামীকে লজ্জায় পড়িতে হয়।

বেলার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে ক্ষণেকের জন্য মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে, সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ কোরে কোন লাভ নেই। শুধু অনধিকারচর্চ্চা বলেই নয়, হাহাকার ক'রে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক্ সে আমি পারিনে, এবং তার থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্ম-সম্মান-বোধ বজায় থাক্, তার বড় আমি কিছুই চাইনে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিলনা।

আশুবাবু অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণ ভাবেই বলেছেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারেনা—কখনো পারেনা তা বলচি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভালো। এতদিন একসঙ্গে আছি এ তো আমি ভাব্‌তেই পারতুমনা।

নীলিমা হাঁ, না, একটা উত্তরও দিলনা, যেন ঘরে কেহ নাই এম্‌নি

ভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়াই যাইতে লাগিল। গৃহ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশঃ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-মত কি ছিল কেহ জানেনা, সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেননা। মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেলা নামটি সখ করিয়া তাঁহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দল একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইলনা। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন, দিন কতক দেখা-শুনা ও মন জানা-জানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইন-মতে রেজেষ্ট্রী করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অনুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যসন, একত্রে দেশ-ভ্রমণ, আলাদা বায়ু-পরিবর্ত্তন, এম্‌নি অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশে যেটুকু তাহা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বর-পক্ষ হাতে-হাতে ধরা পড়িলেন এবং, কন্যা-পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মাম্‌লা রুজু করিতে চাহিলেন। বন্ধু মহলে আপোষের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্ষিতা বেলা নর-নারীর সমানাধিকার-তত্ত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিলনা। স্বামী-বেচারা চরিত্রের দিক দিয়া যাই হৌক, মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিলনা, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্য মত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া

আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিলনা। শেষে বহুদুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং, দাম্পত্য-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা-স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিম্‌লা, মুসোরি, নইনি প্রভৃতি পর্ব্বতাঞ্চলে সদর্পে প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসরের কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি তো ছিলইনা, বরঞ্চ, অতিশয় মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পরলোকগত পত্নীর সহিত তাঁহার কি একটা দূর সম্পর্ক ছিল; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। এইরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল; নিতান্ত পরের মতও আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়ীতে ঢুকে নাই। এ তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ, অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল, একেবারে অন্যরূপ। এ গৃহে কাহার স্থান যে কোথায়, এ বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্ত্তৃত্বও ছিল তেম্‌নি অবিসম্বাদিত।

বহুক্ষণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিক্কার দেবার জন্যেই যে ও কথা নীলিমা বলেছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিলনা, তথাপি বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিক্কার? ধিক্কার কিসের জন্যে বেলা?

বেলা কহিল, আপনি তো সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবেনা। কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও কোরবনা। নিজের মর্য্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাইনি বলে সেদিন গ্লানি প্রচার করেছিল মেয়েরাই সব চেয়ে বেশি, আজও তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সব চেয়ে কঠিন। কিন্তু অন্যায় করিনি বলে সেদিনও যেমন ভয় পাইনি, আজও আমি তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাঁটি।

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিলনা, কিন্তু আস্তে আস্তে কহিল, একদিন কমল বলছিলেন যে বিবেক-বুদ্ধিটাই সংসারে মস্ত বড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হয়না।

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি?

নীলিমা কহিল, হাঁ। বলেন ওটা শুধু নির্ব্বোধের হাতের অস্ত্র। সাম্‌নে পিছনে দু'দিকেই কাটে,—ওর কোন ঠিক্-ঠিকানা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, সে বলে বলুক, ও-কথা তুমি মুখে এনোনা নীলিমা।

বেলা কহিল, এত বড় দুঃসাহসের কথাও তো কখনো শুনিনি।

আশুবাবু মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অন্ত নেই। আপন নিয়মে চলে; তার সব কথা সব সময়ে বোঝাও যায়না, মানাও চলেনা।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই, বাবার নিষেধও মান্‌তে পারিনি,—স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুমনা।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি না দিয়ে পারিনি।

বেলা কহিল, Thanks, সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, তার কারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দু-সমাজের এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই; কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তাঁর সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারিনি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলাম যে, জিনিসটা শোভনও নয়, সুখেরও নয়, কিন্তু সে যদি তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে সত্যই বর্জ্জন করতে চায়, তাকে অন্যায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবোনা।

নীলিমা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যিই এই অভিমত জবাবে লিখেছিলেন?

সত্যি বই কি।

নীলিমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই স্তব্ধতার সম্মুখে আশুবাবু কেমন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নেই নীলিমা। বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্যায় হোতো।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, তুমি তো কমলের একজন বড় ভক্ত; বলো ত সে নিজে এ-ক্ষেত্রে কি কোরত? কি জবাব দিতো? তাইতো সেদিন যখন ওদের দু'জনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল, তোমার মত কোরে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকেই দেখেচি, সে এই বেলা।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, সে বেচারা ভদ্র-সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন ?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয়, নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া।

নীলিমা কহিল, ওই তো টানাটানি। এইমাত্র বল্‌ছিলেন তার সকল কথা বোঝাও যায়না, মানাও চলেনা। চলেনা কিছুই, চলে কি শুধু উদাহরণ দেওয়া ?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে, আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেন-না। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, যে জন্যেই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে। এ সময়ে আলোচনা করা ভালো নয়।

নীলিমা এ কথা কানে তুলিলনা, বলিল, সেদিন আপনি ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন, এবং আজ অসঙ্কোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন। ওঁর অবস্থায় কমল কি করতো, তা' সেই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি কোরে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলী-মজুরের জামা সেলাই ক'রে আহার সংগ্রহ করতে হোতো,—তাও হয়ত সব দিন জুট্‌তোনা। কমল আর যাই করুক, যে-স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ কোরে বাঁচ্‌তে চাইতনা। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা ক'রে মরতো।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। নীলিমার হাসি-তামাসা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যেন তাহার

কাজ ; সে যে সহসা এমন নির্ম্মম হইয়া উঠিতে পারে, দু'জনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিলেন না।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজ্‌লিসে আমি বসিনে, কিন্তু যাদের নিয়ে যে-সকল প্রসঙ্গের আলোচনা চলে, সে আমার কানে আসে। নইলে কোন কথা হয়ত আমি বোলতামনা। কমল একটা দিনের জন্যেও শিবনাথের নিন্দে করেনি, একটি লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ জানায়নি,—কেন জানেন?

আশুবাবু বিমূঢ়ের ন্যায়, শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন?

নীলিমা কহিল, কেন তা' বলা বৃথা। আপনারা বুঝ্‌তে পারবেননা। একটু থামিয়া বলিল, আশুবাবু, স্বামী স্ত্রীর তুল্য অধিকার—এ একটা অত্যন্ত স্থূল কথা। কিন্তু তাই বলে এমন ভাব্‌বেননা যে, মেয়েমানুষ হয়ে আমি মেয়েদের দাবীর প্রতিবাদ করচি। প্রতিবাদ আমি করিনে ; আমি জানি এ সত্যি ; কিন্তু এ-কথাও জানি যে সত্য-বিলাসী একদল অবুঝ নর-নারীর মুখে-মুখে, আন্দোলনে-আন্দোলনে এ সত্য এম্‌নি ঘুলিয়ে গেছে যে আজ একে মিথ্যে বল্‌তেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চ্চা করবেননা।

আশুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে সেলাইয়ের জিনিস-পত্রগুলা তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তখন ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, ও কবে কি শুনেছে জানিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া

ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখো-মুখি বসিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দু'জনেই অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেক ভিজিয়াছে,—বৌদি কই?

আশুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজিকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে, এ ভরসা তাঁহার ছিলনা; সাগ্রহে উঠিয়া বসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো অজিত, বোসো হরেন্দ্র—

বসি। বৌদি কোথায়?

ইস্! দু'জনেই যে ভারি ভিজে গেছো দেখ্‌চি—

আজ্ঞে, হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন?

ডেকে পাঠাচ্চি, বলিয়া আশুবাবু একটা হুঙ্কার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেই ভিতরের দিকের পর্দ্দা সরাইয়া নীলিমা আপনিই প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দু'খানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

অজিত কহিল, এ কি? আপনি হাত গুণতে জানেন নাকি?

নীলিমা বলিল, গোণা-গাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানলা থেকেই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। একটি ভাঙা ছাতির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলছিলে, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশশুদ্ধ লোকের চোখে পড়েচে।

আশুবাবু বলিলেন, একটা ছাতায় মধ্যে দু'জনে? তাইতে দু'জনকেই ভিজ্‌তে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ওঁরা বোধ হয় সমানাধিকার-তত্ত্বে বিশ্বাসী—অন্যায় করেননা—তাই চুল চিরে ছাতি ভাগ ক'রে পথ হাঁটছিলেন। নাও

ঠাকুরপো, কাপড় ছাড়ো। এই বলিয়া সে জামা-কাপড় হরেন্দ্রের হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র কহিল, কাপড় দিলেন দু'টো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গম্ভীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরেন্দ্র বলিল, জামাটা আশুবাবুর, সুতরাং, দু'জনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু সে মশারির মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চল্‌বেনা।

বেলা এতক্ষণ শুষ্ক বিষণ্ণ-মুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল; এবং নীলিমা জানেলার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি হে হরেন, আর খুঁড়োনা—দেখ্‌চোনা মেয়েদের কি রকম ব্যথা লাগ্‌লো। একজন সইতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

হরেন্দ্র কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্ত্তন করেছি। খোঁড়াখুঁড়ির দুষ্প্রভাব শুধু আমাদের মত নর-জাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারেনা। অতএব, চিরস্তূয়মান হিমাচলের ন্যায় ও-দেহ অক্ষয় হোক্, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন্, এবং জল-বৃষ্টির ছুতানতায় ইতর-জনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টান্নের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্রও ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তুতিবাদ তো আবহমান-কাল চলে আস্‌ছে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দ্দিষ্ট ধারা এবং, তাতে তুমি

সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোষামোদ না করলে ইতরজনের ভাগ্যে মিষ্টান্নের অঙ্কে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি?

গভীর স্নেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টি কথা অনেকদিন শুনিনি ভাই, তাই শুন্‌তে একটু লোভ হয়।

তবে, আরম্ভ কোরব নাকি?

আচ্ছা এখন থাক্‌। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়োগে, আমি জামা পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হলে? তার পরে?

নীলিমা সহাস্যে কহিল, তার পরে চেষ্টা করে দেখিগে ইতর-জনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট কোরে চেষ্টা করতে হবেনা বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই অন্নের ভাঁড়ার উথ্‌লে যাবে। চলো অজিত, আর ভাব্‌না নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছেড়ে আসিগে, এই বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

২৩

অজিত কহিল, জল আসবার তো কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। অতএব, আবার দু'জনে সেই ভাঙা-ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকার-তত্ত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা, এবং অবশেষে আশ্রমে পৌঁছানো। অবশ্য, তার পরের ভাবনাটা নেই,—এখানে তা' চুকিয়ে নেওয়া গেছে,—সুতরাং, আর একবার ভিজে কাপড় ছাড়া ও শুয়ে পড়া।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তা'হলে তোমরা দু'জনে একেবারে পেট ভোরেই খেয়ে নিলেনা কেন?

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, না, না, থাক্,—তাতে আর কি হয়েছে—আপনি সেজন্যে ব্যস্ত হবেননা আশুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগা মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়াও। আশুবাবুকে কহিল, উনি সন্ন্যাসী মানুষ, বৈরিগী-গিরিতে পেকে গেছেন,—এ দিক থেকে ওঁর ত্রুটি কেউ দেখতে পাবে না। ভাবনা শুধু অজিতবাবুর জন্যে। এমন সংসর্গেও-যে উনি তাড়াতাড়ি সুপক্ক হয়ে উঠতে পারছেন না সে ওঁর আজকের খাওয়া দেখলেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে তাই। ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি পাপই থাক্, উনি ধরাই পড়ুন একদিন,—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা কোরে পূজো দেবো।

তা'হলে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বক্‌চেন হরেনবাবু,—ভারি বিশ্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কৌতূহল তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথাটা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারি রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বৌদি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব না কি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়,—আর একটুখানি বেড়েছে; এইমাত্র প্রভেদ। পরে কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ। ব্রহ্মচর্য্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক্, শোনা-মাত্রই অহেতুক ভক্তি ও প্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে ওঠেন। মেজাজ ভালো থাক্‌লে মূঢ়-বুড়োখোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুক বোধ করতেও অপারক হননা। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বরও ওঁর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমার তুলনা করছিলেন আশুবাবু? এই বলিয়া সে পর্য্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকেই চাহিল, কিন্তু কাহারও

কাছে কোন উৎসাহ পাইল না। তাহার রুক্ষ স্বর ইঁহাদের কানে গেল কি না ঠিক বুঝা গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল,—অথচ, নিজের মধ্যে এম্‌নি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্ব্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে, দেখে বিস্ময় লাগে। আপনার শিবনাথের ব্যাপারটা মনে আছে আশুবাবু? সে আমাদের কে, তবু এতবড় অন্যায় সহ্য হোলো না, দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষায় বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেলো। কিন্তু কমল বললে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে 'না'র মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপর থেকে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্লাঘা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই,—দাক্ষিণ্য যেন অবিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অন্যায়ই ক'রে থাক, আমার প্রস্তাবে কমল চম্‌কে উঠে শুধু বললে ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন যাকে সে ভালোবেসেছিল তার প্রতি নির্ম্মমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না। এবং সকলের চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ কোরে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা-হুতাশ নয়,—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেলো।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সব চেয়ে রাগ হয় ও-যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম্ম, ঐতিহ্য, স্মৃতি, নৈতিক-অনুশাসন, সব কিছুকেই উপহাস কোরে উড়িয়ে দিতে চায়। বুঝি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পর-ধর্ম্মের ভাব বয়ে যাচ্চে; তবুও ওর মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারিনে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে

পেয়েছে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থ-টাকে সোজা দেখ্‌তে পাচ্চে।

আশুবাবু খুসি হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। তাই ওর যেমন কথা, তেম্‌নি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝেও থাকে, তবু সে-মিথ্যের গৌরব আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে পাষণ্ড চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন কোরে থাকলে ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকতো না। শূয়োরের গলায় মুক্তোর মালার মত অপরাধ হোতো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এম্‌নি মায়ামমতা যে, এক বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখিনি। সেবায় যেন লক্ষ্মী। হয়ত, পুরুষদের চেয়ে অনেক দিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কাছে এম্‌নি সামান্য করে রাখে যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মন গলে গিয়ে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্যে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে কোন রাজরাণীর স্তুতিপাঠক ছিলে, এ-জন্মে তার সংস্কার ঘোচেনি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে এ ব্যবসা ধরলে যে ঢের সুরাহা হোতো।

হরেন্দ্রও হাসিল, কহিল, কি কোরব বৌদি, আমি সরল সোজা মানুষ, যা' ভাবি তাই বলে ফেলি। কিন্তু, জিজ্ঞেসা করুণ দিকি অজিত-বাবুকে, এক্ষুনি উনি হাতের আস্তিন গুটিয়ে মারতে উদ্যত হবেন। তা হোক্, কিন্তু বেঁচে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ—কি করেন হরেনবাবু। আপনার আশ্রম থেকে দেখচি চলে যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, হবে একদিন সে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যের দিন ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা'হলে বলুন আপনার যা' ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমটা ছাই তুলেই দাওনা ভাই। তুমিও বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচ্‌তে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই; অন্ততঃ, অক্ষয়টা বেঁচে থাকৃতে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ী রওনা ক'রে দিয়ে ছাড়বে।

আশুবাবু কহিলেন, অক্ষয়কে দেখ্‌চি তোমরা তা'হলে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিট্‌কিরি হজম করা অসাধ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল, কিন্তু সে তো মরলোনা। দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কইনে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্যে বা'র হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে!

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনারা সব জ্বলা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আগুন শুধু আমাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার এলাকার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা' নয়তো কি!

বেলা কহিল, সত্যিই তো তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল, সেদিন ঠিক এই নিয়ে আমি একটি চমৎকার গল্প পড়েচি। আশুবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েননি?

কই, মনে তো হয়না।

যে মাসিকপত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে

আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, স্ত্রীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি নিজের পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি যৌবন পার হয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। ঐ তো সুমুখের শেল্‌ফেই রয়েছে—এই বলিয়া সে বইখানা পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত,—"একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম।"

বেলা কহিল, তার মানে? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেছেন নাকি?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন, এবং হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারী-দেহের ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের যে ছবি দিয়েছেন তা' স্থানে স্থানে রুচিকে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু, ও থাক্।

অজিত কহিল, থাক্। কিন্তু অন্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেছেন তা ঠিক মধুর না হ'লেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন,—বেশ তো অজিত, বাদ-সাদ দিয়ে পড়োনা শুনি। জলও থামেনি, রাতও তেমন হয়নি।

অজিত কহিল, বাদ-সাদ দিয়েই পড়া চলে। গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারবেন।

বেলা কহিল, পড়ুননা শুনি। অন্ততঃ, সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সম্মুখ বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু

ভূমিকা আছে, তা' সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। এ যাঁর আত্মকাহিনী, তিনি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী এবং বড় ঘরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কিনা গল্পে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, দাগ যদি বা কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে সে যৌবনের প্রারম্ভে,—সে বহুদিন পূর্ব্বে।

সেদিন তাঁকে ভালোবেসেছিল অনেকে ;—একজন সমস্যার মীমাংসা করলে আত্মহত্যা কোরে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেলো বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলেনা। দূরের থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেচে যে জমিয়ে রাখলে এক-খানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করেনি, জবাব পায়ওনি। তারপরে পনেরো বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চম্‌কে উঠ্‌লো। ইতিমধ্যে যে পনেরো বছর কেটে গেছে,—যাকে পঁচিশ বৎসরের যুবতী দেখে বিদেশে গিয়েছিল তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েছে, এ ধারণাই যেন তার ছিলনা। কুশল প্রশ্ন অনেক হোলো, অভিযোগ-অনুযোগও কম হোলোনা; কিন্তু সেদিন দেখা হলে যার চোখের কোণ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বার হোতো, উন্মত্ত-কামনার ঝঞ্ঝাবর্ত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ দ্বার ভেঙে বাইরে আস্‌তে চাইতো, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, কিন্তু এ যায়না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া অজিত বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন,—না না, ইংরিজি নয় অজিত, ইংরিজি নয়। তোমার মুখ থেকে বাঙ্‌লায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগ্‌লো, তুমি এম্‌নি করেই বাকিটুকু বলে যাও!

আমি পারবো কেন?

পারবে, পারবে। যেমন কোরে বলে গেলে তেম্‌নি কোরেই বলো।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রবাবুর মতো আমার ভাষার জ্ঞান নেই; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই অক্ষমতা। এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"মেয়েটি বাড়ী ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা' নয়, বরঞ্চ একান্ত মনে চিরদিন এই প্রার্থনাই করে এসেছে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন,—এই নিষ্ফল প্রণয়ের দাহ থেকে অব্যাহতি দান করেন। অসম্ভব বস্তুর লুব্ধ-আশ্বাসে আর যেন না সে যন্ত্রণা পায়। দেখা গেলো, এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন। কোন কথাই হোলোনা, তবু নিঃসন্দেহে বুঝা গেলো সে ক্যানাডায় ফিরে যাক্, বা না যাক্, সকাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও দুঃখ পাবেনা, তা'কেও দুঃখ দেবেনা। দুঃসাধ্য সমস্যার আজ শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। চিরদিন 'না' বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শেষ 'না' এলো আজ একেবারে উল্টো দিক থেকে। দু'য়ের মধ্যে যে এতবড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও ভাবেনি। মানবের লোলুপ-দৃষ্টি চিরদিন তাকে বিব্রত করেছে, লজ্জায় পীড়িত করেছে; আজ ঠিক সেই দিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে, শারীর-ধর্ম্ম বশে অবসিত-প্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের উদ্দীপ্ত কামনা, উন্মাদ আসক্তির আজ গতিরোধ কোরে থাকে অভিযোগের কি আছে? অথচ, বাড়ী ফেরার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসার আজ যেন চোখে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিলে। ভালোবাসা নয়, আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়,—এ সব অন্য কথা। বড় কথা। কিন্তু যা' বড় নয়,—যা' রূপজ, যা' অশুভ, অসুন্দর, যা অত্যন্ত

ক্ষণস্থায়ী,—সেই কুৎসিতের জন্যেও যে নারীর অবিজ্ঞাত চিত্ত-তলে এতবড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তাকে এমন নির্ম্মম অপমানে আহত করতে পারে, আজকের পূর্ব্বে সে তার কি জান্‌তো ?

হরেন্দ্র কহিল, অজিত বেশ তো বল্লেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন।

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলনা।

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। তারপরে অজিত ?

অজিত বলিতে লাগিল,—মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেলো যে কেবল ঐ মানুষটিই তো নয়, বহু লোকে বহুদিন ধ'রে তাঁকে ভালো-বেসেছে, প্রার্থনা করেছে,—সেদিন তার একটুখানি হাসি-মুখের একটি-মাত্র কথার জন্যে তাদের আকুলতার শেষ ছিলনা। প্রতিদিনের প্রতিপদক্ষেপেই যে তারা কোন্ মাটী ফুঁড়ে এসে দেখা দিতো, তার হিসেব মিল্‌তোনা। তারাই বা আজ গেল কোথায় ? কোথাও তো যায়নি,—এখনো ত, মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে, গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগ্‌ড়ে ? তার হাসির রূপ বদ্‌লে ? এই তো সেদিন,—দশ-পনেরো বছর, কতদিনই বা—এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো ?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায়নি কিছুই অজিত,—হয়ত, শুধু গেছে তার যৌবন, তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক তাই। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন ?

না।

নইলে ঠিক এই কথাটিই জান্‌লেন কি কোরে ?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তারপরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ী ফিরে শোবার ঘরের মস্ত বড় আরশীর সুমুখে আলো জ্বেলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোষাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদ্‌লে গেলো। এমন কোরে ধাক্কা না খেলে হয়ত এখনো চোখে পড়তনা যে নারীর যা সব চেয়ে বড় সম্পদ,—আপনি যাকে বল্‌ছিলেন তার মা-হবার শক্তি,—সে শক্তি আজ নিস্তেজ, ম্লান; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে; এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবেনা। তার নিশ্চেতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জল-ধারার ন্যায় সে-সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে;—কিন্তু এতবড় ঐশ্বর্য্য যে এমন স্বল্পায়ুঃ, এ বার্ত্তা পৌঁছল তার কাছে আজ শেষ বেলায়।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এম্‌নিই হয় অজিত, এম্‌নিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তার পরে?

অজিত বলিল, তার পরে সেই আর্শীর সুমুখে দাঁড়িয়ে যৌবনান্ত দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। এক দিন কি ছিল, এবং আজ কি হ'তে বসেছে। কিন্তু সে বিবরণ আমি বল্‌তেও পার্‌বনা পড়তেও পারবনা।

নীলিমা পূর্ব্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না না, অজিতবাবু, ও থাক্। ঐ যায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেছেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এর বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আশুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল,—না একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্যি।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির 'যা' বয়েস, তাকে তো বিকৃতির বয়স বলা চলেনা নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ, ওতো কেবলমাত্র বছর গুণে মেয়েদের বেঁচে থাক্‌বার হিসেব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এ কথা আর যেই ভুলুক, মেয়েদের ভুল্‌লে তো চল্‌বেনা।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুসি হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটিই তিনি নিজে দিয়েছেন। বলেছেন,—"আজ থেকে সমাপ্তির শেষ প্রতীক্ষা ক'রে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটি মাত্র সত্য। এতে সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু তো উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচ্‌বো। ঐশ্বর্য্যের ভগ্ন-স্তূপ হয়ত আজও কোন দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে-মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেম্‌নি মিথ্যে। যে-রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে 'শেষ হয়নি' ব'লে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবোনা, পরকেও না।"

আর কেহ কিছু কহিলনা, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারি সুন্দর লাগ্‌লো অজিতবাবু।

সকলের মত হরেন্দ্রও একমনে শুনিতেছিল; সে এই মন্তব্যে খুশী হইলনা কহিল, এ আপনার ভাবাতিশয্যের উচ্ছ্বাস বৌদি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমুল-ফুলও হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছোয় না। রমণীর দেহ

কি এম্নি তুচ্ছ জিনিস যে, এ ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজনই নেই ?

নীলিমা কহিল, নেই, এ কথা তো লেখিকা বলেননি। দুর্ভাগা মানুষগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেটেনা এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ছিল। একটুখানি হাসিয়া কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বল্‌ছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাক্‌লে বুঝতেন ওর আতিশয্যটা আজকাল কোন্‌দিকে চেপেছে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাক্‌লেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হরেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছেন,—

কিন্তু এই কি ঠিক ?

ঠিক নয়, এ কথা জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেননা মনে করুন, মানুষের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মানুষের প্রয়োজন জীব-জগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে বহুদূরে চলে গেছে,—তাইতো সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এতো দুরূহ। এক চালুনিতে ছেঁকে বেছে ফেলা যায়না বলেই তো তার মর্য্যাদা আশুবাবু।

তাও বটে। গল্পের বাকিটা শুনি অজিত।

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবেনা আশুবাবু। তুচ্ছ-তাচ্ছল্য কোরে উত্তরটা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবোনা। হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার ভুলটা দেখিয়ে

দিন। আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন,—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মানুষ,—আপনার এই অনির্দ্দিষ্ট ঢিলে-ঢালা কথার ফাঁক দিয়ে যে বৌদি জিতে যাবেন, সে আমার সইবেনা। বলুন।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ,—রূপের বিচারে হারলে তো তোমার লজ্জা নেই হরেন।

না, সে আমি শুনবনা।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা অপ্রমাণ করার জন্যে কোমর বেঁধে তর্ক করতে আমার লজ্জা করে। বস্তুতঃ, নারীরূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাকে সেই ভালো, হরেন। পুনরায় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুনতে শুনতে আমার বহুকাল পূর্ব্বের একটা দুঃখের কাহিনী মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালোবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী, ছাত্রীদের পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবতী,— আমরা সবাই তাঁদের শুভকামনা কোরতাম। নিশ্চিত জানতাম, এঁদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘট্‌বেনা।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘট্‌লো কিসে?

আশুবাবু বলিলেন, শুধু বয়সের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কনের বয়েস তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়েস লুকিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলে তিনি

গোপন করতেননা,—সে প্রকৃতিই তাঁর নয়,—কিন্তু, জিজ্ঞাসা করার কথা কারো মনেও উদয় হয়নি। এম্‌নি তাঁর দেহের গঠন, এম্‌নি মুখের সুকুমার শ্রী, এম্‌নি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয়নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশি হতে পারে।

বেলা কহিল, আশ্চর্য্য! আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না?

ছিল বই কি। কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্য্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না। এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত?

তিনি আমারই সম-বয়সী,—তখন বোধ করি আটাশ উনত্রিশের বেশি ছিলনা।

তারপরে?

আশুবাবু বলিলেন, তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন এক নিমিষেই যেন এই প্রৌঢ়া রমণীর বিরুদ্ধে পাষাণ হয়ে গেলো। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হুতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধা-সাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার বিন্দু পরিমাণও নড়ানো গেলো না। এ বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতেই পারলেনা।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব হইয়া রহিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হলে বোধ করি অসম্ভব হ'তনা?

বোধ হয় না।

কিন্তু ও রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয়না? তেমন পুরুষ কি সে দেশে নেই?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার

বোধ করি দুর্ভাগা বিশেষণটা বিশেষ কোরে সেই পুরুষদেরই স্মরণ করে লিখেছেন। কিন্তু রাত্রি তো অনেক হয়ে গেল অজিত, এর শেষটা কি?

অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পের কথাই ভাবছিলুম। অত ভালোবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলেনা, এতবড় সত্য বস্তুটাও কোথা দিয়ে যে এক নিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেছেন;—একদিন যেদিন নারী ছিলাম! নারীত্বের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারে কবে ঘটে এর পূর্ব্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবনা নারী চিন্তাও করেন নি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা?

অজিত শ্রান্তভাবে কহিল, আজ থাক্। যৌবনের ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি,—নিজের এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েছে। সে বরঞ্চ অন্য দিন বোল্‌ব।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না, তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্তই থাক্।

আশুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সব চেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পর-ছিদ্রান্বেষী, এমন কি নিষ্ঠুর হয়ে,—তাই বোধ হয় সকল দেশেই মানুষে এদের এড়িয়ে চল্‌তে চায় নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয় আশুবাবু, বলা উচিত তোমাদের মত দুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চল্‌তে চায়।

আশুবাবু ইহার জবাব দিলেননা, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন।

বলিলেন, অথচ, স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, জীবনের এতবড় সঙ্কটকাল যে কবে কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে যায় টেরও পাননা।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যবতীদের ঈর্ষা করিনে আশুবাবু, সে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু ভাগ্য দোষে যারা আমাদের মতো ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছে তাদের পথের নির্দ্দেশ কোন্ দিকে আমাকে বলে দিতে পারেন ?

আশুবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনি মাত্রই করতে পারি নীলিমা, তার বেশি শক্তি নেই। তাঁরা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে। সংসারে দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নেই। এসব আমিও জানি,—কিন্তু এর মাঝে নারীর অবিরুদ্ধ, কল্যাণময়, সত্যকার আনন্দ আছে কি না আজও আমি নিঃসংশয়ে জানিনে নীলিমা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল ?

আশুবাবু মনে মনে যেন কুণ্ঠিত হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারিনে হরেন। তখন, দিন দুই তিন হোলো মনোরমা চলে গেছেন, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ ক'রে পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর ক'রে ডেকে কাছে বসালাম। আমার ব্যথার যায়গাটা সে সাবধানে পাশ-কাটিয়ে যেতেই চাইলে, কিন্তু পারলেনা। কথায় কথায় এই ধরণের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়লো, তখন, আর তার হুঁস্ রইলনা। তোমরা জানই ত তাকে, প্রাচীন যা-কিছু তার পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙে ফেলাই যেন তার passion। মন সায় দিতে চায়না,

চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলেনা, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু কমল স্বীকার করলেনা, বল্‌লে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও-প্রবৃত্তি তো তাদের পূর্ণতা থেকে আসেনা, আসে শুধু শূন্যতা থেকে,—ওঠে বুক খালি ক'রে দিয়ে। ওতো স্বভাব নয়,—অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গে আমি কানা-কড়ি বিশ্বাস করিনে আশুবাবু। কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলামনা, তবু বো'ললাম, কমল, হিন্দু-সভ্যতার মর্ম্ম-বস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাক্‌লে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে ত্যাগ ও বিসর্জ্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সব চেয়ে বড় সফলতা। এবং, এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করে গেছেন।

কমল হেসে বল্‌লে, করতে দেখেচেন? একটা নাম করুন তো? সে এ রকম প্রশ্ন করবে ভাবিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত সে মেনে নেবে। কেমন ধারা যেন ঘুলিয়ে গেল—

নীলিমা বলিল, বেশ! আপনি আমার নামটা করে দিলেননা কেন? মনে পড়েনি বুঝি?

কি কঠোর পরিহাস! হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিল, এবং বেলা আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেননা, কহিলেন, না, মনেই পড়েনি সত্যি। চোখের সামনের জিনিস যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়,—তেম্‌নি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যিই তার মস্ত জবাব হোতো, কিন্তু সে যখন মনে এলোনা, তখন, কমল বল্‌লে, আমাকে যে-শিক্ষার খোঁটা দিলেন আশুবাবু, আপনাদের

নিজের সম্বন্ধেও কি তাই ষোলো আনায় খাটেনা? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ-বুলিই তো তারা সদর্পে আবৃত্তি কোরে ভাবে এই বুঝি সত্যি! আপনারাও ঠকেন, আত্ম-প্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বল্‌লে, সহমরণের কথা তো আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরতো, এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি দিতো, দু'পক্ষের দম্ভই তো সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেক্‌তো যে, বৈধব্য-জীবনের এত বড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলামনা। কিন্তু, সে অপেক্ষাও করলেনা, নিজেই বল্‌লে, উত্তর তো নেই, দেবেন কি? একটু থেমে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, প্রায় সকল দেশেই এই আত্মোৎসর্গ কথাটায় একটা বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য-অবস্তু ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন ক'রে দেয়, ভাব্‌তেই দেয়না ওর মাঝে নর নারী কারও জীবনেরই শ্রেয়ঃ আছে কি না। সংস্কার-বুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়,—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই,—কিন্তু আর না আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বল্‌লাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েছে জগতের সে কল্যাণ করেনি।

কমল বল্‌লে, আমার বাবা দিয়েছেন।

বোল্‌লাম, তোমার মুখেই শুনেচি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ'কথা কি তিনি কখনো শেখাননি যে নিঃশেষে দান করেই

তবে মানুষে সত্য করে আপনাকে পায়? স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা?

কমল বল্‌লে, তিনি বল্‌তেন, মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের দুঃখ ত ও নয়,—ওকে যেন স্বেচ্ছায় যেচে ঘরে ডেকে আনা। অর্থহীন সৌখীন জিনিসের মত ও শুধু ছেলেখেলা। তার বড় নয়!

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বোল্‌লাম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন? এবং জগতে যা কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে?

কমল এ অনুযোগ বোধ করি আশা করেনি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেননা। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করচেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বোল্‌লাম, তুমি যা বল্‌চো, সত্যিই এ শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাঁকে সুবিচার করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্য-কোন স্ত্রীলোককে আমি যে ভালোবাস্‌তে পারিনি শুনে তুমি বলেছিলে এ চিত্তের অক্ষমতা,—এবং, অক্ষমতা নিয়ে গৌরব করা চলেনা। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ ব'লে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংযমের কোন অর্থ-ই সেদিন তুমি দেখ্‌তে পাওনি—

কমল বল্‌লে, আজও পাইনে আশুবাবু,—সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান কোরে আনে। ও তো কোন

বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা,—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংযম,—শক্তির স্পর্দ্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর এক ধরণের অসংযম, এ কথা কি কোন দিন ভেবে দেখেননি আশুবাবু?

ভেবে দেখিনি সত্যি। তাই, চিরদিনের ভেবে-আসা কথাটাই খপ্ কোরে মনে পড়লো। বোল্‌লাম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধ'রে গ্রাস ক'রে ভোগ করতে চায় ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা তো মেটেনা,—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন ও-পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেছেন,—ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশি জ্বলে ওঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমেনা।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বল্‌তে গেলেন কেন? তার পরে?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বল্‌লে, শাস্ত্রে ঐ রকম আছে নাকি? থাক্‌বেই ত। তাঁরা জান্‌তেন জ্ঞানের চর্চ্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে, ধর্ম্মের সাধনায়, ধর্ম্মের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অনুশীলনে পুণ্যলোভ ক্রমশঃ উগ্র হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকি,—এও ঠিক তেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ ক্ষেত্রেও তাঁরা আক্ষেপ করে যান্‌নি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনেই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার স্পর্দ্ধায় যেন হতবাক্ হয়ে গেলাম, নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বোল্‌লাম, না, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হয়না এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।

কমল একটুখানি থেমে বল্‌লে, কি জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা শোনা না, প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজ্‌না যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক্, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে,—আর না। এর আসল সত্তা তো বাইরের ভোগের মধ্যে নেই,—উৎস ওর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারেনা।

বোল্‌লাম, তা হতে পারে, কিন্তু ও যে রিপু, ওকে তো মানুষের জয় করা চাই?

কমল বল্‌লে, কিন্তু, রিপু বলে গাল দিলেই তো সে ছোট হয়ে যাবেনা। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার,— তাদের কোন্ সত্বটা কে, কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই তো দুঃখকে জয় করা নয়? অথচ, ঐ ধরণের যুক্তির জোরেই মানুষে অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাত্‌ড়ে বেড়ায়। শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হোলো ও বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি যে হোলো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখোদিকি। কথাটা ব'লে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধ্‌লো, কারণ, কটাক্ষ করার মতো কিছুই তো তার নেই,—কমল নিজেও

বোধ হয় আশ্চর্য্য হোলো, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলেনা, শান্ত মুখে আমার পানে চেয়ে বল্‌লে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু! দুঃখ যে পাইনি তা' বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের দেবার যা' ছিল তিনি দিয়েছেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েছি,—আনন্দের সেই ছোট-ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্ত দাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলিনি, শুক্‌নো ঝরণার নীচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দু'-হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালোবাসার আয়ুঃ যখন ফুরলো, তাকে শান্তমনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধুঁয়ায় আকাশ কালো করে তুল্‌তে আমার প্রবৃত্তিই হোলো না। তাই, তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাব্‌লেন এতবড় অপরাধ কমল মাপ করলে কি কোরে? কিন্তু অপরাধের কথার চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হোলো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিলে। হয়ত সত্যি, হয়ত আমারই ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচ্‌ড়ে উঠ্‌লো,—এর সঙ্গে আমার প্রভেদ কতটুকু,—বোল্‌লাম, কমল, এম্‌নি মণি-মাণিক্যের সঞ্চয় আমারো আছে,—সেই তো সাত্‌রাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো ত?

কমল চুপ ক'রে চেয়ে রইলো। জিজ্ঞাসা কোরলাম, এ জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালোবাস্‌তে পারবে কমল? এম্‌নি ধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?

কমল অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ, সেই আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘেরই আড়ালে আজ

সূর্য্য অস্ত গেছে ব'লে সেই অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতে আলোয়-আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুজে তাকেই বল্‌বো এ আলো নয়, এ মিথ্যে ? জীবনটাকে নিয়ে এম্‌নি ছেলেখেলা করেই কি সাঙ্গ ক'রে দেবো ?

বোললাম, রাত্রি তো কেবল একটি মাত্রই নয় কমল, প্রভাতের আলো শেষ কোরে সে তো আবার ফিরে আস্‌তে পারে ?

সে বল্‌লে, আসুক না। তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন কোরবো।

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে বসে রইলাম,—কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা ! মনে হয়েছিল শোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বুঝি গিয়ে একস্রোতে মিশেছে। দেখ্‌লাম, না, তা' নয়। আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র,— আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানেনা, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখের পথ রোধ করেনা ; ওর অনাগত তাই,—যা আজও এসে পৌঁছোয়নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্ব্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোন মতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য্য মেয়ে ! সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলনা, কিন্তু এ কথাও তো মনে মনে স্বীকার না-করে পারলামনা যে, এ তো কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা' শিখেচে একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেচে। কতটুকুই বা বয়েস, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়েসেই সম্যক উপলব্ধি করে নিয়েছে।

একটু থামিয়া বলিলেন, সত্যিই ত। জীবনটা সত্যিই তো আর ছেলে-খেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান তো সে জন্যে আসেনি। আর-একজন-কেউ আর-এক-জনের জীবনে বিফল হ'ল বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বোল্‌বো কি কোরে ?

বেলা আস্তে আস্তে বলিল, সুন্দর কথাটি।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হ'ল বৃষ্টিও কমেছে,—আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিলনা,—উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোট-খাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকি ছিল, কিন্তু আজ সে সকল তেম্‌নি অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল,—অন্যমনস্কের মত সেও নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়ন-কক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল,—এত কথা ও আলোচনার সমস্তটাই যেন নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ গৃহের মধ্যে আসিয়া তাহাদের কাছে ঝাপ্‌সা হইয়া গেল ;—অথচ, পরমাশ্চর্য্য এই যে কাপড় ছাড়িবার পূর্ব্বে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দু'টি নারীর একই সময়ে ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—একদিন যে দিন নারী ছিলাম !

২৪

দশ-বারো দিন কমল আগ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, অথচ, আশুবাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কমবেশি সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাধিল হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র-অজিত উৎকণ্ঠার পাল্লা দিয়া এম্‌নি শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে তাহাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইতনা। অবশেষে তাহারাই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ, ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের, চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গী-সাহেব বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরি লইয়া সম্প্রতি টুন্‌ডলায় আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী নাই, বছর দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে; অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে, তাহারই ঘর-সংসার গুছাইয়া দিতে তাহার এত বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছে, অপরাহ্নে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশুবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিষ্ট্রের বাটীতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সেও গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারো দিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ কথার তাৎপর্য্য যে কি ঠাহর করিতে পারিলেননা।

নীলিমা যেন আপন-মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর

মাছ। জলে ভেজা, না-ভেজার প্রশ্নই ওঠেনা। খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙাবার সমাজ নেই,—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেম্নি অফুরন্ত। সেই রাজেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে ক'দিনের বা জানা-শোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাঁই হলোনা ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তাকে নিজের কর্ত্তব্যে বাধা দিলেনা। কেউ যা পারলেনা ও তাই অনায়াসে পারিলে। শুনে মনে হোলো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে,—অথচ, মেয়েদের কত কথাই তো ভাবতে হয়!

আশুবাবু বলিলেন, ভাবাই তো উচিত নীলিমা?

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ও-রকম বে-পরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠতে তো আমরাও পারি।

নীলিমা বলিল, না পারিনে। ইচ্ছে করলে আমিও পারিনে, আপনিও না। কারণ, জগৎ সংসার যে-কালী গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেক দিক থেকেই এ কথা ভেবে দেখেচি। পুরুষের তৈরি সমাজের অবিচারে জলে জলে মরেচি,—কত যে জলেচি সে জানাবার নয়। শুধু জলুনিই সার হয়েছে,—কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নর-নারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশি আর এক পা এগোয়না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি

স্বাধীনতা তত্ত্ব বিচারে মেলেনা, ন্যায়-ধর্ম্মের দোহাই পেড়ে মেলেনা, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল ক'রে মেলেনা,—এ কেউ কাউকে দিতে পারেনা,—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়। কমলকে দেখ্‌লেই দেখা যায়, এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুক্‌রে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায়না,—মরে। আমাদের সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে সে দশ বারোদিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইলনা, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হোলোনা যে এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে তার মর্য্যাদা হানি হয়। বলুন ত, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমরা হলে পেতাম কোথায়? এ গৌরব আমাদের দিতো কে? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আশুবাবু সুবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্যি নীলিমা।

বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাক্‌লে সে কি কোরতো?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা কোরতো, রাঁধতো বাড়্‌তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরতো, ছেলে হলে তাদের মানুষ কোরতো; বস্তুতঃ, একলা মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতোনা।

বেলা কহিল, তবে?

নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ-কর্ম্ম কোরবনা, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাক্‌বেনা, হরদম্‌ ঘুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার

তো কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য?

আশুবাবু গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধ-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ, এই ধরণের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাক্‌তে তো জানেনা, তখন স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্ম্মের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যেতো,— আনন্দের ধারার মত সংসার তার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যেতো ও টেরও পেতোনা। কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেচে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কেউ একটা দিনও সে-সংসারে তাকে ধরে রাখতে পারতোনা।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই বটে। তাই মনে হয়।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্ণের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হাঁ, আমাদেরই গাড়ী।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন সম্বাদ দিল।

কয়দিন যাবৎ আশুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ, খবর পাওয়া মাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এইমাত্র আরাম কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল, এবং আশুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলাম আমার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। কে জান্‌তো আমাকে আপনারা এত ভালোবাসেন,— তা'হলে যাবার আগে নিশ্চয়ই একটা খবর দিয়ে যেতাম।" এই বলিয়া

সে তাঁহার সুপরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশুবাবুর মুখ অন্যদিকে ছিল, ঠিক তেম্নিই রহিল, একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেননা।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ লয় নাই,—তাই অভিমান। তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বলচি আমার দোষ হয়েছে,—আমি ঘাট মান্‌চি। কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেননা তখন সে সত্যই ভারি আশ্চর্য্য হইল, এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয় বচনে কহিল, আপনি আসবেন জান্‌লে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতামনা, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারি হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী,—নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, সত্যিই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবেনা,—তবে ভারি ক্ষুণ্ণ হবেন তাঁরা। শুনেচি আরও দু-চার জনকে আহ্বান করেছেন। আচ্ছা, আজ তাহ'লে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার। এই বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েছে যে আজ ওঁর বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল,

নইলে সব কথা খুলে বল্‌তে বাধ্‌তো। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বোলতাম, না তুমি বলে ডাকতাম ?

কমল কহিল, তুমি বলে। কিন্তু এমন নির্ব্বাসনে যাইনি যে এর মধ্যেই তা' ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি, শুধু একটু খট্‌কা বেধেছিল। বাধবারই কথা। সে যাক্‌। সাত আট দিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজ্‌ছিলাম। আমার কিন্তু ঠিক খোঁজা নয়, পাবার জন্যে যেন মনে মনে তপস্যা করছিলাম।

কিন্তু তপস্যার শুষ্ক গাম্ভীর্য্য তাহার মুখে নাই, তাই, অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্ট একটুখানি পরিহাস কল্পনা করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু ? আমি তো সকলের পরিত্যক্ত দিদি, ভদ্র-সমাজের কেউ তো আমাকে চায়না।

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু থাকিতে পারিলেননা, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয় তো এ অনুযোগের জবাব তারাই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি কোরে চেয়ে থাকে তো এই নীলিমা। এতখানি ভালোবাসা হয়ত তুমি কারো কখনো পাওনি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও যাইবার জন্য নহে, এই ধরণের আলোচনায় ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই সে যেন অস্থির হইয়া পড়িত;—বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এম্‌নিই ছিল তাহার স্বভাব। কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, কমল, তোমাকে আমাদের দু'টো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ তো, দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই আমিই ভার নিয়েছি বল্‌বার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে,—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কোরে দু'জনেই পত্র দিয়েছেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, তাতে ওঁর লজ্জা কিসের?

নীলিমা কহিল, সে ওঁর মেয়ে বলে। এবং চিঠি পাবার পরে এই ক'টা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেছেন,—আগ্রায় এতলোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেননা কেন? জ্ঞানতঃ, কোনদিন কোন অন্যায় করেননি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ওঁর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেছে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বল্‌তে পারেননি, এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেছেন। বোধহয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পারো।

কমল উঁকি দিয়া দেখিল আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে; হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর ত এই, আর একটা?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিল না, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখুয্যে মশায়ের স্বাস্থ্যের জন্যে সকলেরই দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন; এবং পরে, দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও

জোর-জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন—এই মাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, এ দু'টোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে, আর একটা হবার জন্যে স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমাকে খুঁজ্‌ছিলেন কেন? এর কোনটাই তো আমি ঠেকাতে পারিনে।

নীলিমা কহিল, অথচ, ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি তো তোমাকে খুঁজিনি ভাই, কায়-মনে ভগবানকে ডাক্‌ছিলাম যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাঙ্‌লা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবোনা; কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী দু'টোই তো খুইয়েছি,—এর ওপর উপরি-লোক্‌সান যা ভাগ্যে ঘটেছে সে বিবরণ দিতে পারবোনা,—এখন ভগ্নী-পতির আশ্রয়টাও ঘুচ্‌লো। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল,—দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই,—যে-ক'টা দিন এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তার পরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সাম্‌নে আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বোল্‌ব, না পাই মরবো। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জ্জনার মত আর ঘাটে-ঘাটে ঠেক্‌তে-ঠেক্‌তে আয়ুর শেষ দিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবোনা। বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারি হইয়া আসিল, কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাস্‌লে যে?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ ব'লে।

নীলিমা বলিল, সে জানি। কিন্তু আজ-কাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও,—সেই তো আমার ভয়।

কমল কহিল, হোলাম বা অদৃশ্য। কিন্তু দরকার হলে আমাকে খুঁজতে যেতে হবেনা দিদি, আমিই পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন্।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এম্‌নি কোরে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ওঁর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন কি আমি করতে পারি।

তোমাকে কিছুই করতে হবেনা কমল, যা করবার আমি নিজেই কোরব। আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্ত্তব্যে অপরাধ না করি। এ বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারিনে তাই নয়, ঘটতে দিতেও পারিনে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন। কিন্তু বিবাহ ঘটতে দেবেননা কি কোরে? মেয়ে তো আপনার বড় হয়েছে।

আশুবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেননা, কারণ, অস্বীকার করার যো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশি পাক্ খাইয়াছে। বলিলেন, তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায়না! শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল, সম্পত্তিটাও নিজের। আশুবদ্দির দুর্ব্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে,—সেটা লোকে ভুলেছে।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে দিকটা যেন লোকে ভুলেই থাকে আশুবাবু। কিন্তু তাও

যদি না হয়, সে পরিচয়টা কি সর্ব্বাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই ?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে। এই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ এক-মাত্র সন্তান, কি কোরে যে মানুষ করেছি সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃ-হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি তাঁকে পর্য্যন্ত উপহাস করবে। তা'ছাড়া তুমি বুঝ্‌বেই বা কি ক'রে ? কিন্তু পিতার স্নেহই ত শুধু নয়, কমল, তার কর্ত্তব্যও তো আছে ? শিবনাথকে আমি চিন্‌তে পেরেছি। তার সর্ব্বনেশে-গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে পারি এ ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়েনা। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দ্দকও আশা করে।

কিন্তু এ চিঠি যদি তাঁরা বিশ্বাস করতে না পারে ? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশি দিন থাক্‌বেনা,—সেদিন নিজের অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন,—তাহ'লে ?

তাহ'লে তারা তার ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, কিন্তু বিশ্বাস করার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি সত্যিই স্থির করেছেন ?

হাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্‌গ্রীব-প্রতীক্ষায় আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ ক'রে রইলে যে কমল, জবাব দিলেনা ?

কই, প্রশ্ন তো কিছুই করেননি ? সংসারে একের সঙ্গে অপরের

মতের মিল না হলে যে শক্তিমান, দুর্ব্বলকে সে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকে চলে আস্‌চে। এতে বল্‌বার কি আছে?

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহিলনা, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল? সন্তানের সঙ্গে পিতার তো শক্তি-পরীক্ষার সম্বন্ধ নয়-যে দুর্ব্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি? কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে; তবুও যে এতবড় কঠোর সঙ্কল্প করেছি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো বলেই তো? সত্যিই কি এ তুমি বুঝ্‌তে পারোনি?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেছি। কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে। কিন্তু, দুঃখ নিবারণ করতে পারলেননা বলে কি রাগ কোরে তার দুঃখের বোঝা সহস্র গুণে বাড়িয়ে দেবেন?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয়। যে-লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেছেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় কোরে বিসর্জ্জন দেবেন,—ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেননা?

আশুবাবু বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁর মুখে আসিলনা,—শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এম্‌নি ভাবে কাটিবার পরে তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন,—ফেরবার পথ এখনি আছে কমল, পরে নেই। স্বামী ত্যাগ কোরে যে-ফেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখ্‌তে হয়।

কমল কহিল, এ অন্যায়। বরঞ্চ, আমি কামনা করি ভুল যদি

কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেন না সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে। এম্নি কোরেই মানুষে আপনাকে শোধ্‌রাতে শোধ্‌রাতে আজ মানুষ হতে পেরেছে। ভুলকে তো ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্যদিকের পথ খোলা থাকে। সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেক্‌চে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার সীমা নেই।

মনোরমা কন্যা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দিগ্ধ দুর্গতি কমলের সকল আবেদন বিফল করিয়া দিল, শুধু অসংলগ্ন মিনতির স্বরে কহিলেন, না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়েনা। কোন উপায়ই কি তুমি বলে দিতে পারোনা?

আমি? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল। এবং, ইহাই স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধ কণ্ঠ মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যই। নীলিমার প্রতি চোখ পড়িতেই আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, না, এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবোনা। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কি না জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বোল্‌ব যে খাইয়ে-পরিয়ে, ইস্কুল-কলেজে বই মুখস্ত করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেছেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেননি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি আজ দৈবাৎ এসে পড়ে থাকে, আমি হন্তারক হতে যাবো কিসের জন্যে?

কথাটা আশুবাবুর ভালো লাগিলনা, কহিলেন, তুমি কি তাহলে বল্‌তে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়?

কমল কহিল, অন্ততঃ, ভয় দেখিয়ে নয় এইটুকুই বল্‌তে পারি। আমি আপনার মেয়ে হলে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ জীবনে আর

কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতামনা। আমার বাবা আমাকে এই ভাবেই গড়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় কমল, তোমার কল্যাণের পথ তিনি এই দিকেই দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পাইনে। তবু, আমিও পিতা। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালোবাসা দিতে পারে না,—এ তার মোহ। এ মিথ্যে। এই ক্ষণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে সেদিন মণির দুঃখের অন্ত থাক্‌বেনা। কিন্তু তখন তাকে বাঁচাবে কিসে?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাব্‌না ছিল, কিন্তু সে-ঘোর কেটে গিয়ে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষে ক'রবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এ সব কথার মার-প্যাঁচ কমল,—যুক্তি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় কোরেই পেতে হবে,—ওকালতির জোরে তার থেকে অব্যাহতি মিল্‌বেনা।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করিনি আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই,—মণি কাউকে ঠকাতে যায়নি,—ভুল ভেঙে সে যদি ফিরে আসে, তাকে মাথা হেঁট করে আস্‌তে হবেনা এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবু তো ভরসা পাইনে কমল। জান, ভুল তার ভাঙ্‌বেই, কিন্তু তারপরেও যে তাকে দীর্ঘ দিন বাঁচতে হবে,—তখন সে থাক্‌বে কি নিয়ে? বাঁচ্‌বে কোন্ অবলম্বনে?

অমন কথা আপনি বল্‌বেননা। মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ

পাওয়ার শেষ কথা হোতো, তার মূল্য ছিলনা। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের মস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ কোরে তোলে, নইলে, আমিই বা আজ বেঁচে থাকতাম কি কোরে? বরঞ্চ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন ভুল যদি ভাঙে, তখন যেন সে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্ত ক'রে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও ঢের বেশি বাধিল। বহুক্ষণ পরে বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার দেখতে পাই। তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্ত্তব্য?

আমি মা হলে মেনেই নিতাম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত কষ্ট পেতাম, তবু এই উপায়ে বাধা দেবার আয়োজন কোরতামনা। মনে মনে বোলতাম, এ জীবনে যে-রহস্যের সামনে এসে আজ সে দাঁড়িয়েছে সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝতে পারলামনা কমল। শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ বাড়ীতে আসতে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সন্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে তো যথার্থ ভালোবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ;—এ মিথ্যে যেমন কোরে হোক্ নিবারণ করাই পিতার কর্ত্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতিগত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা, এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত

আলোচনা একেবারেই সম্পূর্ণ বিফল হইল। যেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবেনা, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিতবোধ, সেই ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনীয়ার ডাকা। অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালোবাসার ফল বাহির করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি লোকান্তরিত, তথাপি আজিও হয়ত তাহার মূল অন্তরে শিথিল হয় নাই,—সংসারে ইহার তুলনা বিরল,—এ সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন জাতীয়।

ইহার ভালো-মন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করার মত নিষ্ফলতা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটা দিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্ব্বিঘ্ন শান্তি ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত-জীবন কাটিয়াছে তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধ-চিত্তে ইহার স্তবগান করিয়াছে, এমনি দুর্ল্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছে, স্বকীয় জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুলিত বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাহার নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাহাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন্ স্পর্দ্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগার হাতে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে সে উদ্যত, তাহার সব-কিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃখময় পরিণাম-চিন্তায় পিতা শঙ্কিত, বন্ধুগণ বিষণ্ণ, কেবল সে-ই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ বিবাহে সম্মান নাই, শুভ নাই, বঞ্চনার 'পরে ইহার ভিত্তি, এই স্বল্পকাল ব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই

রহিবেনা,—হয়ত এ সবই সত্য,—কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে বস্তু বাকি থাকিবে সে যে পিতার শান্তি-সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড় এ কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটাই যাহার কাছে মূল্য-নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একবার ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কন্যার চিত্তাকাশে মুহূর্ত্ত উদ্ভাসিত তড়িৎ-রেখাও হয়ত পিতার অনির্ব্বাপিত দীপ-শিখাকেও দীপ্তির পরিমাপে অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় অধীর হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরুত্তর নতমুখে তেম্‌নি বসিয়া আছে,—বেশ বুঝা গেল এ লইয়া সে আর বাদানুবাদ করিতে চাহেনা। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু এমন করিয়া একজনে মৌনাবলম্বন করিলে তো অপরের মন শান্তি মানেনা। বস্তুতঃ, এই প্রৌঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহার মুখে যাই কেননা বলুক, জোর আছে বলিয়াই উদ্ধত স্পর্দ্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা। কমলকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই তাঁহার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। লোকচক্ষে সে হেয়, নিন্দিত; ভদ্র-সমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটেনা, অথচ, এই মেয়েটির নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই তাঁহার সঙ্কোচ ঘুচেনা।

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তবু তুমি কখনো সেদেশে যাওনি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক-কিছু চোখে দেখেচি। অনেক ভালোবাসার বিবাহ-উৎসবে

যখন ডাক পড়েছে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, আবার সে-বিবাহ যখন অনাদরে-উপেক্ষায় অনাচারে-অত্যাচারে ভেঙেছে তখনও চোখ মুছেচি। তুমি গেলেও ঠিক এম্‌নি দেখ্‌তে পেতে।

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখ্‌তে পাই আশুবাবু। ভাঙার নজির সেদেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠ্‌চে,—উঠ্‌বারই কথা,—এও যেমন সত্যি, ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝ্‌তে যাওয়াও তেম্‌নি ভুল। ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয় আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলেনা; বলিলেন, সে যাক্‌, কিন্তু আমাদের এই দেশটার পানে একবার ভালো কোরে চেয়ে দেখো দিকি। যে-প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আস্‌চে তার সৃষ্টিকর্ত্তাদের দূরদর্শিতা। এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের 'পরে নেই, আছে বাপ মা গুরুজনদের পরে। তাই বিচার-বুদ্ধি এখানে আকুল-অসংযমে ঘুলিয়ে ওঠেনা, একটা শান্ত অবিচলিত মঙ্গল তাদের চির-জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি তো মঙ্গলের হিসেব করতে বসেনি, আশুবাবু, সে চেয়েছে ভালোবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের সুযুক্তি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানেনা। কিন্তু তর্ক ক'রে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্যক্ত করচি; যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্য্যের প্রত্যুষের আবির্ভাব দেখ্‌তে পায়না, দেখ্‌তে পায় শুধু তার প্রদোষের অবসান। কিন্তু সেই চেহারা আর রঙের সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাক্‌লে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসায় পৌঁছুবেনা। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্চে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এত ক্ষণের এত কথার মধ্যে

একটি কথাও যোগ করে নাই, এখন কহিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারিনি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করচি যে, ঘরের অন্যান্য জানালা গুলোও খুলে দেওয়া চাই। এ তো চোখের দোষ নয়,—দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে, যে-দিকটা খোলা আছে সে দিকে দাঁড়িয়ে আমরণ চেয়ে থাক্‌লেও এ ছাড়া কোন কিছুই কোনদিন চোখে পড়বেনা।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়োনা কমল, আর একটুখানি বোসো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই;—অবিশ্রাম বুকের ভেতরটায় যে কি করচে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবোনা। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝ্‌তে পারি। তুমি কি যথার্থ-ই বোল্‌চ আমি চুপ করে থাকি, আর এই কুশ্রী ব্যাপারটা হয়ে যাক্‌?

কমল বলিল, মণি যদি তাঁকে ভালোবেসে থাকে আমি তা কুশ্রী বল্‌তে পারিনে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশোবার বোঝাতে চাচ্চি, কমল, এ মোহ, এ ভালোবাসা নয়,—এ ভুল তার ভাঙবেই।

কমল কহিল, শুধু ভুলই যে ভাঙে তা' নয়, আশুবাবু, সত্যিকার ভালোবাসাও সংসারে এম্‌নি ভেঙে পড়ে। তাই, অধিকাংশ ভালোবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী। এই জন্যেই ও-দেশের এতো দুর্নাম, এতো বিবাহ ছিন্ন করার মাম্‌লা।

শুনিয়া আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বলো কমল, তাই বলো। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখে এসেচি।

নীলিমা অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ দেশের বিবাহ-প্রথা? তাকে তুমি কি বলো? সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙেনা কমল?

কমল কহিল, ভাঙবার কথাও নয় আশুবাবু। সে তো অনভিজ্ঞ-যৌবনের ক্ষ্যাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়,—চোখ-চেয়ে, পাকা-লোকের যাচাই-বাছাই-করা খাঁটি জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ্ না থাক্‌লে তাতে সহজে ফাটল্ ধরেনা। এদেশ-ওদেশ সব দেশেই সে ভারি মজ্‌বুত—সারাজীবন বজ্রের মত টিকে থাকে।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইলনা।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, কমল, তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার ভালোবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকি থাক্‌বে কি?

কমল বলিল, যে-স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শান্তি ও সুখের সীমা ছিলনা, কিন্তু তার বেশি ওঁর পুঁজি নেই। ভাগ্য যাঁকে ঐটুকু মাত্র দিয়েই বিদায় করেছে আমরা তাঁকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কি করতে পারি দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল, লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে বুঝি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকেনা, দু'হাত দিয়ে পথ আগ্‌লাতে চায়, নিশ্চয় জানে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়েও যা' হাতে থাকে মাণিক্যের মত তা' হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা' দিয়ে শোভাযাত্রা করা

যায়না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে,—বলে ঐ তো সর্ব্বনাশ।

নীলিমা বলিল, বলার হেতু আছে কমল। মণিমাণিক্য সকলের জন্যে নয়, সাধারণের জন্যেও নয়। আপাদ-মস্তক সোনা-রূপোর গয়না না পেলে যাদের মন ওঠেনা, তারা তোমার ঐ এক কৌটা হীরে-মাণিকের কদর বুঝ্‌বেনা। যাদের অনেক চাই তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অনেক ভার, অনেক আয়োজন, অনেক যায়গা দিয়েই তবে জিনিসের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্য্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে কমল, এ আলোচনা থাক্।

আশুবাবুর মুখ দিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ, চুপ করেই নাহয় থাক্‌বো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেননা। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভ-বুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারেনা। ওর পক্ষে যা সত্যি, মণির পক্ষে তা সত্যি না-ও হতে পারে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক্, বেলার স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই আমি জোর করে বল্‌তে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই স্বামীর দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দু'টো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক কোরে তার ঠিকানা মেলেনা।

কমল নীরবে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্য্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে যাওয়াটাও এম্‌নি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালো-

বাসার সবটুকু হোতো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠ্‌তোনা,—কিন্তু তা' নয়। আমি বই পড়িনি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক কোরে তোমাকে বোঝাতে পারবোনা, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস,—কাড়া-কাড়ি কোরে এদের পাওয়া যায়না, অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে, কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ণ-ধী কমল এক নিমিষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোকে নীলিমার এলো-মেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ সিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া গেছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্য্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অস্ত-গমন, এ জিজ্ঞাসা বৃথা,—আরক্ত আভায় আকাশের যে দিকটা আজ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে,—পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক্‌-নির্ণয় না করিয়াই সে ইহারই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই তিন পরে আশুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ্‌বো, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও তুমি এ ভাবে অবজ্ঞা কোরোনা। বহু বহু মানবেই একে সত্য বলে স্বীকার করেছে,—মিথ্যে দিয়ে কখনো এত লোককে ভোলানো যায়না।

কমল অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা' দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়াটাই

বুদ্ধি বাড়ার প্রমাণ নয় দিদি। একদিন যারা বলেছিলো নর-নারীর ভালোবাসার ইতিহাসটাই হচ্চে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল পুত্রের জন্যেই ভার্য্যার প্রয়োজন তারা মেয়েদের শুধু অপমান কোরেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ ক'রেছিল, এবং এই অসত্যের 'পরেই ভিত্ পুতেছিল ব'লে আজও এ দুঃখের কিনারা হোলোনা।

কিন্তু এ কথা আমাকে কেন কমল?

কারণ, আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে, চাটু-বাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারী জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে-কোন অবস্থাই অঙ্গীকার করুন দিদি, এই মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মেনে নেবেননা। এই আমার শেষ অনুরোধ। কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আশুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন,—কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বই কি কমল। কিন্তু সে তো মনিবের ফরমাস মতো কাটা ছাঁটা মানান্ করা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক,—চোখের আড়ালে শিরের মধ্যে দিয়ে বয়। তাই, বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক্, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচেনা।

কমল কাছে আসিয়া আশুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া

আস্তে আস্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেননা তা' বলে দিচ্চি।

আশুবাবু কিছুই বলিলেননা, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরিজিতে Emancipation বলে একটা কথা আছে; আপনি তো জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়াও তার একটা বড় অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরি করেনি, করেছিল আপনাদের মতো যাঁরা মস্ত বড় পিতা,—নিজেদের বাঁধন-দড়ি আল্‌গা কোরে যাঁরা সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন,—তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যান্‌-সিপেশনের জন্যে যত কোঁদলই মেয়েরা করিনে কেন, দেবার আসল মালিক যে আপনারা,—আমরা নই, জগৎ-ব্যবস্থায় এ সত্যটা আমি একটি দিনও ভুলিনে আশুবাবু। আমার নিজের বাবা প্রায়ই বল্‌তেন, পৃথিবীর ক্রীত-দাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল সেদিন মনিবের জাতেরাই,—নইলে, দাসের দল কোঁদল কোরে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জ্জন করেনি। এম্‌নিই হয়। বিশ্বের এম্‌নিই নিয়ম; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্ব্বলকে ত্রাণ করে। তেম্‌নি, নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব তো তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে। মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে তো সন্তানের মুক্তি থাকেনা, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেননা। এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্য্যাদার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই লজ্জাকর দুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের সীমা নাই।

যে-লোকটি তাহার পিতা তাহাকে তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইহারই উদ্দেশে দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মত বিঁধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্ব্বকালের মত বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন। কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো।

ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

২৫

শীতের সূর্য্য অস্ত গেল। সায়াহ্ন-ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপ্‌সা হইয়াছে, একটা জরুরি সেলাইয়ের বাকিটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্ব্বেই সারিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধ হয় কি-একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা-শিবনাথের ব্যাপারটা বন্ধু-মহলে জানা-জানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা সুরু হইয়াছে সেই লইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এম্‌নিই একটা-কিছু যে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইবে, তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে কমল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলনা।

তাহার পরে হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া বকিয়া অবশেষে এমন যায়গায় আসিয়া থামিয়াছে যেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলেনা।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল যেন মাথা তুলিবার সময়টুকুও নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতক্ষণ কাটিবে স্থিরতা নাই, অতএব, অজিতকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইল, বলিল আশ্চর্য্য এই যে শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়লোনা!

কমল মুখ তুলিলনা, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ, তুমি এতই শাদা-সিধে যে কোন সন্দেহই করোনি, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

কেউ কি পারে-না পারে জানিনে, কিন্তু আপনিও কি পারবেননা?

অজিত বলিল, হয়ত পারি,—কিন্তু সে তোমার মুখের পানে চেয়ে —এম্‌নি পারিনে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তা'হলে চেয়ে দেখুন, বলুন, পারেন কি না।

অজিতের চোখের দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, তোমার কথাই সত্যি। তাকে অবিশ্বাস করোনি বলেই তার ফল দাঁড়ালো এই!

দাঁড়িয়েছে মানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করার সুফল কি পরিমাণ হাতে পেলেন সেটাও খুলে বলুন? এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কাজে মন দিল।

ইহার পরে, অজিত সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনেরো

অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না। হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা বল্‌তে জানোনা?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালোবাসে,—ওটা স্বভাব।

তা'হলে সে স্বভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। স্পষ্ট বল্‌তে একটু শেখো, নইলে সংসারে কাজ চলেনা।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝ্‌তে একটু শিখুন, নইলে, ও-পক্ষের অসুবিধেও এম্‌নি হয়। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট করিয়া টুক্‌রিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশি, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হলে লেখে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর, নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা' প্রকাশ পেলেনা হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালোবাসলে যে কি করে সেইটে শুধু জানিনে। কিন্তু একটু বসুন, আমি আলোটা জ্বেলে আনি। এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং, তাদের হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে পারবোনা, কিন্তু তাঁরা ভালোবাসলে কি করে জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটেনা,—স্পষ্ট, পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্ত্তমানে অন্যের খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্যে বাড়ী-ওয়ালার শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েছে, হয়েছে। হাসিয়া

বলিল, অর্থাৎ, তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট, মজবুত কোরে গ'ড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত রাখেনা। তারা সাধু লোক।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অনুরোধ আসিল,—আমরা ভেতরে আসতে পারি ?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রর। কিন্তু আমরা কারা ?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটি দিন মাত্র দেখেচো, তবু আশা করি তাকে ভোলোনি ?

কমল হাসিমুখে কহিল, না। শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা শাদা, আজ হয়েছে হলদে।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণা মাত্র,—আর কিছু না। ও ৺কাশীধাম থেকে সদ্য প্রত্যাগত,—ঘণ্টা দুয়ের বেশি নয়। ক্লান্ত, তদুপরি ও তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়; তথাপি, আমি আসচি শুনে ও আবেগ সম্বরণ করতে পারলেনা। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য্য,—আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্ব্বাহ্লেই সমুপস্থিত। যাক্, আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি তো ভাঙচে, কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠ্‌লো বলে। এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং, দ্বিতীয় চৌকিটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, বসো। এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে

দ্বিধা করিতেছিল, হরেন্দ্র বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও সহাস্যে কহিল, বোসো হে সতীশ, জাত যাবেনা। কাশী ফেরৎ যত উঁচুতেই উঠে থাকো তার চেয়েও উঁচু যায়গা সংসারে আছে এ কথাটা ভুলোনা।

না, সে জন্যে নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁচা দেওয়া আপনার মুখে সাজেনা হরেনবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মোহন্ত-মহারাজও আপনি। ওঁরা বয়সেও ছোট, পাণ্ডাগিরিতেও খাটো। ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা। সুতরাং—

হরেন্দ্র কহিল, সুতরাংটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহান্ত ও মহারাজ হচ্চেন দুই বন্ধু সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের কাজ ছিল সাধ্যমত আমাকে না-মেনে চলা। একজনের তো পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশি তত্ত্ব-সঞ্চয় কোরে। ভয় হচ্চে ওর সঙ্গে সমান-তালে পা ফেলে চলতে হয়ত আর পেরে উঠ্‌বোনা। এখন ভাব্‌না কেবল ওই অর্দ্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী-কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোকে ও ফিরিয়ে এনেচে। ইতিমধ্যে আচার-নিষ্ঠার যে লেশমাত্র ত্রুটি ঘটেনি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেচি, শুধু ক্ষোভ এই যে, আর একটুখানি চেপে তপস্যা করালে ফিরে আসার গাড়ী ভাড়াটা আমায় আর লাগ্‌তোনা।

কমল ব্যগ্রার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা? আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কি একটা নাম আছে,—সতীশ জান্‌তেও পারে,—কিন্তু, আধুনিক-কালের আঁকা শুক্রাচার্য্যের তপোবনে কচের ছবি দেখেচো? দেখোনি? তা'হলে

ঠিকটি উপলব্ধি করতে পারবেনা। দোতালায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার তো হঠাৎ মনে হ'য়েছিল একদল কচ সার বেঁধে বুঝি স্বর্গ থেকে আশ্রমে এসে ঢুকচে। একটা ভরসা পেলাম, আমাদের আশ্রমটা ভেঙে গেলে তারা না-খেয়ে মারা যাবেনা দেশের কোন- একটা কলা-ভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্চেন, এ কি সত্যি ?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আমার সহ্য হয়না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য-বস্তুটিকে তুমি চিন্‌তেই পারোনা। সেইটি তোমাকে ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝ্‌বে কিনা সে তুমিই জানো, কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে আমি যাই করিনা কেন ওদের ভয় নেই। কারণ, চতুর্বিধ আশ্রমের কোন্ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সম্বাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রম নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই। কিন্তু ভারতের সত্য-বস্তুটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে সতীশবাবুর লাভ কি হবে ? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলিনি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুলতেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ কোরবনা। আমার আপত্তি শুধু ঐটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ায়। তাতে কার কি ক্ষতি ?

সতীশ বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবেনা।

কিন্তু তর্কের জন্যে নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে গোটাকয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবোনা ?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিলনা, বলিল, হরেনদা এইমাত্র তামাসা কোরে বল্‌লেন আমি কাশী ফেরৎ যত উঁচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উঁচু যায়গা সংসারে আছে। সে এই ঘর। আমি জানি, আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অবধি নেই,—আশ্রম ভাঙ্‌লে ক্ষতি হবেনা, কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল! সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভালো করেই জানেন, সে আমার বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল না থাকলে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারতোনা। তার মতো ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির মধ্যে দিয়ে স্বজাতির পরম কল্যাণ আমারও কাম্য। এরই আশায় ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ কোরে আমরা গড়ে তুল্‌তে চাই। নইলে মৃত্যুর পরে কল্প-কাল বৈকুণ্ঠ-বাসের লোভ আমাদের নেই। কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া তো কখনো সঙ্ঘ সৃষ্টি হয়না। আর শুধু ছেলেরাই তো নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেচি। কষ্ট ওখানে আছে,—থাক্‌বেই তো। বহু শ্রম কোরে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই তো আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের তো কিছু নেই!

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেনদার আশ্রম যাই হোক্ না কেন, সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা কোরবনা, কারণ, সেটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ার ভয় আছে। কিন্তু ভারতীয়-আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধা আছে এ তো অস্বীকার করা যায়না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম এ সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম্ম

নয়, জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ যুগেও সে উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত, হোমাগ্নি-প্রজ্বলিত, তপস্যা-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জাতি-জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল; সে প্রয়োজন আজও যে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এ সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকতার একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভালো এবং নিরন্তর বলিয়া বলিয়া একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাহার মৃদুকণ্ঠ সতেজ, ও উদ্দীপনায় কালো মুখ বেগুনে হইয়া উঠিল। সেই দিকে নিঃশব্দ ও নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদ-মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে যত মৌখিক আস্ফালনই করিয়া থাক্, আশ্রমের বিগত গৌরবের বিবরণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, হরেনদা, আমরা মরেছি, কিন্তু এই আশ্রমের মধ্যে দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম লাভের বিজ্ঞান আছে, এ সত্য ভুল্‌তে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আপনি ভাঙ্‌তে চাচ্ছেন, কিন্তু ভাঙাটাই কি বড়? গোড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশি বড় নয়? আপনিই বলুন?

কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? ক'টার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে?

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখিনি, এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই।

তবে?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায়? আপনাদের আশ্রমের শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্তু লাভের ব্যাপারটা যে আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করচেন।

তাহার ক্ষুব্ধ মুখের চেহারা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ, উপহাস নয়, উনি রহস্য করচেন মাত্র। ওটা ওঁর স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব! স্বভাব বল্‌লেই তো কৈফিয়ৎ হয়না হরেনদা। ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার তাকেই অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা দেখানো হয়। একে তো উপেক্ষা করা চলেনা।

হরেন্দ্র কমলকে দেখাইয়া কহিল, এ বিতর্ক ওঁর সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দায় নেই। বস্তু অতীত হয় কালের ধর্ম্মে, কিন্তু তাকে ভালো হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হয়ে ওঠেনা। যে বর্ব্বর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌তো, আজও যদি সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে সে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করতে চায় তাকে তো ঠেকানো যায়না, সতীশ।

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়ের সঙ্গে তো বর্ব্বরের তুলনা হয়না হরেনদা।

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেনদা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জানো আমি নাস্তিক নই। কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করাই যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায়না। শক্ত কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্ব্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, অপমান করিনি হরেনদা। আপনি তো জানেন, আপনাকে কত ভক্তি করি আমরা; কিন্তু কষ্ট পাই যখন শুনি ভারতের শাশ্বত তপস্যাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে-উপাদান যে-সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি, বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে-সত্য কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই, সেই ভারতের মজ্জাগত ধর্ম্ম,—সেই আমাদের আপন জিনিস। এই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট্ জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই বাঁচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না'ও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস,—এবং তার দাম শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই রকম কথার উত্তরেই কমল বলেছিলেন, জগতের আদিম যুগে একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ, বিরাট ক্ষুধা দিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল; তাই দিয়ে সে পৃথিবী জয় করে বেড়িয়েছিল,—সেদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান। কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধাই এনে দিলে তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিনের মিথ্যে উপাদান হয়ে তারে নিশ্চিহ্ন কোরে সংসারে মুছে' দিলে। এতটুকু দ্বিধা করলেনা। সে অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব্ব পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত ? তাঁদের তত্ত্ব-নিরূপণে সত্য ছিলনা ?

হরেন্দ্র বলিল, সেদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজ যদি যমের দক্ষিণ দোরে এনে হাজির করে দেয়, মুখ ভার করবার হেতু পাইনে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেন্‌দা, এ সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল ; আর কিছুই নয়।

হরেন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিক কালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে, আমি লজ্জার কারণ দেখিনে সতীশ।

সতীশ বহুক্ষণ নির্ব্বাক স্তব্ধ ভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার,—সহস্র লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি হরেনদা। ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের তো জয় হবেনা, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অনুভব করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু ; বলিল, সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হোতোনা যে ভাবের জন্যে, বিশেষত্বের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার সমাদর, মানুষের জন্যেই

তার দাম? মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়? নাই বা হোলো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় তো হবে? তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নর-নারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন তো নবীন তুর্কির দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরাগত পুরনো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরেছিল, ততদিনই তার হয়েছে বারম্বার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সে সত্যকে পেয়েছে,—তার সমস্ত আবর্জ্জনা ভেসে গেছে,—আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ, সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তারে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। ভেবেছিলো, তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বিগত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনেও করেনি তারও বিবর্ত্তন আছে। আজ সেই মোহ গেল মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠ্‌লো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরো হবে। সতীশবাবু, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-অহঙ্কার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েছে এও তো না হতে পারে? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এও তো সম্ভব?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস হবেও।

তবে?

কমল বলিল, তাতে ধিক্কার দেবার কিছু নেই। সতীশবাবু, মন্দ তো ভালোর শত্রু নয়, ভালোর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভালো,— সে। এইখানেই ভারতের ভয়। এবং, সেই আরো-ভালো যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজ-দণ্ড তুলে

দিয়ে ওকে স'রে যেতে হবে। একদিন শক, হুন, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারেনি,—তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকি রয়ে গেল ফরাসি-ইংরেজ এসে পড়লো বলে। সে মিয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে। সে প্রশ্ন থাক্, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগ্‌বে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বেনা, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির ওপর, তাদের কাছে এম্‌নি কোরে বল্‌তে থাক্‌লেই হবে সর্ব্বনাশ। এই বলিয়া হরেন্দ্রর প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এইভাবেই একদিন বাঙ্‌লায়,—সে বেশি দিন নয়—বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন, বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে কোরে সত্যভ্রষ্ট, আদর্শ-ভ্রষ্ট জনকয়েক অসম্পূর্ণ শিক্ষার বিজাতীয়-স্পর্দ্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপন তাকেই তুচ্ছ কোরে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত, কদাচারী করে তুলেছিল। কিন্তু এতবড় অকল্যাণ বিধাতার সইলনা, প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়লো। সেই বিষম দুর্দ্দিনে মনস্বী যাঁরা স্ব-জাতির কেন্দ্রবিমুখ, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তাঁরা শুধু দেশের নয়, সমস্ত ভারতের নমস্য। এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানে। সুতরাং হরেন্দ্র-অজিত উভয়েই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্যদের উদ্দেশে যখন নমস্কার

জানাইল তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিলনা। অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, নইলে, খুব বেশি লোকে হয়ত সে সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জন্যেই সেটা হ'তে পারেনি। কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাঁহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ, চুপ করিয়াই আছে। হয়ত জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিলনা। অজিতকে সে চিনিত,—কিন্তু হরেন্দ্রও যখন ইহারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকালপূর্ব্বের কথাগুলার সহিত এই সসঙ্কোচ জড়িমা এমনি বিসদৃশ শুনাইল যে, সে নীরবে থাকিতে পারিলনা। কহিল, হরেনবাবু, এক ধরণের লোক আছে তারা ভূত মানেনা কিন্তু ভূতের ভয় করে। একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। এমন অন্যায় আর কিছু হতেই পারেনা। এ দেশে আশ্রমের জন্যে টাকার অভাব হবেনা, ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘট্‌বেনা; অতএব, সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওঁকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া কহিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি, সে খোঁজ তিনিও করেননি, আমিও করিনি। তাঁর প্রয়োজন ছিলনা, আমার মনে ছিলনা। কামনা করি, ধর্ম্মকে যেন আমরণ এম্‌নি ভুলেই থাকৃতে পারি। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী ব'লে এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন, এবং নমস্য বলে যাঁদের নমস্কার করলেন, সর্ব্বনাশের পাল্লায় কার দান, ভারী, এ প্রশ্নের জবাব একদিন লোকে চাইতে ভুল্‌বেনা।

সতীশের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এঁদের নাম? কখনো শুনেছেন কারো কাছে?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে সেইটে আগে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জানাটাকেই জানার শেষ বলে আমি ভাবতে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া ত্বরিত-পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভান করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের, কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এইখানে হয় মানুষের ভুল। ওর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গোল বাধে। পেটের বত্রিশ নাড়িতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন-কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে দরদ। অকেজো বলে বাতিল করে দিতে ওর ব্যথা নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এ কথাটা ও বুঝতেই পারেনা।

কমল কহিল, পারি, শুধু দাম নেবার বেলাতেই একটার বদলে অন্যটা নিতে পারিনে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেবো আমি স্থির করেচি। ও-শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি,—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমার সন্দেহ জন্মেছে। কিন্তু, দীন-হীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘর-ছাড়া কোরে এনেছে তাদের নিয়ে যে কি কোরব আমি তাই ভেবে পাইনে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও তো তাদের পারবোনা।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই। কিন্তু এদের নিয়ে অসাধারণ, অলৌকিক কিছু-একটা কোরে তুল্‌তেও চাইবেননা। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে ; তারা যেমন কোরে তাদের বড় কোরে তোলে তেম্‌নি কোরেই এদের মানুষ কোরে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল, ঐখানে এখনো নিঃসংশয় হ'তে পারিনি কমল। মাষ্টার-পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখা-পড়া শেখাতে হয়ত পারবো, কিন্তু যে-সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মানুষ করা যাবে কি না সেই আমার ভয়।

কমল বলিল, হরেনবাবু, সকল জিনিসকেই অমন একান্ত কোরে আপনারা ভাবেন বলেই কোন প্রশ্নের আর সোজা জবাবটা পাননা। সন্দেহ আসে, হয় ওরা দেবতা গড়ে উঠ্‌বে, না হয়, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল, পশু হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রী আর চোখের সাম্‌নে থাকেনা। পরন্তু, মন-গড়া অন্যায়ের বোধের দ্বারা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত, মলিন কোরে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা' দেখে এসেচি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা ? ওরা পেয়েছে কি ? পেয়েছে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েছে অনধিকার, পেয়েছে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাদের দেশে জন্ম থেকে মেয়েদের পা ছোট করা হয়। পুরুষেরা তাকে বলে সুন্দর,—সে আমার সয়, কিন্তু মেয়েরা নিজেদের সেই পঙ্গু, বিকৃত পায়ের সৌন্দর্য্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয়, তখন আশা করার কিছু থাকেনা। আপনারা নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞেসা কোরলাম, বাবারা, কেমন আছো বলো ত ? ছেলেরা একবাক্যে বল্‌লে, খুব সুখে আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে,—এম্‌নি শাসন। নীলিমা দিদি আমার পানে চেয়ে বোধকরি উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক

চাপ্‌ড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ কথার জবাব খুঁজে পেলামনা। মনে মনে ভাব্‌লাম, ভবিষ্যতে এরাই আন্‌বে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে।

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক্, কিন্তু রাজেন, সতীশ এরা তো যুবক? এরাও তো সর্ব্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেননা, সুতরাং, সেও যাক্। কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই তো বেশি পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ কোরোনা কমল, কিন্তু তোমার রক্তে তো বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা ইয়োরোপিয়ান, তাঁর হাতেই তোমার শিশু-জীবন গড়ে উঠেচে। মা এ দেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভালো। দেহের রূপ ছাড়া বোধহয় সেদিক থেকে কিছুই পাওনি। তাই, পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় ব'লে জেনেচো।

কমল কহিল, রাগ করিনি হরেনবাবু। কিন্তু এমন কথা আপনি াবেননা। কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় কোরে নিয়ে কোন জাত কখনো বড় হয়ে উঠ্‌তে পারেনা। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেলো, ভোগও ছুট্‌লো। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম তো আর জগৎ ছাড়া নয়, সে বিধান উপেক্ষা কোরে কারও বাঁচবার জো নেই। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচকে হেসে আপনারাও বল্‌বার দিন পাবেন,—কেমন! বলেছিলাম ত! দিনকয়েকের নাচন-কোঁদন ওদের যে ফুরুবে সে আমরা জান্‌তাম। কিন্তু, চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি। বলিতে বলিতে সুবিমল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেই দিনই যেন আসে।

কমল কহিল, অমন কথা বল্‌তে নেই হরেনবাবু। অতবড় জাত যদি মাথা নীচু কোরে পড়ে, তার ধূলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দ্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরি আছে, কিন্তু নিজের দুর্দ্দিনের আভাস পাচ্চি। অনেক আলোই নিব-নিব হয়ে আস্‌চে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালাবার বিদ্যে শেখোনি। আচ্ছা, চোল্‌লাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি-উঠি করিল, কিন্তু উঠিলনা।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না প'ড়ে চোখের ওপর পড়লে থানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেভায়, তাকে বন্ধু বলে জান্‌বেন।

হরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময়ে মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুক্ষণে হয়েছিল। সে প্রত্যয়ের জোর আমার আর নেই, তবু বল্‌তে পারি, যত বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক্, ভারতের কাছে সে সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাসে প্রোমোশন না-পাওয়া ছেলের এম-এ পাশ-করাকে ধিক্কার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ ব'লে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই করা ব'লেও তেম্‌নি একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে। কিন্তু, এই ভারতই একদিন সকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্ব্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে ডালে বেড়াতো। আবার এই ভারতবর্ষই আর

একদিন জগতের সেই শিক্ষকের আসনই অধিকার করবে। করবেই করবে।

কমল রাগ করিলনা, হাসিল। বলিল, আজ তাঁরা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেছে। কিন্তু কোন্ মহা অতীতে একজনের পূর্ব্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল, এবং কোন্ মহা-ভবিষ্যতে আবার তার বংশধর পৈতৃক পেশা ফিরে পাবে এ আলোচনায় সুখ পেতে হলে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার। আজ আসি। বলিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

২৬

আট-দশ দিন পরে কমল আশুবাবুর বাটীতে দেখা করিতে আসিল। যাঁহাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাঁহাদের জীবনে এই কয়দিনে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেছে। অথচ, আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এলো-মেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল ; ইহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় ছিলনা,—ঘটিলও তাই।

ফটকের দরওয়ান অনুপস্থিত। বাটীর নীচের বারান্দায় সাধারণতঃ, কেহ বসিতনা, তথাপি, খানকয়েক চৌকী, মেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙানো ছিল, আজ সেগুলা অন্তর্হিত। শুধু, ছাদ হইতে লম্বমান কালি-মাখানো লণ্ঠনটা এখনও ঝুলিতেছে।

স্থানে-স্থানে আবর্জ্জনা জমিয়াছে, সেগুলা পরিষ্কার করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিলনা। কেমন একটা শ্রীহীন ভাব; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্নের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়াছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিলনা, পর্দ্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই; একটু বেশি মাত্রায় খুসি হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—কমল যে! এসো মা এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ঘা লাগিল,—এ কি? আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসিলেন,—বুড়ো? সে তো ভগবানের আশীর্ব্বাদ কমল। ভেতরে-ভেতরে বয়স যখন বাড়ে, বাইরে তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় টাক পড়ার মতই করুণ।

কিন্তু শরীরটাও তো ভালো দেখাচ্চেনা?

না।

কিন্তু, আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেমন আছো কমল?

ভালো আছি। আমার তো কখনো অসুখ করেনা কাকাবাবু।

তা' জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ, তোমার লোভ নেই। কিছুই চাওনা ব'লে ভগবান দু-হাতে ঢেলে দেন।

আমাকে? দিতে কি দেখলেন বলুন ত?

আশুবাবু কহিলেন, এ তো ডেপুটির আদালত নয় মা, যে প্রমাণ দিয়ে মামলা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক, তবু মানি, যে দুনিয়া

বিচারে নিজেও বড় কম পাইনি। তাইতো আজই সকালে থলি ঝেড়ে ফর্দ্দ মিলিয়ে দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌লাম, শূন্যের অঙ্কগুলোই এতদিন তহবিল ফাঁপিয়ে রেখেচে,—অন্তঃসারহীন থলিটার মোটা চেহারা মানুষের চোখকে কেবল নিছক ঠকিয়েছে,—ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোকে শুধু ভুল ক'রেই ভাবে, মা, গণিত-শাস্ত্রের নির্দ্দেশে শূন্যর দাম আছে। আমি তো দেখি কিচ্ছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটী হয়, শূন্যর সংখ্যাগুলো ভিড় করার জোরে শূন্য কোটী হয়ে ওঠেনা। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়া। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিলনা, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই তো যাবার সময় হোলো, কাল-পরশু যে চোল্‌লাম। বুড়ো হয়েছি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাব্‌তে ভরসা পাইনে। কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুল্‌বেনা!

কমল কহিল, না, ভুল্‌বোনা। দেখাও আবার হবে। আপনার থলিটা শূন্য ঠেক্‌চে বলে, আমার থলিটা শূন্য দিয়ে ভরিয়ে রাখিনি কাকাবাবু, তারা সত্যি-সত্যিই পদার্থ,—মায়া নয়!

আশুবাবু এ কথার জবাব দিলেননা, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যা বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো আছেন বটে, কিন্তু আপনার মনটা যে এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েছে তা বাড়ীতে ঢুকেই টের পেয়েছি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবেনা। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না, ওখানে নয়।

এবার একটুখানি দূরে যাবো কল্পনা করেচি। পুরনো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা করে যাবো। এখানে তোমারো ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে না পারি, তোমার মুখ থেকে কেউ-কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অনুদ্দিষ্ট সর্ব্বনামের উদ্দিষ্ট যে কে কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইলনা, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করিয়া বেদনা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবেনা। এই অকর্ম্মণ্য দেহটার দাম তো ভারি,—এটাকে বয়ে বেড়াবার অজুহাতে আমি মানুষের কাছে ঋণ আর বাড়াবোনা। কিন্তু কে জান্‌তো কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন কোরেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠ্‌তে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এত বড় বিস্ময়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাব্‌তে পেরেছে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমা-দিদিকে দেখ্‌চিনে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন—কাল সকাল থেকেই আর দেখ্‌তে পাইনি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে।

তাঁর আশ্রমে?

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার পাঁচ জন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয়নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই,

এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন কোরে গড়ে তুল্‌বে এই তার কল্পনা। তুমি শোনোনি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুন্‌বে।

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যাবেলায় ভদ্র-লোকেরা চলে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ কোরে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। কদিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড়-একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্ম্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পূর্ণ কোরে ফেলবার তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম,—হয়ত এই আমার শেষ উইল,—এটর্ণিকে দেখিয়ে নাম সইয়ের জন্যে এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্যান্য আদেশও ছিল। নীলিমা কি-একটা সেলাই করছিলো, ভালো-মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েচে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত শাদা। কি যে হোলো হঠাৎ ভেবে পেলামনা। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল চোখে-মুখে ঝাপ্‌টা দিলাম, পাখার অভাবে খবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম,—চাকরটাকে ডাক্‌তে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলোনা। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশি নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বস্‌লো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠ্‌লো, তারপরে উপুড় হয়ে আমার কোলের ওপর মুখ চেপে হুহু কোরে কেঁদে উঠ্‌লো। সে কি কান্না! মনে হোলো বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম,—কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়্‌লো,—আমার বুঝতে কিছুই বাকি রইলনা।

কমল নিঃশব্দে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

আশুবাবু একমুহূর্ত্ত নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট দুই তিন। এ অবস্থায় তারে কি যে বোল্‌বো আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়ালো, একবার চাইলেওনা, —ঘর থেকে বার হয়ে গেল। না বল্‌লে সে একটা কথা, না বোল্‌লাম আমি। তারপরে আর দেখা হয়নি।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কি আপনি আগে বুঝ্‌তে পারেননি?

আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কেউ হলে সন্দেহ হোতো এ শুধু ছলনা,—শুধু স্বার্থ। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চর্য্য মেয়েদের মন! এই রোগাতুর জীর্ণ দেহ, এই অক্ষম অবসন্ন চিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় জীবনের দাম যার কাণাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ, এ সত্য, এর এতটুকুও মিথ্যে নয়। এই বলিয়া এই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে, বেদনায় ও অকপট লজ্জায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করেনা। ও শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকি দিন ক'টা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা!

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ বিচ্ছেদের যখন মাম্‌লা আনে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিলো। তারপর থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলনা। নিজের স্বামীকে এম্‌নি ক'রে সর্ব্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ

কোরে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলেনা। ও বলে তাঁকে ত্যাগ করাটাই তো বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই স্ত্রীর পরম সার্থকতা। অপমানের শোধ নেওয়াতেই স্ত্রীর সত্যকার মর্য্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও তো কষ্টি-পাথর, ওতে যাচাই করেই ভালোবাসার মূল্য ধার্য্য হয়। আর এ কেমন-তরো আত্ম-সম্মান-জ্ঞান? যাকে অসম্মানে দূর করেছি তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুটলনা? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অন্যায়,—এ বাড়াবাড়ি। কিন্তু আজ ভাবি, ভালোবাসায় পারেনা কি? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই ওর সত্যিকার প্রাণ। ও যেখানে নেই, সেখানে ও শুধু বিড়ম্বনা। সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক, সেখানেই আসে আত্ম-মর্য্যাদা-বোধের টগ্-অফ-ওয়ার!

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তুমিই ওর আদর্শ,—কিন্তু, চাঁদের আলো যেন সূর্য্য-কিরণকে ছাপিয়ে গেলো। তোমার কাছে ও যা পেয়েছে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে কত দিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই দু'টো দিনে আমি দু'শো বচ্ছরের ভাবনা ভেবেচি, কমল। স্ত্রীর ভালোবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি, কিন্তু নারীর ভালোবাসার সে কেবল একটি মাত্র দিক্,—এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেছে। এর কত বাধা, কত ব্যথা,—আপনাকে বিসর্জ্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলামনা বটে, কিন্তু কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাইনে, মা।

কমল বুঝিল, পত্নী-প্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে-সকল দিক আঁধার করিয়াছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

আশুবাবু বলিলেন, ভালো কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙাতে দেবোনা। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবেনা। অনুমতি দিতে তো পারবোনা, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্ব্বাদটুকু রেখে যাবো দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল-ভ্রান্তি-ভালোবাসা,—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

এম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অনেক পরে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমা দিদির সম্বন্ধে কি স্থির করলেন?

আশুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন,—কিসে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল; বলিলেন, দেখো মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারিনি, এখনো পারবোনা। হয়ত আজ আর সামর্থ্যও নেই। কিন্তু এখনো এ সংশয় আসেনি যে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালোবাসাকে সন্দেহ করিনি, কিন্তু সেও যেমন সত্যি, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও আমার তেমনি সত্যি। কোনমতেই একে নিষ্ফল আত্ম-বঞ্চনা বল্‌তে পারবোনা। এ তর্কে মিল্‌বেনা, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্যে দিয়েই মানুষে এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু যাবেই। সে আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু এতবড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথ্যে,—সৃষ্টি মিথ্যে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা,—কোন মানুষেরই যে

অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়াবার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার বাকি দিনগুলোকে শূলের মতো বিঁধবে। ভাবি, সে আর যদি কাউকে ভালোবাসতো। এ তার কি ভুল!

কমল কহিল, ভুল সংশোধনের দিন তো তার শেষ হয়ে যায়নি কাকাবাবু।

কি রকম? সে কি আবার কাউকে ভালোবাসতে পারে তুমি মনে করো?

অন্ততঃ, অসম্ভব তো নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘট্‌তে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে কোরেছিলেন?

কিন্তু নীলিমা? তার মত মেয়ে?

কমল কহিল, তা' জানিনে! কিন্তু যাকে পেলেনা, পাওয়া যাবেনা, তাকেই স্মরণ কোরে সারাজীবন ব্যর্থ নিরাশায় কাটুক—এই কি তার জন্যে আপনি প্রার্থনা করেন?

আশুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, সে প্রার্থনা করিনে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবেনা, কমল। আমি যা পারি, তুমি তা' পারোনা। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়,—একান্ত বিভিন্ন। এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেছে তাদের অপেক্ষা করা চলেনা,—balance of yarning—তৃষ্ণার শেষ বিন্দু জল তাদের নিঃশেষে পান কোরে না নিলেই নয়; কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত,—উপুড় হয়ে শুষে খাবার প্রয়োজনই হয়না।

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, এ কথা মানি কাকাবাবু। কিন্তু, তাই বলে তো আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মান্‌তে পারবোনা; আকাশ-

কুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তর কাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না। যে-জীবনকে সবার মাঝখানে সহজবুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে-শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভ'রে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহকালকে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এম্‌নি কোরেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ কোরে দিয়েছে। নীলিমা দিদির দেখা পাবো কিনা জানিনে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাবো।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন,—যাচ্চো মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার কোরে ওঠে।

কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে তো আমি কোন দিক থেকেই ভরসা দিতে পারিনে। দেহে-মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেওয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সব-ন দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারও চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালোবাসিনে কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা'ছাড়া নীলিমা, এই কি সহজ বিস্ময়! কিন্তু এর কারণ কি জানো কমল?

কমল স্মিত-মুখে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরাবালি নেই,—তাই। চোরা-বালি নিজের দেহেরও ভার বইতে পারেনা, পায়ের তলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়। কিন্তু নিরেট মাটি লোহা, পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার ওপরেই

চলে। নীলিমা দিদিকে সব মেয়েতে বুঝ্‌বেনা, কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাবিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায় তারা ওঁকে বুঝ্‌বে।

হুঁ, বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, যেদিন থেকে তাঁকে সত্যি কোরে বুঝেছি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে,—জ্বালা নিভেচে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী,—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। এই কথাই তো তাজের সুমুখে দাঁড়িয়ে সেদিন বল্‌তে চেয়েছিলাম। মেয়েরা শুধু উপলক্ষ,—নইলে, ওরা ভালোবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে দ্রু-ভাগ কোরে নিয়ে চলে ওদের দু'দিনের লীলা,—তারপরে সেটা ফুরোয় বলেই সুর গলায় ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে,—নইলে বাজ্‌তো না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেতো। আমি তো জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায়নি, মণি আপনি ভুলেছে। সূর্য্যাস্ত-বেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ্ ফোটে কাকাবাবু, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়, কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বল্‌বে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ্ নিয়েও মানুষের দিন চলেনা, মা, উপমা দিয়েও তার ব্যথা ঘোচেনা। তার কি বলো ত?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাইতো ঘুরে-ঘুরে একটা প্রশ্নই বারে বারে আস্‌চে কাকাবাবু, শেষ আর হচ্ছেনা। বরঞ্চ, যাবার সময়ে আপনার ওই আশীর্ব্বাদটুকুই রেখে যান, মণি যেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা' ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিন্‌তে পারে। আর

আপনাকেও বলি,সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, —তার বেশি নয়। ওটাকেই নারীর সর্ব্বস্ব বলে যে দিন মেনে নিয়েছেন সেই দিনই সুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি। দেশান্তরে যাবার পূর্ব্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান, কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌ ঠাকরুণকে আমি নিয়ে যেতে এসেচি, আশুবাবু, উনি প্রস্তুত হয়েছেন,—আমি গাড়ী আনতে পাঠিয়েচি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখুনি? কিন্তু বেলা তো নেই?

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূর নয়, মিনিট পাঁচেকেই পৌঁছে যাবেন।

তাহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমন নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা' বটে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়,—আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন।

উনি লিখেছেন, "ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার উপায় যদি না করতে পারো আমাকে জানিয়ো। কিন্তু কাল বোলোনা যে আমাকে জানাননি কেন? নীলিমা।"

আশুবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট আত্মীয় ব'লে আমি দাবি করতে পারিনে,

কিন্তু ওঁকে তো আপনি জানেন, এ চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয়না।

তোমার বাসাতেই তো থাক্‌বেন ?

হাঁ,—অন্ততঃ, এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাব্‌লাম, এ বাড়ীতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে ও-বাড়ীতেও দোষ হবেনা।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ কথা বলিলেননা যে এতকাল এ সুযুক্তি ছিল কোথায় ? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেম-সাহেবের জিনিস-পত্রের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাওগে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ-বাড়ী থেকে বেলা চলে গেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী ওঁর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে দিতে ভুলেছি, কমল। বেলার স্বামী এসেছেন নিতে,—বোধ হয় ওঁদের একটা reconciliation হোলো।

কমল কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলনা, শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেননা যে ?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্ম-গরিমায় বাধ্‌লো। যখন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার মাম্‌লা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারেনি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন ?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হোচ্চ কেন কমল ? চরিত্র দোষে যে-স্বামী অপরাধী তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখিনে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই এমন কথা আমি মান্‌তে পারিনে।

কমল নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই

—অন্তর ও বাহির একই সুরে বাঁধা—এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিলনা, কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিলনা।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কমল তেম্‌নি ভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্ত্তা কিছুই হইলনা। যাবার পূর্ব্বে আস্তে আস্তে বলিল, শুধু যদু ছাড়া এ বাড়ীতে পুরনো কেউ আর রইলনা।

যদু ?

হাঁ, আপনার পুরনো চাকর।

কিন্তু সে তো নেই মা। তার ছেলের অসুখ, দিন পাঁচেক হোলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হইলনা। আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই রাজেন ছেলেটির কোন খবর জানো, কমল ?

না, কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয়। তোমরা দু'টিতে যেন ভাই বোন্, যেন একই গাছের দু'টি ফুল এই বলিয়া তিনি চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকা-কড়ি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ অপরিমিত,—কোথায় যেন অন্যমনস্কে সে সব ফেলে এয়েচো। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই,—এম্‌নি তাচ্ছিল্য।

কমল সহাস্যে কহিল, সে কি কাকাবাবু। রাজেনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি দু-পয়সা পাবার জন্যে দিনরাত কত খাটি।

আশুবাবু বলিলেন, সে শুন্‌তে পাই। তাই, ব'সে ব'সে ভাবি।

ফিরিতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন,

ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকেনি, আজও সে ছেড়ে থাক্‌বেনা। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল সহজে উপরে যাইবার যো নাই, রাশিকৃত বাক্স তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়। বুকের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া শুনিল পাশের রান্নাঘরে কলরব হইতেছে; উঁকি মারিয়া দেখিল অজিত হিন্দুস্থানী মেয়ে লোকটির সাহায্যে ষ্টোভে জল চড়াইয়াছে, এবং চা-চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দ্দিকে আতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—চা, চিনি কি তুমি লোহার-সিন্দুকে বন্ধ কোরে রাখো না কি? জলটা ফুটে-ফুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এলো।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন? সরে আসুন, আমি তৈরি ক'রে দিচ্চি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার? বাক্স-তোরঙ্গ-পোঁট্‌লা-পুঁটলি,-এ সব কার?

আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েছেন।

দিলেও যাবারই নোটিশ দিয়েছেন। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতেই দিন কেটেছে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বার করেছি।

কমল কহিল, বেশ করেছেন। কিন্তু ওগুলো কি নীচেই পড়ে থাক্‌বে ? চুরি যাবে যে।

শুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—যায়নি তো। একটা চামড়ার বাক্সে অনেকগুলো টাকা আছে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভালো। এক জাতের মানুষ আছে তারা আশি বচ্ছরে সাবালক হয়না। তাদের মাথার ওপর অভিভাবক একজন চাই-ই। এ ব্যবস্থা ভগবান কৃপা করে করেন। চা থাক্‌, নীচে আসুন। ধরা-ধরি কোরে তোলবার চেষ্টা করা যাক্‌।

২৭

বাড়ী-য়ালা এইমাত্র পূরা-মাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিস-পত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাম্বিশের ইজি-চেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। মুখ শুষ্ক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত মনের মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই। কমল বাঁধা ছাঁদা জিনিসগুলার ফর্দ্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতেছিল। স্থান-ত্যাগের আসন্নতায় কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই,—যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশি নীরব।

সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ আসিল হরেন্দ্রর নিকট হইতে। লোকের হাতে নয়,—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায়-উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেককেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা,—কমল, নিশ্চয় এসো ভাই। নীলিমা।

অজিত সেইটুকু দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, যাবে না কি ?

যাবো বই কি। নিমন্ত্রণ জিনিসটা তুচ্ছ করতে পারি আমার এত দর নয়। কিন্তু তুমি ?

অজিত দ্বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাব্চি। আজ শরীরটা তেমন—

তবে, কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখ তখনো চিঠির 'পরে ছিল। নইলে কমলের ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাস্যের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক্, বাঙালী-মহলে খবরটা জানাজানি হইয়াছে যে উভয়ে আগ্রা ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কি ভাবে ও কোথায় এ সম্বন্ধে লোকের কৌতুহল এখনো সুনিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছে নাই। অকালের মেঘের মত কেবলি আন্দাজ ও অনুমানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ, জানা কঠিন ছিলনা,—কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত তাহাদের গম্য স্থানটা আপাততঃ অমৃতসর। কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখেদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা-কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙ্লো-বাড়ী তৈরি করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাড়ীটা ভাড়ায় খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে ; এই বাটীতেই দু'জনে কিছুকাল বাস করিবে। মাল-পত্র যাইবে লরিতে, এবং পরে, শেষ-রাত্রে মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথম দিনের স্মৃতি,—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, হরেনের ওখানে তুমি কি একা যাবে নাকি ?

যাইনা। আশ্রমের দোর তো তোমার খোলাই রইলো, যবে খুশি

দেখা ক'রে যেতে পারবে। কিন্তু আমার তো সে আশা নেই,—শেষ দেখা দেখে আসিগে,—কি বলো?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্টই দেখিতে পাইল, সেথায় নানাছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইসারায় আজ শুধু একটি মাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে, ইহারই সম্মুখে এই একাকিনী রমণীকে পরিত্যাগ করার মতো কাপুরুষতা আর কিছু হইতেই পারেনা। কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ী কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রের বাসায় দ্বিতলের সেই হল-ঘরটায় নূতন, দামী কার্পেট বিছাইয়া অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে অনেক-গুলা, কোলাহলও কম হইতেছেনা। মাঝখানে আশুবাবু, ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক। বেলা আসিয়াছেন, এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মালিনী। কে-একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অন্যত্র কাজে নিযুক্ত।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিল, এবং ঢুকিয়াই চোখে পড়িল এদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময় কলস্বরে সম্বর্দ্ধনা করিল,—কমল যে? কখন্ এলে? অজিত কই?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কমল দেখিল যে-ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা এড়াইয়াছেন, কিন্তু দেশের ম্যালে-রিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই হইল যে তিনি

ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ-দেখার হয়ত আর সুযোগ ঘটিতনা। দুঃখ থাকিয়া যাইত।

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেননি,—শরীরটা ভালো নয়। আমি এসেছি অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ? ছিলে কোথায়?

নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম। দেখ্‌ছিলাম, ধর্ম্মকে তো ফাঁকি দিলেন, কর্ম্মকেও ঐ সঙ্গে ফাঁকি দিলেন কি না! এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষার বন্য-লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই,—যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য। ঘরে আসিয়া বসিল,—কতটুকুই বা! তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল জিনিসেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রর কথায়। আর দু'টি নারীর সম্মুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ত্রুটি ঘটিল, কিন্তু আবেগ ভরে বলিয়া ফেলিল,—এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হোলো। কমল ছাড়া ঠিক এম্‌নি কথাটি আর কেউ বল্‌তে পারতোনা।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শন শাস্ত্রের কোন্ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি এতে পরিস্ফুট হোলো শুনি?

কমল সহাস্যে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এর জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিন্‌তে পারো ত?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হোলো। চিন্‌তে তুমি পারচো ত অক্ষয় ?

কমল কহিল, প্রশ্নটি অন্যায় আশুবাবু। মানুষ-চেনা ওঁর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা ওঁর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিলনা, কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিত কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রর ছিলনা, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিশ্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, আমাদের এই সহর থেকে, হয়ত বা এ দেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্চেন ; ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে কোন মানুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আজ ওঁর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্যের মধ্যে ওঁকে বিদায় দিতে পারি।

কথা কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহৃদয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। বাক্যালাপ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্ত্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয়, খবর পেয়েছো বোধ হয় হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটা আর নেই। রাজেন্দ্র আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন সতীশও গেছেন। যে-ক'টি ছেলে বর্ত্তমান আছে, হরেন্দ্রর অভিপ্রায় জগতের সোজা পথেই তাদের মানুষ কোরে তোলেন। তোমরা সকলে অনেক দিন অনেক কথাই বলেছো, কিন্তু ফল হয়নি। তোমাদের কর্ত্তব্য কমলকে ধন্যবাদ দেওয়া।

অক্ষয় অন্তরে জ্বলিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, শেষকালে ফল ফল্‌লো বুঝি ওঁর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাইনি। এইটি অনেক পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, করবেনই তো। মানুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবুও আমার মনে হয় ভাঙ্‌বার প্রয়োজন ছিলনা। সকল ধর্ম্ম-মতই তো মূলতঃ এক, সিদ্ধি লাভের জন্য এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন ক'রে চলা। যারা মানেনা বা পারেনা, তারা না-ই পারলো, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে তাদের নিরুৎসাহ কোরেই বা লাভ কি? কি বলো অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার তো এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হোলোনা আশুবাবু, বরঞ্চ, হোলো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন কোরে ভাব্‌তে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বোলতামনা। কিন্তু তাতো নয়,—আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্ম্মের চেয়েও বড়,—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্ম্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, তা' যেন হোলো, কিন্তু তাই ব'লে কি তোমার উপমাকেই যুক্তি বলে মেনে নেবো?

কমল পরিহাস যে করে নাই তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশি নয়? সকল ধর্ম্মই যে আসলে এক, এ আমি মানি। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা। মুঠোর মধ্যে ওকে তো পাওয়া যায়না। আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি

নিয়ে,—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল কোরে বংশধরের জন্যে রেখে যাওয়া চলে। তাইতো জীবনের প্রয়োজনে ও ঢের বড় সত্যি। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ তো সবাই জানে, কিন্তু তাই ব'লে কি মান্‌তে পারে? আপনিই বলুননা অক্ষয়বাবু, ঠিক কি না। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল। ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠোর কিছু-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাইলনা।

আশুবাবু বলিলেন, অথচ, তোমারই যে কমল, সকল আচার-অনুষ্ঠানেই ভারি অবজ্ঞা, কিছুই যে মান্‌তে চাওনা? তাইতো তোমাকে বোঝা এত শক্ত!

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সাম্‌নের পর্দ্দাটা সরিয়ে দিন,—আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝ্‌তে বিলম্ব হবেনা। নইলে, আপনার স্নেহই বা আমি পেতাম কি কোরে? মাঝখানে কুয়াসার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু তো পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে তো চাইনে, চাই শুধু এর পরিবর্ত্তন। কালের ধর্ম্মে আজ যা' অচল, আঘাত কোরে তাকে সচল করতেই চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি ব'লেই তো। মিথ্যে বলে জান্‌লে মিথ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিথ্যে-শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারা-জীবন মেনে মেনেই চল্‌তাম,—একটুও বিদ্রোহ কোরতামনা।

একটু থামিয়া কহিল, ইউরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেলো নূতন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলেনা আচার-অনুষ্ঠানে। পুরনোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে-তলে দিতে লাগ্‌লো তার পূজো, ভেতরে গেলনা শেকড়,

সখের ফ্যাশান গেলো দু'দিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এম্‌নি কোরেই ফাঁকা হয়ে। কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সাম্‌লেছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিলনা, গম্ভীর হইয়া রহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিক মত আজও সায় পায়না, মনের মধ্যেটা রহিয়া-রহিয়া ভারী হইয়া উঠে। কহিল, মুস্কিল এই যে, তুমি ভগবান মানোনা, মুক্তিতেও বিশ্বাস করোনা। কিন্তু যারা তোমার ওই অজ্ঞেয় বস্তুর সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেল্‌লেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ায় আমি অহঙ্কার করিনে; সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেলো আমি নিজের দুর্ব্বলতাই অনুভব করেছি।

তা'হলে ভাল করেননি হরেনবাবু। বাবা বল্‌তেন, যাদের ভগবান্‌ যত সূক্ষ্ম, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশী জড়িয়ে। যাদের যত স্থূল, যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যেন লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট ক'রে আনলেও লাভ হয়না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে। হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেচি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে-যুগে ফিরে যাওয়া। ভাব্‌তেন, দুনিয়ার বয়স থেকে হাজার দুই বছর মুছে ফেল্‌লেই আস্‌বে পরম লাভ। এম্‌নি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলেতের পিউরিটান একদল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী ঘুচিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুল্‌বে বাইবেলের সত্য-যুগ। তাদের লাভের হিসেবের অঙ্ক জানে আজ অনেকে, জানেনা শুধু মঠ-ধারীর দল

যে, বিগত-দিনের দর্শন দিয়ে চলে যখন বর্ত্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি করেছি, কিন্তু ভাঙা-আশ্রমে বাকি রইলেন যাঁরা তাঁদের ক্ষতি করিনি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়—ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রহিল, এবার সে-ই শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে-যুগের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল ছবি—

কমল বাধা দিল,—যত উজ্জ্বল হোক্ তবু সে ছবিই,—তার বড় নয়। এমন বই সংসারে আজও লেখা হয়নি আশুবাবু যার থেকে তার সমাজের যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনায় গর্ব্ব করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলেনা। শ্রীরামচন্দ্রের যুগকেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগকেও না। রামায়ণ মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক্, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবেনা, এবং মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক্, তাতে ফিরে যাওয়াও যাবেনা। পৃথিবীর সমস্ত মানব-জাতি নিয়েই তো মানুষ? তারা যে আপনার চারি দিকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কি বায়ুর চাপকে ঠেকানো যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতিই তাহাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখো-মুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত, নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভয়তা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেন বলিনা কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা পারিনে, তাকেও অন্তরে অবজ্ঞা করিনে। এই

গৃহেই মেয়েদের দ্বার রুদ্ধ ছিল, শুনেচি, একদিন তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ স্থানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল। কিন্তু, আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোষাক, মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস; কহিল, দিদি বল্‌লেন, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, ঠাঁই হবে?

অক্ষয় বলিল, হবে বই কি হে। বলোগে, রাতও তো হোলো।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বৌঠাকরুণ আসা পর্য্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয়না। ওঁর তো কোথাও যায়গা ছিলনা,—কিন্তু সতীশ রাগ ক'রে চলে গেলো।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ, সতীশেরও অন্য উপায় ছিলনা। সে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী,—এ সম্পর্কে তার সাধনার বিঘ্ন। কিন্তু আমারি যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভালো হোলো সব সময়ে ভেবে পাইনে।

কমল অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল, এই কাজটাই হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে হয় দুর্ব্বহ। এই বলিয়া সে পলকের জন্য আশুবাবুর প্রতি চাহিল,—হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল,—কিন্তু হরেন্দ্রকেই পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকে সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানের পূজো বারেবারেই ঘাড় হেঁট ক'রে আত্ম-পূজোয় নেমে আসে। এছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ তো শুধু কেবল নরও নয়, নারীও নয়,—এ দু'য়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্দ্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ ক'রে পেতে চায়, তখনি দেখি সে আপনাকেও পায়না,

ভগবানকেও ক্ষোয়ায়। সতীশবাবুদের জন্যে দুশ্চিন্তা রাখবেননা, হরেনবাবু, ওঁদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিম্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিতনা, তাই শেষ কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল,—আত্মদর্শন। অর্থাৎ, আপনাকে নিগূঢ় ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা,—সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবারও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মানোনা, কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে, তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত কোরে না রাখলে তারা একাগ্র চিত্ত-যোজনায় সফল হয়না। সতীশকে আমি ধরিনে, কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার, কমল। এই তো যোগ। আসমুদ্র-হিমাচল-ভারত অবিচলিত শ্রদ্ধায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বাহিরের সর্ব্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাস-পরায়ণ হিন্দুচিত্ত নির্ব্বাত-দীপশিখার ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি করিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল। সঙ্কোচ আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সত্যব্রত, সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা। কিন্তু উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন, কেমন কমল, এই কি সত্যি নয়? তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, আশুবাবু, সত্যি নয়। শুধু তো হিন্দুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তো কোন-কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠেনা—ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যু-বরণ-করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাতে জিদের

জোরকেই সপ্রমাণ করেছে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করেনি। যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জ্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-চিন্তাই হয় তো, এই কথাই জোর করে বলবো যে এই দু'টো সিংহ-দ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন্ আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়, হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্ব্বার আসিয়া জানাইল খাবার দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

২৮

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত্ত নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুন্‌তে পেলাম আপনারা চলে যাচ্চেন। পরিচিত সকলের বাড়ীতেই আপনি এক-আধবার গেছেন, শুধু আমারই ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে নয়; 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করেনা, অভিমানও করেনা। কিন্তু অক্ষয়ের অন্য কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করিত। কমল ইহা জানিত। কিন্তু এই অতি-ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃক্‌পাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল তার ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি তো কখনো যেতে বলেননি?

না। সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবেনা?

কি কোরে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্চি।

ভোরেই? একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদ্‌লালো কি কোরে? বরঞ্চ, আরো ত কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ, তাই হোতো বটে। কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেছে। আর কেউ কিছু বুঝ্‌লেন কি না জানিনে,—না-বোঝাও আশ্চর্য্যি নয়,—কিন্তু, আমি অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামের প্রায় চোদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা তো সেই দেড় হাজার বছরের পুরনো সত্যেই আজও দৃঢ় হয়ে আছে। সেই বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান,—কিছুই তো ব্যত্যয় হয়নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানিনে, জানবার কখনো সুযোগও হয়নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় তো কেবল এইটুকুই বল্‌তে পারি যে ওঁদেরও ভেবে দেখ্‌বার দিন এসেছে। সত্যের সীমা যে কোন-একটা-অতীত দিনেই সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মান্‌তে হবে। কিন্তু উপরে চলুন।

না, আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো। আমার স্ত্রী পীড়িত। এত লোককে দেখেছেন একবার তাঁকে দেখবেননা?

কমল কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখতে?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানিনে। আমাদের পরিবারে ও প্রশ্ন কেউ করেনা। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখা-পড়া শেখবার সময়ও পায়নি দরকারও হয়নি। রাঁধা-বাড়া, বার-ব্রত, পূজো-আহ্নিক নিয়ে আছে, আমাকেই ইহকাল পরকালের দেবতা বলে জানে, অসুখ হ'লে ওষুধ খেতে চায়না, বলে, স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে বুঝবে স্ত্রীর আয়ুঃ শেষ হয়েছে!

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রের কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি তো ভাগ্যবান,—অন্ততঃ, স্ত্রী-ভাগ্যে! এতখানি বিশ্বাস এ যুগে দুর্ল্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই,—ঠিক জানিনে। হয়ত, একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, একটা অনুরোধ কোরব?

করুন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখ্‌বেন? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন, —এই সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাব্‌বো। আচ্ছা, চোল্‌লাম,—নমস্কার। এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল। এবং সেইখানে কমল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাল-মন্দর বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে এই সেই অক্ষয়! এবং, মানুষের জানার বাহিরে এই ভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন

নির্বিঘ্ন শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে! একখানি চিঠির জন্য তাহার কি কৌতূহল, কি সকাতর সত্যকার প্রার্থনা!

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপবিষ্ট। এ তাহার স্বভাব,—বিশেষ কেহ কিছু মনে করেনা। আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বল্‌ছিলেন কমল। শুন্‌লে হঠাৎ হেঁয়ালি ব'লে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য। বল্‌ছিলেন, লোকে এইটিই বুঝতে পারেনা যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়। মানুষে বাইরের অন্যায়টাই দেখে, অন্তরের প্রেরণার খবর রাখেনা। এইখানেই যত দ্বন্দ্ব,যত বিরোধের সৃষ্টি।

কমল বুঝিল ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল। এ কথা বলিলনা যে উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা যায়, দুর্ব্বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা হরেন্দ্র ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে সর্ব্বক্ষণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষ-বেলায় তাহার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সস্নেহে কহিলেন, কিছু মনে কোরোনা মা, এ ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও তো ওই দলের লোক। সবই জানি।

আশুবাবু হরেন্দ্রের সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন। কহিলেন, দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্য্যা। হাই-সার্কেলের মানুষ। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলা-ফেরা, বেশ-ভূষায় আপ্-টু-ডেট। এটুকু ভুল্‌লে যে ওদের একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে, কমল। রাগ করলেও ওদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ তো করিনি।

আশুবাবু বলিলেন, করবেনা তা' জানি। রাগ আমাদেরি হোলোনা,—শুধু হাসি পেলে। কিন্তু তুমি বাসায় যাবে কি কোরে মা, আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাবো?

বাঃ—নইলে যাবো কি কোরে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে নিজেদের মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু, আর দেরী করাও হয়ত উচিত হবেনা,—কি বলো?

সকলেরই স্মরণ হইল যে তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেন্দ্র কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল,—হ্যালো! বেটার লেট দ্যান নেভার! এ কি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম। এবং চক্ষের পলকে একটা অভাবিত দুঃসাহসিকতা তাহার ভিতরের কথাগুলা সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে তো আর দেখা হোতোনা। আমরা আজ ভোর রাত্রেই দু'জনে চলে যাচ্চি।

আজই? এই ভোরে?

হাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। ঐখান থেকে আমাদের যাত্রা হবে সুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেই যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া ঘরের একপাশে বসিল

সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথাটা তাঁহার গলায় একবার বাধিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত, আর কখনো আমাদের দেখা হবেনা, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হোতো আমি দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—এ জিনিস আমি চাইনি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বারবার বলেচি, বারবার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ,—যা কিছু আমার আছে,—সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত কোরে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয়নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্ব্ব সমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। আজ সে আপনাকে নিঃস্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এতটুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া, কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক্, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে তো আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবেনা জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো? তা'হলে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র কোরে বাড়ী গাঁথতে চেয়োনা। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত কহিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাওনা,—কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখবো কমল? কই সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ, তোমার দুর্ব্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই, কমল। ঐ একই কথা, মা। এই আত্ম-সমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার মান বেশি।

সে ঠিক কথা মা। কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফলে যাবেনা।

হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে তো আসোনি, নীচে চলো।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, এম্‌নি তোমার বিদ্যে। ও খেয়ে আসেনি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হোলো,—যা' ও কখনো করেনা।

অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এইটি শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপি-চুপি জবাব দিল, পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিলনা। কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিলনা তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এম্‌নিই বিধান।

দ্বারের আড়ালে ডাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল, আমাকে ভুলোনা যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিলনা।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, দিদি, আমি আবার আসবো, কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাবো জীবনে কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেননা। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এই রূপে সে দেখা দেয়—তাকে আর কিছুতে চেনা যায়না। আর যাই কেননা করো দিদি, অবিনাশ বাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজী হোয়োনা।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আশুবাবু গাড়ীতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার কাছ থেকে একটি খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান

পেয়েছি কমল। অনুকরণে মুক্তি আসেনা, মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে, অজিতকে হয়ত তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষে কোরো মা। আজ থেকে সে ভার তোমার।

ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেচি যে ভালোবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। তার জীবন। তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু, শুচিতার সংজ্ঞা নিয়ে যাবার বেলায় আর আমি তর্ক তুলবোনা। আমার ক্ষোভের নিশ্বাসে তোমাদের বিদায় ক্ষণটিকে মলিন কোরে দেবোনা। কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল, শুধু দু'চার জনের জন্যেই,—তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি, তার শুভ যায় ঘুচে, তার ভার হয় দুঃসহ। বৌদ্ধদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বৈষ্ণবদের দিন পর্য্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম্ম কাকাবাবু।

ধর্ম্ম? তোমার ও ধর্ম্ম?

কমল কহিল, হাঁ। যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে, আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃত দেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি কোরেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের

মুক্তির পথ। দেখ্‌তে পানিনা কাকাবাবু, সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজ-শাসনে বদ্‌লালো কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেম্‌নিই জ্বল্‌চে? তেম্‌নি কোরেই ছাই কোরে আন্‌চে? এ নিভ্‌বে কি দিয়ে?

আশুবাবু কথা কহিতে পারিলেননা, শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বলিয়া উঠিলেন, কমল, মণির-মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারিনি তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্ব্বলতা,—কি জানি সে কি, কিন্তু এ মোহ যেদিন ঘুচবে, মানুষের অনেকখানিই সেই সঙ্গে ঘুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু তপস্যার ধন। আচ্ছা, আসি। বাসদেও, চলো।

টেলিগ্রাফ-পিয়ন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জরুরি তার। হরেন্দ্র গাড়ীর আলোতে খাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম, আসিয়াছে মথুরা জেলার এক ছোট সরকারী হাঁসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ,—গ্রামের এক ঠাকুর-বাড়ীতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক-পূজিত বিগ্রহ-মূর্ত্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন্দ্র মূর্ত্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইলনা তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। দুই দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোকে কীর্ত্তনাদি সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা তটে ভস্ম করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সম্বাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে যেন বজ্রপাত হইয়া গেল।

কান্নায় হরেন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং অনাবিল জ্যোৎস্না রাত্রি সকলের চক্ষেই এক মুহূর্ত্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দু'দিন! আটচল্লিশ ঘণ্টা! এত কাছে? আর একটা খবর সে দিলেনা?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করেনি। কিছু করতে পারা তো যেতোনা, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে সে চায়নি।

আশুবাবু যুক্ত-হাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি। শুধুই দেশ,—এই ভারতবর্ষটা। শুধু বলি, ভগবান। তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো! তুমি আর যাই করো, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত কোরোনা। বাসদেও,—চালাও।

এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বেশি বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিলনা। চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল, বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেননা হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এম্নি কোরেই আদায় হয়।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো গিয়া সকলের বুকে বিঁধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন।

এবং, সেই শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। কহিল, বামদীন, চলো।

শেষ